সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

কারওয়ানে যিন্দেগী

(আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ)

[৩য় খণ্ড]

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন

অনূদিত

(19) کاروانِ زندگی سوم از سید ابوالحسن علی ندویؒ

مترجم: ڈاکٹر اے ایف ایم خالد حسین

ناشر: محمد برادرس 38، بنگلہ بازار، ڈھاکہ 1100.

মুহাম্মদ ব্রাদার্স

৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা

কারওয়ানে যিন্দেগী-৩য় খণ্ড
মূল : সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.
অনুবাদ : ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন

প্রকাশকাল
১ জানুয়ারী, ২০১৬ ঈসায়ী
অগ্রহায়ণ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ; সফর, ১৪৩৭ হিজরী

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক

প্রকাশনায়
মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
সেলঃ 01822-806163; 01728-598440

মুদ্রণে : মেসার্স তাওয়াক্কুল প্রেস
৬৬/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ
সালসাবিল

ISBN: 978-984-91840-2-7

মূল্য ঃ ২৫০.০০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

Karwaney Zindegee – 3rd Vol.: Written by Allama Sayeed Abul Hasan Ali Nadvee (Rh) in Urdu and Translated by Moulana Dr. A F M Khalid Hossain into Bengali and Published by Muhammad Abdur Rouf, M/s Muhammad Brothers, 38, Bangla Bazar, Dhaka - 1100 BANGLADESH Price Tk. 250/- U S $ 6.00 only Cell:01822-806163

উৎসর্গ

'মুসলিম বিশ্বের প্রখ্যাত
দা'ঈ ও মুবাল্লিগ, মশহুর বুযর্গ,
আমাদের রূহানী উস্তাদ, মুফাক্কির-এ ইসলাম
আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর
অমর রূহের ছওয়াব রেছানীর উদ্দেশ্যে– যিনি ১৯৯৯ সালের
৩১ ডিসেম্বর/২২ রমযান শুক্রবার ১১.৫০ মিনিটে পবিত্র কুরআন
শরীফের সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াতরত অবস্থায় পরম প্রভুর আহ্বানে
তাঁর প্রিয় সান্নিধ্যে গমন করেন। 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।'

প্রকাশকের কথা

আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. বিশ্বখ্যাত ও জননন্দিত এক মনীষী ও বরেণ্য ইসলামী দা'ঈ। মেধা ও মননের বহুমাত্রিকতা তাঁর আলোকিত জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আরবী সাহিত্যিক, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের বিশ্লেষক ও সীরাত গবেষক হিসেবে গোটা দুনিয়ায় রয়েছে তাঁর মর্যাদাপূর্ণ পরিচিতি। জীবদ্দশায় তিনি এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার বহু এলাকা পরিভ্রমণ করেন। কেবল পর্যটন নয় বরং দাওয়াতী মেহনত, শিক্ষাবিষয়ক ও ধর্মতাত্ত্বিক সেমিনারে অংশগ্রহন ছিলো এসব সফরের উদ্দেশ্য। 'কারওয়ানে যিন্দেগী' তাঁর বিশ্বপরিভ্রমণ ও জীবন অভিজ্ঞতার নির্ভরযোগ্য বিবরণ এবং মুসলিম উম্মাহ্‌র এক অমূল্য সম্পদ।

সাত খণ্ডে বিন্যস্ত কালোত্তীর্ণ এ গ্রন্থটিতে রয়েছে নানা জাতি-গোষ্ঠির জীবন ও সংস্কৃতির বিশ্লেষণ এবং ইসলামী সভ্যতার উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্যের অনুপুঙ্খ আনন্দঘন পরিবেশনা। সর্বোপরি, বিজ্ঞ গ্রন্থকারের উপস্থাপনার নৈপুন্যশৈলী পাঠককে বিস্মিত ও শেকড়সন্ধানী করে তোলে। 'কারওয়ানে যিন্দেগী'-এর প্রতিটি ছত্রে, প্রতি পাতায় লেখকের পাণ্ডিত্য ও সৃজন-সামর্থের অভিব্যক্তি লক্ষনীয়।

এ গ্রন্থটি বিশ্ববিশ্রুত আফ্রিকান পর্যটক ইব্‌ন বতুতা (১৩০৪-১৩৬৮)-এর 'রিহলা' ও চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান (৩৩৭-৪২২) রচিত *Memories of Eminent Monks*-এর সমপর্যায়ের তো বটেই বরং নানা ক্ষেত্রে প্রাগ্রসর আঙ্গিকে রচিত। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হয়ে বিশ্বসাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও প্রতিভাসিত করেছে। বাংলাদেশে 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স' হযরত নদভী রহ.-এর কিতাবগুলো বাংলায় ভাষান্তর করে প্রকাশের ক্ষেত্রে এক অনন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এ প্রসঙ্গে হযরত নদভী (রহ.)-এর খিলাফতপ্রাপ্ত প্রিয়ভাজন আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী (রহ.)-এর উদ্যোগ প্রচেষ্টার কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

'কারওয়ানে যিন্দেগী' বাংলা ভাষায় তরজমা এটাই প্রথম। বেশ ক'জন বিজ্ঞ অনুবাদকের মাধ্যমে মার্জিত বাংলায় ভাষান্তর করে অনূদিত কপি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আল্লাহ তা'য়ালার শোকরিয়া আদায় করছি। হযরত নদভী রহ.-এর

অন্যান্য গ্রন্থের মতো এ গ্রন্থটিও পাঠকপ্রিয়তা পেলে আমাদের আয়াসাধ্যশ্রমকে সার্থক মনে করবো।

অনেকের অনুরোধে বইটি দ্রুত প্রকাশের কারণে প্রথম সংস্করণে অনিচ্ছাকৃত কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে যাওয়াটা স্বাভাবিক। সহৃদয় পাঠক তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন– এটাই প্রত্যাশা। আগামীতে আরো যত্নবান হয়ে যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে বইটি প্রকাশের প্রয়োজনে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে সাহায্য, আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা ও দোয়া প্রার্থী।

আমার বন্ধুবর অধ্যক্ষ অশোক তরু একজন অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও হযরত নদভী রহ.-এর প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছে এবং উজ্জীবিত করেছে। জীবনের কঠিনতম সময়ে পাশে থেকে আমার বিশেষ অনুরোধে হযরত নদভী রহ.-এর কিতাবসমূহ প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর মেধা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সেগুলো সংশোধন, পরিমার্জন ও সম্পাদনা করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এ জন্য তাঁর কাছে আমার অশেষ ঋণ।

এ গ্রন্থ প্রকাশে সংশ্লিষ্ট সকলের মেহনত মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন কবুল ও কামিয়াবি করুন। আমিন!

১ জানুয়ারী, ২০১৬ ঈসায়ী, ঢাকা — মুহাম্মদ আবদুর রউফ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Phones: 73864, 72330, 72338

Abul Hasan Ali Nadwi
P. O. BOX, No. 93, NADWATUL ULAMA,
LUCKNOW—226 007, U. P. (INDIA)

أبو الحسن علي الحسني الندوي
ندوة العلماء - لكهنؤ - الهند

Ref:

التاریخ: ۱۱ ربیع الاول ۱۴۱۸ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جیسے ہی معلوم کر کے بڑی مسرت ہوئی کہ ڈھاکہ میں چند مخلص
و اہل علم حضرات نے دینی و اسلامی اور اصلاحی کتابوں کی تیاری
اور اشاعت کے لیے ایک ادارہ قائم کیا ہے اس کے ذریعہ میری
کتابیں بھی شائع ہونگی، ان میں سے جن کتابوں کے ترجمہ کی ضرورت سمجھی جائیگی
ترجمہ کر کے شائع کرینگے، ادارہ کا نام مجلس نشریات اسلام تجویز
ہوا ہے اور چاٹگام کے عالم دین مولانا سلطان ذوق صاحب ندوی
اور ڈھاکہ کے مولانا محمد علی صاحب اور مولانا سلمان صاحب اس ادارہ
کے ذمہ دار ہیں، میں ان حضرات کو اجازت دیتا ہوں کہ میری
جن کتابوں کو مفید سمجھیں ترجمہ کرا سکتے ہیں اور شائع کر سکتے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے اور قبول
فرمائے آمین

ابوالحسن علی ندوی
ندوۃ العلماء لکھنؤ

۱۱/۳/۱۴۱۸ھ

بسم الله الرحمن الرحيم

Phones: 73864, 72336, 72338

Abul Hasan Ali Nadwi
P. O. BOX, No. 93, NADWATUL ULAMA,
LUCKNOW—226 007. U. P. (INDIA)

أبو الحسن علي الحسني الندوي
ندوة العلماء - لكهنؤ - الهند

Ref:

التاريخ: ١٨ ربيع الاول ١٤١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

আমি এ কথা জানতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, ঢাকার কিছু মুখলেছ আহলে ইল্‌ম হযরত ইসলামী এবং সংশোধিত ও সংস্কারমূলক ধর্মীয় কিতাব মুদ্রণ ও প্রচারণার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন গড়ে তুলেছেন। যার মাধ্যমে আমার রচিত কিতাবও প্রকাশ করবেন। এক্ষেত্রে আমার যে কিতাবগুলো প্রয়োজনীয় মনে করবেন, তা অনুবাদ করে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম 'মজলিশ নাশরিয়াত-ই-ইসলাম' (**Academy of Islamic Publications**) স্থির হয়েছে।

চট্টগ্রামের বিশিষ্ট আলেম মাওলানা সুলতান যওক নদভী সাহেব এবং ঢাকার মাওলানা ওমর আলী সাহেব ও মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান সাহেব ঐ সংস্থার দায়িত্বশীল ব্যক্তি। আমি ঐ হযরতদেরকে এইমর্মে অনুমতি দিচ্ছি যে, তাঁরা আমার যে কিতাব গুলো উপকারী মনে করবেন, সেগুলো অনুবাদ করে প্রকাশ করতে পারবেন। আল্লাহ্‌ তায়ালা তাঁদের প্রচেষ্টায় বরকত দিন এবং মঙ্গল করুন। আমিন!

আবুল হাসান আলী নদভী
নদওয়াতুল উলামা, লাখনৌ
ভারত

১৮ রবিউল আউয়াল, ১৪১৮ হিজরী

মজলিস নাশ্‌রিয়াত-ই-ইসলাম

(Academy of Islamic Publications)

৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; বাংলাদেশ

সূত্রঃ..... তারিখ.....

সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ এবং ইসলামী গ্রন্থের রচিয়তা আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী বাংলাদেশে অনুবাদ ও প্রকাশের জন্য একমাত্র 'মজলিস নাশ্‌রিয়াত-ই-ইসলাম' ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০-কে তাঁহার ১৮ই রবিউল আউয়াল, ১৪১৮ হিজরী তারিখের এক পত্র দ্বারা অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। 'মজলিস নাশ্‌রিয়াত-ই-ইসলাম' গ্রন্থগুলি প্রকাশনা ও বাজারজাত করার জন্য 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স', ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০-কে শর্তাধীনে অনুমতি প্রদান করায় 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স' গ্রন্থগুলি প্রকাশ ও বাজারজাত করিয়া আসিতেছে। অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে উক্ত রূপ অনুমতি প্রদান করা হয় নাই।

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, কতিপয় ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান অননুমোদিত ও বে-আইনীভাবে গ্রন্থগুলো অনুবাদ, প্রকাশনা ও বাজারজাত করার অবৈধ চেষ্টায় লিপ্ত আছেন। কাজেই এই মর্মে সতর্ক করা যাইতেছে যে, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অননুমোদিত ও বে-আইনীভাবে মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. রচিত গ্রন্থগলো অনুবাদ, প্রকাশনা ও বাজারজাত করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

'মজলিশ নাশরিয়াত-ই-ইসলাম'-এর পক্ষে

সাধারণ সম্পাদক

মজলিস নাশ্‌রিয়াত-ই-ইসলাম

(Academy of Islamic Publications)

৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; বাংলাদেশ

সূত্রঃ..... তারিখ.....

সংশ্লিষ্ট মহলের জ্ঞাতার্থে

বিশ্বখ্যাত ইসলামী দাঈ, মণীষী ও আধ্যাত্মিক রাহবার আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর বাংলাদেশ সফরের পূর্বেই তাঁর রচিত কয়েকটি কিতাব 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ দশকের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এরপর অজ্ঞাত কারণে 'ইফাবা' কর্তৃপক্ষ তাঁর কিতাবগুলো প্রকাশে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি।

হযরত আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী রহ.-এর উদ্যোগে হযরত মাওলানা সুলতান যওক সাহেব ও আমি মুহাম্মাদ সালমান 'মজলিশ নাশরিয়াত-ই-ইসলাম' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি । এ সংস্থার মাধ্যমে ৯০ দশকের শেষের দিকে হযরতের 'নবীয়ে রহমত', 'হযরত নিযামুদ্দিন আউলিয়া', 'ইসলাম-ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতি' ও 'দাওয়াতের উপহার' নামক ৪টি বই প্রকাশিত হয়। বইগুলো বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে 'মজলিশ নাশরিয়াত-ই-ইসলাম'-এর সম্পাদক ঢাকার বাংলাবাজারস্থ 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স'-এর স্বত্ত্বাধিকারী ও 'ঢাকা কলেজ'-এর পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক জনাব মুহাম্মদ আবদুর রউফ-এর উপর হযরতের বইগুলো প্রকাশনার ব্যাপারে সার্বিক দায়িত্বভার অর্পণ করেন।

একাডেমিক প্রকাশনা বাদ দিয়ে ২০০২ সাল থেকে নিরলসভাবে 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স' সেই গুরু দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে এ যাবত প্রায় ৩৫টিরও অধিক বই বাংলাভাষার পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, 'নদওয়াতুল উলামা'-এর প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী রহ.-এর জীবনী 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স' প্রকাশ করে আমাদের কৃতার্থ করেছেন এবং সাত খণ্ডে রচিত সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর আত্মজীবনীমূলক আলেখ্য 'কারওয়ানে যিন্দেগী'-এর দু'আ ও এজাযত লিখে দিতে পেরে নিজেকে বড়ই সৌভাগ্যবান মনে করছি। আল্-হামদুলিল্লাহ্! এ কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স' ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই পুস্তক প্রকাশ

আমরা এটা জেনে আরো আনন্দিত যে, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর বইগুলো প্রকাশের ক্ষেত্রে 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স' এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে এবং হযরত মাওলানা সুলতান যওক সাহেবকে সভাপতি করে 'মানশুরিয়াত-ই-ইসলাম সোসাইটি' নামক ট্রাস্টের মাধ্যমে 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স' তার সারা জীবনের অর্জিত সম্পত্তি ইসলামী প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ– বিশেষ করে, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর কিতাবসমূহ প্রকাশের নিমিত্তে ওয়াক্ফ করে দেবেন। আই ইউ টি-এর সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. ফজলে ইলাহী, বিচারপতি মোঃ আশরাফুল ইসলাম, ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন ও প্রফেসর ড. মোঃ নূর ইসলাম প্রমুখ উক্ত ট্রাস্টের সম্মানিত সদস্য। 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স'-এর স্বত্বাধিকারী মুহাম্মদ আবদুর রউফ সাহেবের অনুরোধে এ মহতী উদ্যোগের সাথী হতে পেরে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের নিকট শুকরিয়া আদায় করছি।

আমি কায়মনবাক্যে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের নিকট প্রার্থনা করছি, 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স'-এর এ নিঃস্বার্থ উদ্যোগ আল্লাহ্ কবুল করুন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ কাফেলা সুনামের সাথে এগিয়ে যাক। আমিন।

'মজলিশ নাশরিয়াত-ই-ইসলাম'-এর পক্ষে

মুহাম্মাদ সালমান
২৫.১১.১৫
(মুহাম্মাদ সালমান)

Md. Sultan Zauq Nadwi

Principal: Jamiah Darul Ma'arif Al-Islamiah, Chittagong.
Member: International League of Islamic Literature.
Member: International Union for Muslim Scholars.
Chairman: Anjuman-e-Ittihadul Madaris
(Qawmi Madrasah Education Board) Bangladesh.
Chief Editor: The Monthly Al-Hoque
Phone : 031-2581693, Fax : 031-2581687
Mobile : 01819-313242
E-mail : sultanzauq.bd@gmail.com

محمد سلطان ذوق الندوي

مدير : جامعة دار المعارف الإسلامية شيتاغونغ
عضو : مجلس الأمناء لرابطة الأدب الإسلامي العالمية
عضو : الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
رئيس : هيئة إتحاد المدارس الأهلية بنغلاديش
رئيس تحرير : مجلة "الحق" الشهرية
الهاتف: +٨٨٠٣١٢٥٨١٦٩٣ الفاكس والرقم الخاص: +٨٨٠٣١٢٥٨١٦٨٧
جوال : +٨٨٠١٨١٩٣١٣٢٤٢

التاريخ :

بنگلہ دیش میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی کتابوں کا بنگلہ زبان میں ترجمہ مولانا کے سفر سے پہلے شروع ہوا، اس میں محب گرامی مرحوم پروفیسر محمد علی صاحب کی محنت اور خدمات سب سے پہلے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اس کے بعد اسلامک فاؤنڈیشن نے ترجمہ شروع کیا، لیکن مسلسل طباعت و ترجمہ کا کام چلا نہیں، اس پر مولانا نے افسوس کیا، پروفیسر محمد علی صاحب کے ساتھ وابستہ ہو کر جناب پروفیسر عبدالرؤف صاحب (مالک محمدیہ لائبریری، بنگلہ بازار ڈھاکہ) نے بھی کافی کتابوں کا ترجمہ اور نشر کرایا، یہ سن کر خوشی ہوئی کہ اس دفعہ آپ نے کاروان زندگی (حضرت مولانا کی خود نوشت سوانح) کا ترجمہ کرا کے اشاعت کا کام شروع کیا، اس اہم کتاب کی سات جلدیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور ان کی حیات میں برکت عطا کرے، موصوف نے عزیزم ڈاکٹر آ ف م خالد حسین کو لیکر کلمۂ دعائیہ کے لئے ڈھاکہ سے میرے گھر تک پہنچے، میں اس کے لئے شکرگزار ہوں،

محمد سلطان ذوق ندوی

(signature)

٦/١١/١٥م

Md. Sultan Zauq Nadwi

Principal: Jamiah Darul Ma'arif Al-Islamiah, Chittagong.
Member: International League of Islamic Literature.
Member: International Union for Muslim Scholars.
Chairman: Anjuman-e-Ittihadul Madaris
(Qawmi Madrasah Education Board) Bangladesh.
Chief Editor: The Monthly Al-Hoque
Phone : 031-2581693, Fax : 031-2581687
Mobile : 01819-313242
E-mail : sultanzauq.bd@gmail.com

محمد سلطان ذوق الندوي

مدير : جامعة دار المعارف الإسلامية شيتاقونغ
عضو : مجلس الأمناء لرابطة الأدب الإسلامي العالمية
عضو : الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
رئيس : هيئة إتحاد المدارس الأهلية بنغلاديش
رئيس تحرير : مجلة "الحق" الشهرية
الهاتف: ٠٣١-٢٥٨١٦٩٣ +٨٨٠ الفاكس والرقم الخاص: ٠٣١-٢٥٨١٦٨٧ +٨٨٠
جوال : ٠١٨١٩-٣١٣٢٤٢ +٨٨٠

التاريخ :

আল্লামা সুলতান যওক নদভী (দাঃ বাঃ)-এর অভিমত ও দু'আ

বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর গ্রন্থাবলী বাংলাভাষায় তরজমা করার কাজ মাওলানার বাংলাদেশ সফরের আগেই শুরু হয়। এতে আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক ওমর আলীর মেহনত ও আন্তরিক প্রয়াস সবার আগে। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন, আমিন!

এরপর 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' অনুবাদের কাজ শুরু করে কিন্তু ধারাবাহিক মুদ্রণ ও প্রকাশের কাজে ছেদ পড়ে এবং তা বেশীদূর এগোয়নি। এ জন্য আল্লামা নদভী রহ.-এর আফসোস ছিলো। অধ্যাপক ওমর আলী সাহেবের সাথে পরামর্শ করে ঢাকার বাংলাবাজারস্থ 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স'-এর স্বত্ত্বাধিকারী মুহাম্মদ আবদুর রউফ সাহেব হযরত মাওলানার বহু গ্রন্থ বাংলায় ভাষান্তর করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

এটা শুনে আনন্দিত হয়েছি যে, এবারে তিনি 'কারওয়ানে যিন্দেগী' (হযরত মাওলানার আত্মজীবনী) অনুবাদ করিয়ে তা প্রকাশের কাজে হাত দিয়েছেন। গুরুত্বপূর্ণ এ গ্রন্থ সাত খণ্ডে বিন্যস্ত। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে তাওফিক দিন এবং হায়াতে বরকত দান করুন, আমিন! আমার স্নেহভাজন ড. আ ফ ম খালিদ হোসেনকে সাথে নিয়ে তিনি আমার বাসায় হাযির হন। এ জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

০৬.১১.২০১৫ খ্রীষ্টাব্দ

(মুহাম্মদ সুলতান যওক)

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মোঃ মহীউদ্দিন খান সাহেবের অভিমত ও দু'আ

বিগত শতাব্দীর বিশ্বসেরা প্রাজ্ঞ আলেমেদ্বীন ও বরেণ্য আধ্যাত্মিক রাহবার হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর আত্মজীবনীর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে দেখে বিশেষ আনন্দবোধ করছি। 'কারওয়ানে যিন্দেগী' অর্থাৎ জীবনের কাফেলা নামক সাত খণ্ডে রচিত এ বইটি বলতে গেলে মুসলিম উম্মাহ্র একটি দর্পণ বিশেষ। হযরত মাওলানা তাঁর আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে সমকালীন মুসলিম উম্মাহ্র শুধুমাত্র একটি সঠিক চিত্রই আঁকেননি, একই সঙ্গে অনুকরণীয়, অনুসরণীয় জীবনের একটি রূপরেখাও অঙ্কন করেছেন।

বিগত শতাব্দীর শেষ দশকব্যাপি হযরত আল্লামার কিছুটা সান্নিধ্য লাভ করার আমার সৌভাগ্য হয়েছিলো। পবিত্র মক্কাকেন্দ্রিক বিশ্ব মুসলিম সংস্থা 'রাবেতা আলমে ইসলামী'-এর একজন নগণ্য সদস্য হিসেবে অন্যূন দশ-বারোটি সম্মেলনে আমি হযরত আল্লামার সান্নিধ্য লাভ করেছি, তাঁর দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে কিছু জানার সুযোগ হয়েছে।

সময়টা ছিল মুসলিম উম্মাহ্র জন্য বিশেষ সমস্যাসংকুল– ইরানের কথিত ইসলামী বিপ্লব এবং সউদী আরবসহ আরব বিশ্বের সাথে ইরানের বিপ্লবী কর্মকর্তাদের মতপার্থক্য মুসলিম উম্মাহ্র জন্য খুবই বিব্রতকর অবস্থা। এ সময় সঠিক পথের সন্ধানে মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর প্রাজ্ঞ অভিমত ছিল সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য অনুকরণীয়।

মাওলানা আলী মিয়া রহ. বিগত শতাব্দীর শেষ দিনটিতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। এর দ্বারাও অনেকে অনুমান করেন যে, আলী মিয়া ছিলেন সত্যিকার অর্থেই বিগত শতাব্দীর একজন বরণীয় মুজাদ্দেদ। তাই তাঁর জীবনসংগ্রামের বর্ণনার প্রতিটি ছত্রই মুসলিম উম্মাহ্র জন্য অনুকরণীয়। 'কারওয়ানে যিন্দেগী' এই দিক বিবেচনায় মুসলিম উম্মাহ্র জন্য অবশ্য পঠনীয় একখানা মহাগ্রন্থ।

বাংলাভাষায় তাঁর সেই মহাগ্রন্থের অনুবাদ একটি নেয়ামত বিশেষ। আশা করি, বইটির সব কয়টি খণ্ড অনুবাদ করার তৌফিক আল্লাহ্পাক দান করবেন। আমিন!

(মোঃ মহীউদ্দিন খান)
সম্পাদক, মাসিক মদীনা

তারিখঃ ২৪-১২-২০১৫ খ্রীস্টাব্দ, ঢাকা

مدرسة دار الرشاد ميربور داكا بنغلاديش

মাদরাসা দারুর রাশাদ
১২/ ডি-ই, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন : ৮০১৩১৬৩, মোবা : ০১৭১১-৯৭০৫৮৮, ০১৫৫২-৩৫৬৪২১

Madrasah Darur Rashad
12/ D-E Mirpur, Pallabi, Dhaka-Bangladesh
Ph : 8013163, Mob : 01711-970588, 01552-356421

দারুর রাশাদ মাদরাসার মুহতামিম ও হযরত আলী নদভী রহ.-এর খলীফা মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান সাহেবের দু'আ ও অভিমত

মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের দরবারে কৃতজ্ঞতার সিজদা আদায় করছি যে, আমার মুরশিদ ও পীর হযরত মাওলানা আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর আত্মজীবনী 'কারওয়ানে যিন্দেগী' বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

আল্লামা সাইয়িদ আলী মিয়া নদভী রহ-এর জীবন বর্তমান মুসলিম বিশ্বের সংস্কার ও পুনর্জাগরণের আলোকবর্তিকা। সারা বিশ্বে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্র গৌরবময় ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের নির্দেশিকা উপস্থাপনের যে ধারা তিনি 'মা যা খাসিরাল আলামু বিইনহিতাতিল মুসলিমীন' গ্রন্থের মাধ্যমে সূচনা করেছিলেন, তা অব্যাহত ছিলো তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

ইবনে বতুতার পরে মুসলিম বিশ্ব ও সমকালীন পরাশক্তিকে সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার ক্ষেত্রে হয়ত তিনিই ছিলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি। জীবনের ধারা ও প্রবাহ বর্ণনা করতে গিয়ে মূলতঃ তিনি নিজের চিন্তা, দর্শন ও দিকনির্দেশনা তুলে ধরেছেন অভিজ্ঞতার আলোকে।

তাঁর এই জীবনের কাফেলা দেশ ও মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ। এ সম্পদ লালন, সংরক্ষণ ও বিস্তার জাতীয় কর্তব্য এবং বাংলাভাষী মুসলমানদের কাছে তা পৌঁছে দেয়া আমাদের দায়িত্ব ছিল। 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স'-এর স্বত্বাধিকারী জনাব মুহাম্মদ আবদুর রউফ আমাদের পক্ষে সেই দায়িত্ব পালন করেছেন। এ জন্য শুকরিয়া আদায় করছি।

দু'আ করি বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে সমাদৃত হোক এবং হযরতের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের মুসলিম জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী মহল উম্মাহ্র সংস্কার ও পুনর্জাগরণে কর্মসূচী গ্রহণ করুক। আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলের নেক মকছুদ কবুল করুন। আমিন!

মুহাম্মাদ সালমান
২৫.১২.১৫
(মুহাম্মাদ সালমান)

তারিখঃ ২৫-১২-২০১৫ খ্রীস্টাব্দ, ঢাকা

মুহতামিম, দারুর রাশাদ মাদরাসা

লেখকের কথা

'কারওয়ানে যিন্দেগী' ২য় খণ্ড ১৯৮৩ সালের ঘটনাবলি ও প্রতিবেদনে সমাপ্ত হয়। ৩য় খণ্ড লেখার খেয়াল ছিল না। কিন্তু এ দু'খণ্ডের আরবী তরজমা যখন স্নেহাস্পদ মাওলানা সাইয়িদ সালমান হাসানী নদভীর কলমে পূর্ণতা পেয়ে দামেস্ক ও জেদ্দাস্থ দারুল কলম প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী প্রফেসর মুহাম্মদ আলী দওলার নিকট পাণ্ডুলিপি আকারে পৌঁছে এবং ১৯৮৭ সালের মে মাসে (শা'বান ১৪০৭) 'ফী মাছিরাতিল হায়াত' শিরোনামে নবতর আঙ্গিকে ঝরঝরে ছাপার অক্ষরে বের হয়। হঠাৎ মুদ্রাকর ও প্রকাশক (প্রফেসর মুহাম্মদ আলী দওলা) ও লেখকের দৃষ্টি পড়ে একটি ভুলের প্রতি। প্রমাদবশত প্রচ্ছদে উল্লেখ করা হয় ১ম খণ্ড। প্রকাশকের ধারণা ছিল, ধারাবাহিকভাবে ২য় ও ৩য় খণ্ড তৈরি হয়ে যাবে যথাসময়ে। প্রফেসর মুহাম্মদ আলী দওলা দুঃখ প্রকাশ করে এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, সিরিজ আকারে এ গ্রন্থের ৩য় খণ্ড লেখা হোক। ২য় খণ্ডও ইতোমধ্যে ছাপা হয়ে বাজারে চলে আসে। পাঠকবর্গ হয়তো মনে করবেন, সিরিজ এখনো শেষ হয়নি; ৩য় খণ্ড শিগগির বাজারে আসবে– এজন্য অপেক্ষায় থাকবেন।

এ দিকে ২য় খণ্ড লেখা সম্পন্ন হওয়ার পর আমার জীবনে এবং দেশীয় ও জাতীয় অঙ্গনে অনেক ঘটনা সংঘটিত হয়, যার প্রতিবেদন লিখে ইতিহাস সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। বিশেষভাবে মুসলিম পার্সোনাল ল'-এর পক্ষাবলম্বন ও সংরক্ষণ, সুপ্রীম কোর্টের শরীয়তপরিপন্থী রায়ের বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানদের অতীত ইতিহাসে তার নজির পাওয়া দুষ্কর। যথাসময়ে ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণী লিপিবদ্ধ করা না গেলে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর নির্ভুল তথ্য-উপাত্ত ও বিবরণী হারিয়ে যাওয়ার আশংকা থেকে যায়। এভাবে অপরাপর জাতীয় সমস্যা, সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি, পারস্পরিক সহাবস্থান, একে অপরকে অনুধাবন, ইনসাফ ও মানবতার সম্মান বজায় রাখার জন্য ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় শহরগুলোতে যে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠানের প্রয়াস চালানো হয়, তার রেকর্ড পাওয়াও কঠিন হয়ে যাবে। এছাড়া মুসলিম বিশ্বের কতিপয় দেশভ্রমণ ও ঘটনাপ্রবাহকেও বাদ দেয়া যায় না।

এসব বাস্তবতা ও অনুভূতি ৩য় খণ্ড রচনার পেছনে কার্যকর ভূমিকা রাখে। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের প্রারম্ভিক ৩টি অধ্যায় গ্রীষ্মকালে রমযান মাসে এবং বাকী অধ্যায়গুলো দীর্ঘ অসুস্থতার সময় লেখা হয়। সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও এ খণ্ডটিকে আল্লাহ তা'আলা উপকারী, গ্রহণযোগ্য ও ইসলামী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করে দিন। আমীন।

আবুল হাসান আলী নদভী

বিষয়সূচি

প্রথম অধ্যায়

আম্মান (পূর্ব জর্দান), হেজায, ইয়েমেন সফর ও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে বক্তৃতা
ইয়েমেন সফরের অভিজ্ঞতা, প্রতিক্রিয়া ও কারওয়ানে যিন্দেগীর তৃতীয় খণ্ডের রচনার কাজ শুরু
আম্মান (পূর্ব জর্দান), হিজায ও ইয়েমেনের ঐতিহাসিক সফর /২৩
আম্মান-এ /২৫
এক অসাধারণ সেমিনার /২৫
ভারতবর্ষে মুসলমান ও তাদের ঐতিহাসিক অবদান /২৬
ফিলিস্তিন ইস্যুতে বাদশাহ্ হাসানের জ্ঞানগর্ভ ও প্রামাণ্য ভাষণ/ ২৭
লাখো বুদ্ধিমান ঢেকেছে মাথা; একজন প্রতিবাদী রেখেছে জীবনবাজি! /২৮
আমার ব্যস্ত সময় ও কয়েকটি বক্তৃতা /২৯
আসহাবে কাহাফের গুহা /৩০
আম্মান শহরে বন্ধু-বান্ধব ও কয়েকটি সভা-সমিতি /৩১
পবিত্র হেজায ভূমিতে ৩৪
রাবেতা আদবে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা /৩৫
মুফতি আতিকুর রহমানের ইন্তেকালের সংবাদ /৩৬
ইয়েমেন সফর /৩৭
রাজধানী সানাআ'তে /৩৮
সানাআ ইউনিভার্সিটিতে ভাষণ /৪০
মুসলমানের শক্তির উৎস /৪৩
সাবা সম্প্রদায়ের ঘটনা থেকে শিক্ষা /৪৫
সরকারি দায়িত্বশীলবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ /৪৭
ইয়েমেনে দাওয়াতি প্রবন্ধ উপস্থাপন ও তার প্রভাব /৪৭
সানাআ ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকা /৪৯
ইয়েমেনের জাতীয় ও ঐতিহাসিক জায়গাগুলো পরিদর্শন /৫০

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সফর গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশ ও বক্তৃতা
দ্বীনি জযবা, ইসলামী চেতনা জাগ্রতকরণ এবং ইতিবাচক ও গঠনমূলক পরামর্শ /৫৬
ইসলামী নিয়ামতের কদর এবং শোকরের প্রয়োজনীয়তা /৫৭
ইসলামিক ফাউন্ডেশনে গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা /৫৮

বাংলা ভাষায় আলিমদের দক্ষতা ও নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা /৫১
জ্ঞান, সাহিত্য ও চিন্তাশক্তিতে স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল হওয়ার প্রয়োজনীয়তা /৫৯
সফরসঙ্গীদের ব্যস্ততা /৬১
করাচীতে ৪ দিন : ব্যাপক ব্যস্ততা /৬২
রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী সমাজব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা /৬৩
নৈতিক ও শক্তিশালী সমাজব্যবস্থাই নেতৃত্ব ও সভ্যতা নির্মাণের ভিত্তি /৬৫
সত্যিকারের ইসলামী নেতৃত্বের দায়িত্ব ও তাঁর সুফল /৬৫
পদলিপ্সা ও ক্ষমতার মোহ সবচেয়ে বড় বিপদ /৬৫
তরুণদের দায়িত্ববোধ ও আত্মসচেতনতা রাষ্ট্রের মূল সম্পদ /৬৬
একটি স্বাধীন দেশে আলিমদের দায়িত্ব /৬৭
সর্বদা সতর্ক ও প্রস্তুত থাকার প্রয়োজনীয়তা /৬৮
'তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত' ৫ম খণ্ড /৬৯

তৃতীয় অধ্যায়

সর্বভারতীয় হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী আন্দোলন
মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর নামে একটি ঐতিহাসিক চিঠি ইন্দিরাজীর নিহত হওয়া, শিখদের বিরুদ্ধে ভারগৃহীত পদক্ষেপ ও আমার অবস্থান আরবের পথে একবারের ভ্রমণবৃত্তান্ত :পয়ামে ইনসানিয়ত-এর সাংগঠনিক সফর : ইংল্যান্ড ও বেথলেহেম যাত্রা

হিন্দু পুনর্জাগরণবাদের ঝড় এবং মুসলিম মিল্লাতের শঙ্কা /৭১
গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক মসজিদগুলোকে মন্দিরে রূপান্তরের দাবি /৭২
মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর নামে ঐতিহাসিক পত্র /৭৫
মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর হত্যা ও প্রতিবাদ /৮১
পবিত্র হেজাযের সফর, একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা ও এক অনবদ্য অভ্যর্থনা /৮৩
পয়ামে ইনসানিয়তের একটি সফর / ৯০
লন্ডন, অক্সফোর্ড ও লুক্সেমবার্গে দিনগুলো /৯১
নিষ্ঠাবান এক সহযোগীর ইন্তেকাল /৯৫

চতুর্থ অধ্যায়

মুসলিম পার্সোনাল ল' (মুসলিম পারিবারিক আইন) সংরক্ষণের তাৎপর্য ভারতীয় মুসলমানদের সামনে নতুন পরীক্ষা ভারতজুড়ে সর্বাত্মক আন্দোলন ইসলামি পারিবারিক আইনের ব্যাপারে উচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপ মোকাবেলায় মুসলমানদের বিজয়

মুসলিম পার্সোনাল ল' (মুসলিম পারিবারিক আইন) :
তাৎপর্য, আন্দোলন ও কর্মতৎপরতা /৯৬
কোলকাতার সাধারণ সম্মেলন /৯৮

সুপ্রিম কোর্টের রায় : ধর্মীয় বিষয়ে প্রকাশ্য হস্তক্ষেপ
ও ইসলামি শরীয়তের ওপর নগ্ন আক্রমণ /১০০
সুপ্রিমকোর্টের রায় ইসলামি আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক /১০২
একটি মারাত্মক পদক্ষেপ /১০৩
সুপ্রিমকোর্টের বিতর্কিত রায়ের বিরুদ্ধে ভারতজুড়ে
ব্যাপক বিক্ষোভ ও অব্যাহত সমাবেশ /১০৫
ইংরেজি ও হিন্দি ভাষার কতিপয় সংবাদমাধ্যমে
অগ্রহণযোগ্য বিরোধিতার ঝড় /১০৮
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও বোঝাপড়ার চেষ্টা /১১০
একটি নাজুক পর্যায়! /১১৪
বাবরি মসজিদ /১১৬
সংসদীয় বিলের পক্ষে রাজীব গান্ধীর ভাষণ /১১৭
পার্লামেন্টে বিল পাস /১১৮
রাজীব গান্ধীর নামে লেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি /১২৩
সম্মিলিত ও অভিন্ন পারিবারিক আইনের সংকট /১২৫
এটি এক স্থূল ভাবনা /১২৭
গণতান্ত্রিক দেশে গণমানুষের অধিকার রীতি ও পদ্ধতি /১২৮
বাবরি মসজিদ /১২৯
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সভা /১৩১

পঞ্চম অধ্যায়

ইস্তাম্বুলে 'রাবেতায়ে আদবে ইসলামী' (ইসলামী সাহিত্য সংস্থা)-এর সভা
করাচীতে কয়েকদিন অবস্থান ও প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষণসমূহ /১৩৩
তুর্কী আত্মমর্যাদা, হিন্দুস্তানী প্রতিভা ও আরবী বাকশক্তি /১৩৬
মৃত্যুপরবর্তী জীবনের বিশালতা /১৩৭
বোরছায় /১৪০
করাচীর আড়াই দিন /১৪১
ইসলামী সমাজের জন্য প্রকৃত সংকট ও শংকা /১৪২
নেয়ামতের শোকর ও বিচক্ষণতাপূর্ণ তুলনা /১৪৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইংল্যান্ড, আলজেরিয়া ও হিজাযের সফর, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের
ইসলামিক সেন্টার এবং আলজেরিয়ার
'ইসলামী চিন্তাধারার মিলনায়তন'-এর সেমিনারে অংশগ্রহণ,
হিজাযে কয়েকদিনের অবস্থান ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ
অক্সফোর্ড ইসলামিক সেন্টারে /১৪৭
আলজেরিয়ার সেমিনারে /১৪৮
সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ /১৪৯

পুরনো বন্ধু মাওলানা হাফেয মুহাম্মদ এমরান খান
সাহেব নদভীর পরলোকগমন /১৫৪
হারাম শরীফের ইমাম ও 'রাবেতা আলমে ইসলামী'র
মহাসচিবের লক্ষ্ণৌ ও দারুল উলূমে আগমন /১৫৫
সপ্তম অধ্যায়
দিল্লী, নাগপুর ও পুনায় সংলাপ
যে ডালে নীড় /১৫৮
নাগপুর সংলাপ /১৬৩
দ্বিতীয় সম্মেলন /১৬৫
পুনা সংলাপ /১৬৬
একটি সম্মেলন /১৬৭
প্রবন্ধের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপাদ্য /১৬৮
অন্যান্য সভা /১৭১
অষ্টম অধ্যায়
রাবেতা আদবে ইসলামীর সম্মেলন
নদওয়াতুল উলামায় রাবেতার সম্মেলন /১৭৪
জামিয়া হেদায়েত জয়পুরে রাবেতার সেমিনার /১৭৫
পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও সাহিত্যের বিপথগামিতা, ব্যর্থতা
ও লক্ষ্যভ্রষ্টতার মৌলিক কারণ /১৭৮
পৃথিবীর জ্ঞান, চিন্তা ও সাহিত্যের নেতৃত্ব :
মুসলমানদের অবস্থান ও দায়িত্ব /১৮১
নবম অধ্যায়
মালয়েশিয়া পরিভ্রমণ এবং সেখানকার বিভিন্ন
সম্মেলন ও মুসলিম সংগঠনের উদ্দেশে বক্তৃতা
মালয়েশিয়া সফর : দাওয়াত ও আন্দোলন /১৮৭
দিল্লী থেকে কুয়ালালামপুর /১৮৮
ত্রিঙ্গানু সফর : প্রদত্ত এক রাশ বক্তৃতা /১৯০
মুসলিম বিশ্বে অস্থিরতা জনগণ ও সরকারের মাঝে সংঘাতের কারণ /১৯২
কাদাহ সফর ও ভাষণসমূহ /১৯৩
দ্বীনের তরুণ দাঈ ও ঝাণ্ডাবাহীদের মার্জিত আচরণ
এবং ঈমানী জীবনের স্তরসমূহ /১৯৪
কুয়ালালামপুরের শেষ দিন /১৯৭
দশম অধ্যায়
আয়াতুল্লাহ খোমেনির বিরোধিতা : শিয়া ইসনা আশারিয়া সম্প্রদায়ের
কতিপয় স্বীকৃত আকিদাও দ্বিমুখী দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনামূলক লেখা
ইরানি বিপ্লব ও তার যাদুকরি প্রভাব /১৯৯

একটি অপ্রত্যাশিত প্রতিবাদ /২০১
মোহ ও আকর্ষণ সৃষ্টির কারণ /২০২
মাওলানা মানযুর নুমানীর কিতাব 'ইরানি বিপ্লব,
ইমাম খোমেনি ও শিয়া মতবাদ' /২০৩
দু'টি বিপ্রতীপ চিত্র /২০৪
কতিপয় ঘনিষ্ঠজনের বিস্ময় ও লেখকের নিশ্চিন্ত স্বস্তি /২০৬

একাদশ অধ্যায়

মিরাটের বিভীষিকাময় দাঙ্গা : দেশের ভেতরে ও বাইরে কয়েকটি সফর প্রসঙ্গ

মিরাটের বিভীষিকাপূর্ণ হাঙ্গামা /২০৮
ইংরেজি পত্রিকা THE TELEGRAPH-এ
শ্রী শংকর কৃষ্ণ ঠাকুরের প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি /২০৯
অসুস্থতা ও দিল্লী-মুম্বাইয়ের সফর /২১১
লন্ডন ও কুয়েত সফর /২১২
অক্সফোর্ড ও লন্ডনে /২১৪
ভারত প্রত্যাবর্তন /২১৬

দ্বাদশ অধ্যায়

মধ্যপ্রাচ্য সফর, রাবেতা আলমে ইসলামীর তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান ও সফরে নানা সভা-সেমিনারের ব্যস্ততা

রাবেতার তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন /২১৮
মক্কা-সফর ও রাবেতা কনফারেন্সের ব্যস্ত সময় /২২০
পবিত্র মক্কা ও মদিনার পবিত্রতা সম্পর্কে বক্তৃতা /২২১
দ্বিতীয় অধিবেশন, প্রবন্ধ ও শেষ ভাষণ/২২৪
এক নিরাপদ শহর (মক্কা) এর বৈশিষ্ট্য, প্রতীক ও আবেদন /২৩০
মক্কা ও হারামের আবহ ও প্রতিক্রিয়া /২৩৩
মদিনা তায়্যিবায় উপস্থিতি /২৩৪
মদিনার দিনগুলো /২৩৫
রাবেতা আলমে ইসলামির কয়েকটি সভা /২৩৭
জেদ্দায় একদিনের যাত্রাবিরতি ও একটি সভায় অংশগ্রহণ /২৩৭

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দু'টি সেমিনার, একটি ভয়ানক দুর্ঘটনা দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামায় রাবেতা আদবে ইসলামীর সেমিনার

সাইয়িদ সাবাহুদ্দীন আবদুর রহমান সাহেবের ইন্তেকাল :
একটি অসহনীয় আকস্মিক দুর্ঘটনা /২৪৭
জামিয়া সালাফিয়া বেনারসে 'শায়খুল ইসলাম ইমাম
হাফেয ইবনে তাইমিয়া' শীর্ষক সেমিনার /২৫১

কারওয়ানে যিন্দেগী

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

আম্মান (পূর্ব জর্দান), হেজায, ইয়েমেন সফর ও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে বক্তৃতা ইয়েমেন সফরের অভিজ্ঞতা, প্রতিক্রিয়া ও কারওয়ানে যিন্দেগীর তৃতীয় খণ্ডের রচনার কাজ শুরু

'কারওয়ানে যিন্দেগী'র দ্বিতীয় খণ্ড শেষ হয়েছিল আরব আমিরাত ও কুয়েত-সফরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েই। সফরটির শুরু ছিল ১৫ নভেম্বর ১৯৮৩ খ্রি. এবং ১১ ডিসেম্বর ১৯৮৩ খ্রি. তা শেষ হয়। 'কারওয়ানে যিন্দেগী'র কাজ অব্যাহত ও জীবনের সফরের ধারা চলমান থাকার বিষয়টি (সুস্থতার হাল, নানা রোগ-ব্যাধি-দুর্বলতা, স্বাস্থ্যগত অবনতি ক্রমেই জেঁকে বসার অবস্থাদৃষ্টে) সংশয়পূর্ণ মনে হচ্ছিল। এদিকে গ্রন্থের কলেবরও তখন ৩৮৯ পৃষ্ঠা ছুঁয়েছে। এসব ভেবেচিন্তে লেখা ওখানেই বন্ধ করে দিতে হয়েছিল।

কিন্তু এরপরও জীবনের কিছু সময় যাপিত হলো। এ চার বছরে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সফর, ভারত ও মুসলিমবিশ্বের মাঝে ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ কতিপয় ঘটনা যেমন– ভারতীয় মুসলমানদের বড় ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া প্রসঙ্গ, যার সঙ্গে বর্তমান লেখকের সরাসরি সম্পৃক্ততা ছিলো; দেশের বাইরে এমন কিছু উপলক্ষ্য ও সম্মেলনে উপস্থিত থাকার সুযোগ ঘটছিল, যা লিপিবদ্ধ হয়ে সংরক্ষিত থাকা ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহন করে। একই সঙ্গে তা নতুন প্রজন্মের মুসলমানদের জন্য জন্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞানের খোরাক হতে পারে। অধিকন্তু, এর সবকিছু থেকে আগামী দিনের ইতিহাস-রচয়িতাদের জন্য চলমান ইতিহাসের বিন্যাস ও পূর্ণতা চিত্রায়নের উপকরণ মিলবে। তাই এ কাগজের নৌকাটি 'বিসমিল্লাহি মাজরেহা' বলে আবারে নতুন পানিতে ভাসাতে হলো।

আম্মান (পূর্ব জর্দান), হিজায ও ইয়েমেনের ঐতিহাসিক সফর

আমি কয়েক বছর থেকে পূর্ব জর্দানের গবেষণা ও শিক্ষাবিষয়ক প্রতিষ্ঠান 'মুআস্‌সাসাতু আ'লিল বাইত' এর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে

যাচ্ছিলাম– যার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে রয়েছেন হাশেমী রাজবংশের যুবরাজ ও অত্যন্ত মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব হাসান ইবন্ তালাল। তিনি সংস্থাটির তৎপরতার ব্যাপারে খুবই উৎসাহ-উদ্দীপনা পোষণ এবং এর সঙ্গে নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত রেখেছেন। সংস্থার বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থিতির ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে তাঁর পক্ষ থেকেও বিশেষ তাগাদা দিয়ে একটি চিঠি প্রেরণ করা হয়। কিন্তু এ পর্যন্ত একবারও সম্মেলনে উপস্থিত হবার সুযোগ ঘটেনি।

শেষে ১৯৮৪ সালের মার্চ বা এপ্রিলের শুরুর দিকে আবারও সেই দাওয়াতনামা ও হাসান ইবন্ তালালের 'তাগাদাপত্র' যথারীতি এসে হাজির। উল্লেখ করা হয়েছে, ২৫-২৯ এপ্রিল ১৯৮৪ তারিখের মধ্যে জর্দানের আম্মানে ইসলামি তাহযীব-তামাদ্দুন একাডেমির তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনের তারিখ চূড়ান্ত করা হয়েছে। যেখানে মুসলিম বিশ্বের খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী, গবেষক ও বিজ্ঞজনদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হবে, সেই সঙ্গে মতবিনিময়ও। বারবার অপারগতা প্রকাশ করতে আমি কিছুটা কুণ্ঠিত হলাম। বিশেষত, অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব হাসান ইবন্ তালাল যিনি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে কয়েকবার স্মরণ করেছেন এবং আমার অংশগ্রহণের ব্যাপারে বেশ উৎসাহ দেখিয়েছেন। এবারে আমি আম্মান সফরের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। সংস্থার দায়িত্বশীলদের এ ব্যাপারে অবহিত করা হলো, একই সাথে সম্মেলনে পাঠ করার জন্য ভারতীয় মুসলমানদের সাংস্কৃতিক পরিপার্শ্ব, ইসলামি জীবনাচার, ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মুসলমানদের অবদান প্রভৃতি বিষয়ে একটি প্রবন্ধও তৈরি হলো। এবারের সফরে আমার ভাতিজা ওয়ায়েহ হাসানী নদভীকে (শিক্ষক, নদওয়াতুল উলামা লাক্ষ্ণৌ ও সম্পাদক আর রায়িদ)-কে সঙ্গী হিসেবে নিলাম যাতে সেখানকার পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বিভিন্ন সময় শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ে মতবিনিময় প্রভৃতিতে সে আমাকে সহযোগিতা করতে পারে। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের জন্য সাক্ষাৎকারের ও বক্তৃতা কপি প্রস্তুত করা ইত্যাদি কাজেও তার সহযোগিতা নিতে পারবো। কারণ, একাজে তার সাবলীল প্রতিভায় আমি প্রায় সময় উপকৃত হয়েছি।

এ সম্মেলনে আরববিশ্বের বিপুলসংখ্যক উঁচুমাপের শিক্ষাবিদ, সমাজচিন্তক ও সাহিত্যিকদের জমায়েত ঘটে; (বিশেষত, নির্বিঘ্নে সফরের সুবিধা ও একজন রাষ্ট্রীয় ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতার কারণে)। এখানে বিভিন্ন ধারা ও ঘরানার চিন্তাশীল প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাতের এক মূল্যবান সুযোগ ঘটতে চলেছে। এ সফর থেকে হিজায ও ইয়েমেন সফরের

ব্যাপারটিও মনস্থ করলাম। ইয়েমেন থেকে আমন্ত্রণ আগেই এসেছিল। অন্যদিকে, হিজায সফরের নেপথ্যে ওমরার আকাঙ্ক্ষা ছাড়াও ওখান থেকে সানা' সফর সহজ হওয়ার বিষয়টিও ছিল।

আম্মান-এ

২৩ এপ্রিল '৮৪-তে দিল্লী থেকে B.O.A.C বিমানে কুয়েত রওনা হয়ে যাই। সেখানে একদিন ঘনিষ্ঠজনদের[১] সাথে কাটিয়ে ও খানিকটা বিশ্রামের পরে ২৪ এপ্রিল কুয়েতের বিমানে আম্মানের উদ্দেশে বিমানবন্দর ত্যাগ করি। মালেকা আলিয়া বিমানবন্দরে সংস্থার সহ-সভাপতি ফারুক জাররার (সম্ভবত হাসান তালালের ইঙ্গিতে) অভ্যর্থনা জানাতে হাজির হন। তিনি ছাড়াও আম্মানের একাধিক একান্ত প্রিয়মুখ দেখলাম। এর আগে আমার আম্মান সফর হয়েছিল তিনবার। কারওয়ানে যিন্দেগী প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় সে সফরের কথা আলোচিত হয়েছে। বাদশাহ হোসাইন ও যুবরাজ এর দাদা বিখ্যাত ব্যক্তি মালিক আবদুল্লাহ ইবন্ শরীফ হোসাইন-এর সঙ্গে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে বায়তুল মুকাদ্দিস থেকে ফেরার পথে দু'দফা সাক্ষাৎ হয়।[২] আগস্ট ১৯৭৩ সালে বাদশাহ হোসাইনের সঙ্গে দীর্ঘসময়ের সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি আমাকে খুবই সম্মান করেছিলেন।[৩]

এক অসাধারণ সেমিনার

আম্মানে আমি অবস্থান করছিলাম (সেমিনারের পরের দিন মেহমানদের সঙ্গে) বিশতলা বিশিষ্ট অভিজাত হোটেল রিজেন্সি প্যালেসে হয়েছিল। একটি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত এ হোটেলের বারান্দা থেকে প্রায় পুরো আম্মান শহর দেখা যায়। ২৫ এপ্রিল ১৯৮৪ খ্রি. সম্মেলন শুরু হয়। এতে বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকগণ অংশগ্রহণ করেন। সেখানে মস্কো থেকেও একটি ওলামা প্রতিনিধিদল যোগ দেন। যে দলটির নেতৃত্বে ছিলেন সেখানকার ধর্মীয় নেতা মরহুম জিয়াউদ্দিন বাবাহানুফের ছেলে শরফুদ্দিন বাবাহানুফ। প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিগণ ছাড়াও বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত,

১. কুয়েতে আমার দু'জন স্নেহভাজন যথা ইবরাহিম হাসানী নদভী ও সাইয়িদ আহমদ আলী হাসানী নদভীর কাছে ছিলাম।
২. কারওয়ানে যিন্দেগী প্রথম খণ্ড, ৩৮৬ পৃ. দ্রষ্টব্য।
৩. কারওয়ানে যিন্দেগী দ্বিতীয় খণ্ড, ১৬৫-১৬৬ পৃ. দ্রষ্টব্য।

রাজপরিবারের লোকজন ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বাদশাহ্ হাসান তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় বিশেষভাবে আমার নাম উল্লেখ করে আমার আগমনে তিনি আনন্দিত হবার কথা অভিব্যক্ত করেন। আমি তাঁর সঙ্গে একান্ত আলাপে এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। আমি বলেছি, জর্দানকে আমি মুসলমানদের সর্বশেষ প্রতিরক্ষাব্যূহ বিবেচনা করি এবং প্রতিরোধ লড়াইয়ে অংশগ্রহণ প্রত্যেক মুসলমানের অধিকার। এ অনুভূতি আমাকে অসুস্থতার দুর্বলতা ও ব্যস্ততার প্রতিকূলতা এড়িয়ে এ সম্মেলনে অংশগ্রহণে উদ্দীপ্ত করেছে।

ভারতবর্ষে মুসলমান ও তাদের ঐতিহাসিক অবদান

যদিও আমি সেক্রেরিয়েটকে আমার প্রবন্ধ হস্তান্তর করেছি তবুও আমির হাসানের একান্ত আগ্রহে তাঁর সামনে প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য তুলে ধরলাম। মুসলমানেরা দেশসেবার পাশাপাশি কীভাবে নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতি সযত্নে লালন করেছেন, তা উপস্থাপন করি। আরবি ভাষার প্রতি ভালোবাসা, গভীর আন্তরিকতায় আরবি শেখা ও চর্চার বর্ণনাও বাদ যায়নি। রাসূলের ভালোবাসা, হারামাইনের সঙ্গে হৃদয়ের বন্ধন, ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য ও আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার গৌরবময় স্তর পর্যন্ত উঠে আসা প্রভৃতি বিষয় পরপর আলোচনায় স্থান পেয়েছে। সেখানে হাকিমুল ইসলাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর ভারতীয় মুসলমানদের জন্য সেই প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশটিও উদ্ধৃত করি– তারা যেন নিজের মুসলমানিত্বের খাতিরে হারামাইনের সঙ্গে চিরকাল গভীর সম্পর্ক রক্ষা করে এবং সাথে সাথে আরবি ভাষা ও সাহিত্য তা শিক্ষাদীক্ষার প্রতিও সমান গুরুত্বারোপ করে। তিনি স্বীয় পুস্তিকা 'আল মাকালাহ্ আল ওয়াদিয়াহ্ ফিন্ নাসিহাতি ওয়াল ওয়াসিয়াহ্' এর মধ্যে উল্লেখ করেন :

> 'আমরা ভিনদেশি মানুষ। আমাদের পূর্বপুরুষ হিজরত করে ভারতে এসেছিলেন। বংশধারা ও আরবি ভাষার সঙ্গে সম্পৃক্ততা আমাদের জন্য গৌরবের। এটি আমাদের জন্য বিশ্বনবীর নৈকট্য অর্জনের উপলক্ষ্য।'

তিনি আরও লিখেছেন :

> 'আমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি ভাগ্যবান যিনি আরবি সাহিত্য ও ব্যাকরণের জ্ঞান অর্জন করেছেন, যিনি কুরআন-হাদিসের জ্ঞান আহরণ করতে সক্ষম হয়েছেন, হারামাইন শরীফে

হাজির হওয়া আর এর সঙ্গে অটুট বন্ধনও আমাদের জন্য সমান জরুরি। এটি আমাদের সৌভাগ্যের গোপন রহস্য। এসব বিষয় যে এড়িয়ে চলে, সে হতভাগ্য।'

ভারতের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মাওলানা হাকিম আবদুল হাই (রহ.) কর্তৃক রচিত কয়েকটি আরবি পুস্তকের কথাও উল্লেখ করি– যার মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চায় ভারতীয় মুসলমানদের অবদান ও তাদের রচনাবলির নির্ঘণ্ট গ্রন্থটির কথা বিশেষভাবে উঠে এসেছে। এটি আসসাকাফাতুল ইসলামিয়া নামে দামেস্কের মর্যাদাশীল সরকারি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আল মাজমাউল ইলমী আল আরবি[১] এর পক্ষ থেকে ছাপানো হয়েছিল এবং বর্তমানে এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

ফিলিস্তিন ও বায়তুল মুকাদ্দাস ইস্যুতে বাদশাহ্ হাসানের জ্ঞানগর্ভ ও প্রামাণ্য ভাষণ

ইসলামি তাহযীব-তামাদ্দুন ও তার বৈশিষ্ট্য, ঐতিহাসিক অবদান, উত্থান-পতন এবং ইসলামি সংস্কৃতিকেন্দ্রগুলোর যেকোনো তৎপরতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা-অনুসন্ধানের সঙ্গে ফিলিস্তিন ইস্যু ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। বায়তুল মুকাদ্দেস পুনরুদ্ধারের কৌশল ও সংগ্রাম-সাধনার চিন্তার একটি আবহ পুরো সম্মেলন তথা এর প্রতিটি অধিবেশনজুড়েই ছিল। এর কারণগুলোর মধ্যে সম্মেলনস্থল থেকে অদূরে বায়তুল মুকাদ্দাসের ভৌগোলিক অবস্থান, যোগাযোগ-সেতুবন্ধন, এ ইস্যুতে জর্দানের বিশেষ দায়িত্ব এবং আরব পণ্ডিতদের এতো বড় একটি জমায়েত, সর্বোপরি এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল রজব মাসে (যা ইসরা ও মি'রাজের মাস; মি'রাজের স্থান ছিল খোদ মসজিদে আকসা)। সম্পূর্ণ কুদরতী ও স্বাভাবিক এমনকি ধর্মীয় চেতনার দাবিও ছিল ২৭ রজব– যা মি'রাজের দিন, সে তারিখটি পুরোপুরি এ ইস্যুতে আলোচনা হবে।

বাদশাহ নিজেই এ বিষয়টির অবতারণা করেন। বায়তুল মুকাদ্দাস ইস্যুর বিভিন্ন দিক, ইতিহাসের পটভূমি, ইসলাম রাষ্ট্রটির অস্তিত্বই যে মুসলিম বিশ্বের জন্য একটি স্বতন্ত্র সংকট ও ঝুঁকির জন্ম দিয়েছে, সে প্রসঙ্গে বিস্তারিত কথা হলো। তিনি এতদঞ্চল নিয়ে তার নিজস্ব চিন্তাধারা ও সমাধানের একটি রূপরেখা তুলে ধরলেন, যা নিয়ে এ ইস্যুর সঙ্গে সম্পৃক্ত

১. বর্তমান নাম মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়া, দামেস্ক

সকল রাষ্ট্র ও সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের জন্য চিন্তা-ভাবনার দাবি রাখে। আলোচনা চলছিল হোটেল আলবার্তা হলরুমে। হলজুড়ে পিনপতন নীরবতা, সকলেই যুবরাজের গভীর অনুসন্ধান ও তার বিস্তৃত জ্ঞানজগৎ সম্পর্কে বিস্ময়-বিমুগ্ধ ছিল।

লাখো বুদ্ধিমান ঢেকেছে মাথা; একজন প্রতিবাদী রেখেছে জীবনবাজি!

আমির হাসানের বক্তৃতার পরে মন বলছে, আমার কিছু বলার আছে। আমার বক্তৃতার প্রতিপাদ্য ও সারনির্যাস ছিল : পৃথিবীর– বিশেষত ইসলামের ইতিহাস বরাবরই এরূপ সাক্ষ্য হাজির করেছে যে, জাতির ভাগ্য পরিবর্তনে নিয়ামক ও নির্দেশক হিসেবে যে বাস্তবতা মাথা তুলে দাঁড়ায়, বিভিন্ন দেশের শাসন ও রাজনীতির মানচিত্র যে শক্তিই বারবার বদলে দেয়, তা আদৌ সংখ্যার লঘিষ্ঠতা বা গরিষ্ঠতা নয়। প্রকৃতপক্ষে, বৈপ্লবিক শক্তি ও অসম্ভবকে সম্ভব করার মতো ক্যারিশম্যাটিক বস্তুটি হলো ঈমানবিধৌত অবিচল প্রত্যয় ও দৃঢ় বিশ্বাস। এটি পরিবেশ-পরিস্থিতির সকল হিসেব-নিকেশ পাল্টে দিয়ে যেকোনো চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি নিয়ে দৃপ্তশপথে এগিয়ে যাবার প্রেরণায় বিশ্বাসী মানুষকে অস্থির, আন্দোলিত ও নিয়ত উদ্দীপ্ত করে। ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে, এমন সংকল্পবদ্ধ ও অমিততেজ মানুষের সামনে প্রতিপক্ষের শক্তি, সংখ্যা, চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকূলতার কঠিন পাহাড় মোমের মতো গলে যায়। রাতের আঁধার ভেদ করে বিজয়ের সূর্য ও কুয়াশার চাদর চিড়ে সোনালী ভোরের শুভ্রতা তাদের জন্য হাতছানি দেয়। ইতিহাস পৃথিবীর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবী ও হানাদার ক্রুসেডার লড়াইয়ের সারকথা এটাই। ইকবাল এ বাস্তবতাকে তাঁর নিজস্ব আঙ্গিকে এভাবেই তুলে ধরেছেন :

> 'লড়তে যদি চাও তবে মুসার মতো এগিয়ে আসো, এখনও তূর পর্বতের বৃক্ষশাখায় উচ্চকিত হয় 'ভয় পেয়ো না বন্ধু! নিশ্চিন্তে এসো।' রোমীয় এক বয়োবৃদ্ধের সান্নিধ্য আমার সামনে রহস্যের একটি বাতায়ন খুলেছে; লাখো বুদ্ধিমান ঢেকেছে মাথা; একজন প্রতিবাদী রেখেছে জীবনবাজি!'

আলহামদুলিল্লাহ এ বক্তৃতা, উপস্থিত লোকদের আলোড়িত করেছে আর অনেকের চোখে দেখা গেছে অশ্রুরাশি।

আমার ব্যস্ত সময় ও কয়েকটি বক্তৃতা

জর্দানে মোট আটদিন অবস্থান করেছি। রজব মাস হওয়ায় প্রায় প্রত্যেক ভাষণেই 'ইসরা' মি'রাজ, এর অন্তর্নিহিত আবেদন, সূক্ষ্ম রহস্য ও মি'রাজের শিক্ষা ইত্যাদি প্রসঙ্গে ঘুরেফিরে এসেছে। এসব বক্তৃতায় প্রসঙ্গ হিসেবে আরও ছিল, ইহুদি থেকে ইসলাম গ্রহণকারী আরবের হাতে নেতৃত্ব, ক্ষমতা ও হেদায়ত স্থানান্তরিত হওয়া, রাসুলুল্লাহ (সা.) নবীদের সর্দার ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হওয়ার ঘোষণা এবং সে ধারাবাহিকতায় তাঁর উম্মত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি হওয়ার পরিষ্কার নির্দেশনা প্রভৃতি। বিশেষত, রজবের ২৭ তারিখ এ বিষয়ে আলাদা একটি ভাষণ দেয়া হয় জর্দানের সাইয়িদিনা ওমর ইবনুল খাত্তাব মসজিদে। শবে মি'রাজের বৈশিষ্ট্যগত কারণ বা উপলক্ষ্যে সেখানে উপস্থিত জনতার সংখ্যা ছিল বিপুল। বিরাট জামে মসজিদটিতে জায়গা সংকুলান না হওয়ায় বাইরে অনেক দূরে পর্যন্ত মানুষ দাঁড়িয়ে আলোচনা শুনছিলো।

দ্বিতীয় ভাষণটি ছিলো ২৯ রজব ইরবিদের জামিয়া ইয়ারমুক [১] (Yarmook University)-এর হল রুমে। সে ভাষণে ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলমানদের দূরপ্রসারী বিজয় প্রসঙ্গ, সে যুদ্ধের শিক্ষা-বিষয়ে আলোচনার পাশপাশি ইসলামী ও ঈমানী স্বাতন্ত্র্যবোধে উজ্জীবিত হবার আহ্বান জানানো হলো, যা ইসলামী শক্তির সকল বিজয়ের চিরায়ত রহস্য। ইসলামের গৌরবময় ইতিহাস ও স্মৃতিবিজড়িত এসব জায়গার সঙ্গে আজও যে ভারতীয় মুসলমানদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান তা অনুধাবনের জন্য বলছি, ১৯৫৬ সালে আমি যখন দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে গিয়েছিলাম, তখন আমার সম্মানিত বন্ধু দামেস্ক ইউনিভার্সিটির শরীয়াহ্ ফ্যাকাল্টির ডীন ড. মুস্তফা আস সাবাঈ'র আতিথেয়তায় আমি দামেস্কের হোটেল ইয়ার্মুকে উঠেছিলাম। সে সময় আমি ভারতের বিখ্যাত লেখক ও বরেণ্য আলিম হায়দারাবাদ ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাওলানা মানাযির আহসান গিলানী (যাকে আমি শিক্ষকের মতো শ্রদ্ধা করি) কাছে একটি চিঠি লিখছিলাম। চিঠির খামে হোটেল ইয়ারমুক কথাটি লেখা ছিল। তাঁর জানা ছিল না যে, এটি ইয়ারমুকের ময়দান থেকে বহু মাইল দূরে। শুধু চিঠির গায়ে 'ইয়ারমুক' শব্দটি দেখে তাঁর কী প্রক্রিয়া হয়েছিল সেটি বোঝার সুবিধার্থে পাঠকের

---

১. ইয়ারমুক ময়দানটি এ প্রাচীন নগরীর সামনেই। এর কাছে উম্মে কায়েস পাহাড়ের দাঁড়িয়ে ইয়ারমুক নদী ও গোলান মালভূমির পাহাড়গুলো পরিষ্কার চোখে পড়ে। এ কারণে এটির নাম রাখা হয়েছে ইয়ারমুক ইউনিভার্সিটি।

সামনে মানাযির আহসান গিলানীর পত্রোত্তরের কিছু অংশ শোনাতে চাই। তখন তিনি হৃদপিণ্ডের একটি রোগে (এ্যানজাইনা) আক্রান্ত হয়ে পাটনার একটি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন।

> 'আল্লাহই ভালো জানেন, উত্থান-পতনের ধারায় ইতিহাস আজ ইয়ারমুকের কতো স্মৃতি তার বুকে ধারণ করে রেখেছে, যার চেতনা ও প্রেরণা রক্তের শিরা-উপশিরায় আজও ঝড় তোলে। চিঠির গায়ে শুধু ইয়ারমুক শব্দটি দেখে আমি কল্পনার জগতে বিচরণ ও অবগাহন করি; আপনার ভ্রমণ সম্পর্কিত তথ্যটি আমাকে ইয়ারমুক প্রান্তর ও ইয়ারমুক নদীর তীরে হারিয়ে যাবার সুযোগ করে দিয়েছে।'[১]

সম্মেলনের শেষের দিন আমি আমার প্রিয় সফরসঙ্গীর সাথে দারুল বশর-এর অতিথিশালায় উঠলাম।

শেষ বক্তৃতাটি ছিল শা'বানের ১ তারিখ আম্মানের বিখ্যাত কুল্লিয়াতুল উলুমিল আরবিয়ায়। ইউনিভার্সিটি সদৃশ এ কলেজটিতে হাজার হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে থাকে। বক্তৃতায় মি'রাজের নববীর (সা.) আলোকে জাতীয় ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে ইসলামি ব্যক্তিত্বের আপন স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন রাখা ও এর অন্তর্নিহিত শক্তিকে আবারো সক্রিয় করার আহ্বান উচ্চারিত হয়েছে, যা বস্তুগত সভ্যতার উন্নতি শীর্ষস্থানীয় রোম ও পারস্যের মতো দু'টি জাতির উপর জয় লাভ করেছিল, একটি নতুন অঙ্গীকার ঘোষণা এবং অন্যটি নতুন জাতির গোড়াপত্তন করে। কলেজের পক্ষ থেকে আমাকে মর্মর পাথরে বাঁধানো বায়তুল মুকাদ্দাসের একটি সুদৃশ নকশা উপহার ও স্মৃতি হিসেবে দেয়া হয়।

আসহাবে কাহাফের গুহা

সম্মেলন শেষে সেখানে দু'দিন অবস্থান করি এবং আম্মানের ড. রফিক ওয়া আদ্দুজানীর সাহচর্য ও নির্দেশনায় (যিনি নৃতাত্ত্বিক পুরাকীর্তি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং বিভাগীয় ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন) রজিব পর্বতে আসহাবে কাহাফের ঐতিহাসিক গুহাটি পরিদর্শন করি। এটি আম্মান থেকে ৮ কি.মি. দক্ষিণে অবস্থিত। ড. রফিক ওয়া আদ্দুজানীর পর্যবেক্ষণ মতে, এটিই পবিত্র

---

১. পুরানে চেরাগ, খণ্ড-১, পৃ. ৯১

কুরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহাফের গুহা। আমি এখানে অবতরণ করি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একজন বিশেষজ্ঞের সাথে গভীর ও বিস্তারিতভাবে তা প্রত্যক্ষ করি। পবিত্র কুরআনের আয়াতে এ গর্তের যেসব বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, তা এখানে বাস্তবে মিলে গেছে বলেই আমার কাছে প্রতীয়মান হয়। ড. রফিক ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের নিদর্শনাবলির তথ্য-প্রমাণের আলোকে তা প্রমাণিত করেন। খননকালে যেসব শিলা উদ্ধার করা হয়েছে, তাতেও এটি সত্যায়িত হয়েছে– যেখানে কাহাফের নাম লেখা হয়েছে 'কাহাফ আর রাজিম' হিসেবে। বিভিন্ন মুসলিম শাসনের মুদ্রাও আবিষ্কার করা যায়, তাতে সন-তারিখ খুদিত ছিলো। এ গর্তে এখনও ৮টি কবর আছে। মুসলিম ইতিহাসবিদগণের মধ্যে মুকাদ্দাসী, আলবেরুনী ও ইয়াকুত প্রমুখের অভিমত হলো, এটাই আসহাবে কাহাফের গুহা। ফরাসি প্রাচ্যবিদ 'গানো'র অভিমতও এমতকে সমর্থন করে।[১]

আম্মান শহরে বন্ধু-বান্ধব ও কয়েকটি সভা-সমিতি

আটদিনের এ সফরে বেশিরভাগ সময় আমার পুরনো সুযোগ্য আরবি বন্ধু ও লেখক ইবরাহিম শাকরার সঙ্গে কেটেছে, যিনি ১৯৭৫ সালে নাদওয়াতুল ওলামার ৮৫ তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য আম্মান থেকে এসেছিলেন। সে অনুষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মসূচি, প্রস্তাবনা ও পরিকল্পনায় তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। তিনি ওয়াকফ মন্ত্রণালয়ের আল কুদ্‌স বিভাগের প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন। বিভিন্ন সভা-সেমিনারে অংশগ্রহণ এবং শহরের বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াতে তিনি বরাবরই আমাদের দু'জনের সঙ্গে

---

১. দেখুন, ড. রফিক দুজ্জানীর গ্রন্থ كهف أهل الكهف (কাহাফ আহলুল কাহাফ), তিনি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনে অভিসন্দর্ভ হিসেবে এটি উপস্থাপন করেন। এতে তিনি প্রমাণ করেন, আসহাবে কাহাফের শহর আনাতোলিয়ার অন্যতম নগরী 'আফসীস' নয় এর সেটি তুরস্কের বর্তমান আযমি নগরী থেকে ৬০ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত। [বর্তমান লেখক তার আস সুরা' বাইনাল ঈমান ওয়াল গারব (ইসলাম ও বস্তুবাদের দ্বন্দ্ব) গ্রন্থে অবলম্বন করেছেন] সেখানেও বলা হয়েছে, দামেস্কের এ জায়গাটিতেই আসহাবে কাহাফের গুহা অবস্থিত। তিনি সেখানে অকাট্য দলিল-প্রমাণ হাজির করেন। এর সত্যতা ও বাস্তবতার সপক্ষে বেশ কিছু নিদর্শনাবলিও পেশ করেছেন। এটি যুক্তির বিপরীতও নয়। কারণ, বর্তমান পূর্ব জর্দান তৎকালের রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এর পুরনো নাম ছিলো ফিলাডেলফিয়া– যে নামে আমেরিকায় একটি নগরীর নামকরণ করা হয়।

ছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি আরব জাহানের মর্যাদাশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মুআসসাতুর রিসালাহ্ ও দারুল বশির এর স্বত্বাধিকারী রিদওয়ান দা'ভুল-এর সঙ্গেও বেশ সময় কেটেছে, যিনি আম্মানে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এর প্রধান হিসেবে নিয়োজিত আছেন, শায়খ শোয়াইব আর্‌নাউত। তারা দু'জন ছাড়াও আমার আরেকজন পুরনো বন্ধু ইখওয়ানের আবদুর রহমান খলিফার সান্নিধ্যের কারণে (যিনি ইখওয়ানের অন্যতম কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তি) এ সফরে মোটেও একাকিত্ব বোধ হয়নি।

মাজমাউল বুহুস ছাড়াও মসজিদে সালাহুদ্দিন (যার ইমাম হলেন শায়খ মুহাম্মদ ইবরাহিম শাকরা)-এ জুমার নামাযের পর বয়ান করা হয়। এ ভাষণে মুজাহিদে ইসলাম সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবীর ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। মসজিদের সঙ্গে এ মনীষীর সম্পর্ক, তার নামে এর নামকরণ, চলমান পরিস্থিতির দাবি সব মিলিয়ে বক্তৃতা বেশ জমে উঠেছিল এবং সাবলীল আলোচনা হয়েছিল। আম্মানে তাবলীগ জামাতের মারকায ও এর যিম্মাদার ও নীতিনির্ধারক বন্ধুদের সামনে কিছু কথা বলার সুযোগ ঘটেছিল। সে বক্তৃতায় যিকির-আযকার ও ইবাদাতের পাশাপাশি আখলাক ও লেনদেন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। দ্বীনের দাওয়াতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক দায়িত্ব সম্পর্কে কতিপয় নির্দেশনা তুলে ধরা হয়।

একই সঙ্গে দাওয়াতী তৎপরতায় সংশ্লিষ্টদের অধ্যয়নের পরামর্শও দেয়া হয়। আরও বলা হয়, দ্বীনের দাঈদের জন্য সর্বশেষ পরিস্থিতি-পারিপার্শ্বিকতার ব্যাপারে যথাযথ ওয়াকিবহাল থাকা জরুরি। সময়ের দাবি, বিদ্যমান সংকট ও সম্ভাবনার দিকেও সর্বদা সজাগ দৃষ্টি থাকা চাই। তাদের গভীরভাবে ভাবতে হবে, সমাজের চিন্তানৈতিক অগ্রাধিকার ও অভিমুখ কোন দিকে? আমাদের চারপাশে কোন্ ধরনের আন্দোলন চলছে? ইসলাম ও মুসলমানকে কীরূপ চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে? অন্যথায় তারা না জীবনে কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারবেন আর না সমাজে। অনুরূপভাবে, ধর্মীয় ক্ষেত্রেও কার্যকর কোনো প্রভাব সৃষ্টিতে ব্যর্থ হবেন।

ড. কবি ইকবাল বলেন, "যে পর্যন্ত বিরাজিত বাস্তবতা তোমার চোখের সামনে থাকবে না সে পর্যন্ত তোমার রোগ-নির্ণায়ক থার্মোমিটার স্রেফ একটি পাথরতুল্য শীশার টুকরো।" আম্মানের সম্মানিত বন্ধুদের মধ্যে ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত উস্তাদ কামিল আশ শরীফ অন্যতম পুরনো বন্ধুস্থানীয়। তিনি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পূর্ব জর্দানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। রাবেতা আলমে ইসলামীর

(মক্কাভিত্তিক) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তিনি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। তিনি তাঁর বাড়িতে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন, যেখানে আমার পুরনো শুভার্থী (পূর্ব জর্দানের সাবেক ওয়াকফ ও শিক্ষামন্ত্রী), খ্যাতিমান আরবি সাহিত্যিক, কবি ওমর বাহাও আল-আমিরী (সিরিয়ার সাবেক রাষ্ট্রদূত) ইবরাহিম শাকরা, কামাল আবুল মাজেদ ছাড়াও কতিপয় বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অনুষ্ঠানের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় ছিলো, বিশ্বব্যাপী ইসলামি আন্দোলনসমূহের তৎপরতা পর্যালোচনা এবং শাসকশ্রেণীর সাথে তাদের পারস্পরিক অবস্থান নিরূপণ করা। এ প্রসঙ্গে ওমর বাহাউল আমিরীর অবস্থান হলো, শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ ও বোঝাপড়ার সম্পর্কই অধিকতর সুফলদায়ক হতে পারে। এরপরে রিদওয়ান দাভুলের বাড়িতেও অনেক শিক্ষিত সুধীজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, পাশ্চাত্যের খ্যাতনামা পণ্ডিত মাহদী ইব্ন আব্বুদ, আবু ধাবীর প্রধান বিচারপতি শাইখ আহমদ ইব্ন আবদুল আযিয আল-মুবারক, সিরিয়ার (বর্তমানে রাবাতে বসবাস করেন) প্রখ্যাত আরব্য কবি ও পাকিস্তান এবং সউদী আরবে সিরিয়ার সাবেক রাষ্ট্রদূত বাহাউল আমিরী, মিসরের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ড. ইউসুফ আল-কারযাভী (কাতার ইউনিভার্সিটির শরীয়া বিভাগের চেয়ারম্যান) ও ইখওয়ানের সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও দাঈ শাইখ মুহাম্মদ আল-গাজালী প্রমুখ।

যুবরাজের একটি আমন্ত্রণেও যোগ দেয়ার সুযোগ হয়েছিল। সে অনুষ্ঠানে ওমানের (মাসকাট) এর মুফতি হামদ আল খলিলীও উপস্থিত ছিলেন, যিনি সেদেশের আমিরের সামনে আমার লেখা 'রাওয়ায়িউ ইকবাল' থেকে বেশ কয়েক ছত্র পাঠ করে শোনাচ্ছিলেন।

২ মে স্থানীয় সময় আনুমানিক দুপুর ২ টায় বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা হলাম। বেশ কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব আমাদের এগিয়ে দিতে এসেছিলেন। সংস্থার চেয়ারম্যান ড. নাসিরুদ্দিন আল-আসাদ (সম্ভবত বাদশাহ্ হাসানের ইঙ্গিত ও আগ্রহে) স্বয়ং বিমানবন্দরে উপস্থিত হন। বিমানে ওঠার আগ পর্যন্ত তিনি আমাদের সরকারি ভিভিআইপি কক্ষে বসিয়েছেন এবং ভিভিআইপি রোড দিয়ে বিমানে তুলে দেন। আম্মান থেকে সউদী বিমানে সেদিন সন্ধ্যায় জেদ্দা পৌঁছলাম। সঙ্গে ছিলেন ড. মুখতারুদ্দিন আরজু (আলীগড় ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, যিনি সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য ভারত থেকেই একসঙ্গে এসেছিলেন)। তিনি হেজায থেকে ভারতের উদ্দেশে রওনা হয়ে যান।

পবিত্র হেজায ভূমিতে

২ মে ১৯৮৪ আম্মান থেকে রওনা হয়ে সেদিনই সন্ধ্যায় জেদ্দা পৌঁছি। আগে থেকেই নিয়ত করেছি, মদিনা থেকে ইহ্‌রাম বাঁধবো এবং প্রথমেই সেখানে হাজিরা দেবো। তাই ইহ্‌রাম ছাড়াও সফর করলাম। পুরনো অভ্যাসমাফিক রাতটা কাটালাম জেদ্দায় নূর ওয়ালির বাসাতে।[১] ৩ মে সকালে স্নেহের ভাই সাইয়িদ হাসান তারেকের সঙ্গে (যিনি মদিনার টেলিফোন বিভাগে কর্মরত আছেন) মদিনার উদ্দেশে রওনা হয়ে যাই। ওখানে চারদিন অবস্থান করি। উদ্দেশ্য কেবলই রাসুলের রওযা মুবারকে হাজিরা, মসজিদে নববীতে উপস্থিতি এবং দরুদ ও সালাম প্রেরণ। তাই সেখানে কোনো কর্মসূচি রাখা হয়নি। বিশ্রামকক্ষে মদিনা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, ছাত্ররা মাঝে মাঝে এসে দেখা করছিলেন।

ইয়েমেন সফরের ব্যাপারে বিলম্ব, মৌসুমের রুক্ষতা আর একারণে মূল আমন্ত্রণটি ছিলো মাকতাবাতুত তাওজীহ ওয়াল ইরশাদ (আল হাইয়াতুল আ'ম্মাহ লিল মাআহিদুল ইলমিয়্যাহ) ও ইত্তেহাদুল তুল্লাবিল ইয়ামান-এর ফেডারেশনের পক্ষ থেকে। সম্ভবত সময়টি ছিলো মাদরাসমূহের পরীক্ষার মৌসুম। ইয়েমেন সফরের ব্যাপারে বেশ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। সফরটি মুলতবি করার ইচ্ছাই প্রবল ছিলো। কিন্তু মদিনা ইসলামিক ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞ শিক্ষক আবদুল্লাহ কাদেরী– যিনি ইয়েমেনি বংশোদ্ভূত এবং সেখানে প্রশাসনিক লোকদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখেন– সফরের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করে মৌসুম গরম হবে না বলে আশ্বস্ত করলেন আর বললেন, এ সফরে ছাত্রদের পরীক্ষা কোনো প্রভাব পড়বে না। তিনি সফর সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও নিজের কাঁধে তুলে নিলেন এবং ইয়েমেনের রাজধানী সানায় যোগাযোগ করলেন। জেদ্দায় জমিয়তে ইত্তেহাদুত্ তোলাবার মুখপাত্রও এ ব্যাপারে তাকে সহযোগিতা করলেন। সে পর্যন্ত সফরের সিদ্ধান্তই নিলাম।

---

১. আবদুল গনি নূর ওয়ালির নামে জেদ্দায় প্রসিদ্ধ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান আছে, যার স্বত্বাধিকারী ভারতে একটি প্রাচীন ধর্মপ্রাণ গোত্র, যারা প্রায় এক শতক আগে গুজরাট থেকে এখানে থিতু হয়েছে। তারা নূর ওয়ালি হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে এর হর্তাকর্তা আলহাজ্ব আবদুল কাদের নূর ওয়ালি। '৬২ খ্রি. থেকে আমি জেদ্দা ও মদিনায় তাদের কাছে থাকি। তাদের চাচাতো ভাই মুহাম্মদ ওয়ালি আবদুল্লাহ নূর ওয়ালির সঙ্গেও আমার একান্ত ঘনিষ্ঠতা আছে।

রাবেতা আদবে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা

৭ মে মদিনা তায়্যিবা থেকে জেদ্দা রওনা হই। মক্কায় গিয়ে ওমরা পালন করলাম। সেখানে শীর্ষস্থানীয় একদল আরবি সাহিত্যিক দেখা করতে এলেন। তাদের মধ্যে রিয়াদের ইমাম মুহাম্মদ ইবন্ সউদ ইউনিভার্সিটি ও মদিনা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, ড. আবদুল বাসেত বদর, হায়দার গাদির ও ড. আবদুল কুদ্দুস আবু সালেহও ছিলেন। তারা রিয়াদ ও মদিনা থেকে বিশেষ উদ্দেশ্যেই মক্কায় এসেছেন। তাঁরা রাবেতা আদবে ইসলামীর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তুলে ধরেন এবং গঠনতন্ত্রের খসড়াও উপস্থাপন করেন। আমাকে এর প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের এবং সংগঠনটিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রূপদানের অনুমতি দিতে আশা ব্যক্ত করেন।[১]

আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, আরব্য বিদ্যোৎসাহীদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হবে। মরক্কো, আলজেরিয়া থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশ থেকে লেখক-সাহিত্যিকদের সংগঠনটির সদস্য হবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। সিদ্ধান্ত হয়, আগামী বছর সংস্থার সম্মেলন হবে লক্ষ্ণৌ। এছাড়াও সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় হবে নাদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌতে। আমার স্নেহভাজন আরবি অনুষদের প্রধান রাবে' হাসানী নদভী রাবেতার সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

---

১. সংগঠনটির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যাবতীয় তৎপরতার প্রধান সঞ্চালক ইমাম মুহাম্মদ ইবন্ সাউদ ইউনিভার্সিটির সাহিত্য বিভাগের চেয়ারম্যান ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা। আরবি সাহিত্যিকদের আরেক আসরে তিনি আমাকে বলেছিলেন, "ইসলামি সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে আরবি সাহিত্যের ইসলামি ক্ষেত্রগুলো অনুসন্ধান ও তা বিকশিত করার জন্যে ইসলামি গ্রন্থাগারগুলো পুনরুজ্জীবিত করার প্রথম প্রেরণা পেয়েছি আপনার 'মুখতারাত' গ্রন্থের ভূমিকা এবং একটি প্রবন্ধ পাঠ করে, যা আপনি সিরিয়ার আল মাজমাউল ইলমী আল আরবির সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর ১৯৫৭ সালে লিখেছিলেন এবং লেখাটি আল মাজমা'র ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন-এ ছাপা হয়েছিল।" ড. পাশা বহু বছর ধরে এ ক্ষেত্রটি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিলেন। এ বিষয়ে বেশকিছু মূল্যবান সংকলন প্রকাশ করেন। নিজের ছাত্রদের তিনি এ লাইনে পিএইচডি প্রস্তুতির কাজ করতে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রয়াসে ইসলামি সাহিত্যের বিশাল এক সমাহার আলোর মুখ দেখেছে। এটি আরবি সাহিত্যিকদের দূরদৃষ্টি ও উদার মনোভাবের পরিচায়ক (এটি তাদের জাতীয় ও উত্তরাধিকারগত বৈশিষ্ট্য) যে, তারা একজন অনারব দাঈ ও সাহিত্যকর্মীকে এরূপ সংগঠনের নেতৃত্বভার গ্রহণের জন্য নির্বাচিত করেন।

মুফতি আতিকুর রহমানের ইন্তেকালের সংবাদ

১০ শাবান ১৪০৪ হিজরি, ১২ মে ১৯৮৪ খ্রি. আমরা যখন জেদ্দায় নূর ওয়ালি সাহেবের বাড়িতে অবস্থান করছিলাম তখন দিল্লী থেকে হাফেয কেরামতুল্লাহ ফোন করলেন, মুফতি আতিকুর রহমান ইন্তেকাল করেছেন এবং জানাযার তারিখ ও সময় নির্ধারিত হয়ে গেছে। যদিও মুফতি সাহেব ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে বরবারই অসুস্থ ছিলেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ খ্রি. দারুল মুসান্নিফীন কর্তৃক আয়োজিত 'ইসলাম ও প্রাচ্যবিদ' শীর্ষক সেমিনার থেকে ফেরার পথেই তিনি স্ট্রোক করেছিলেন। সে অসুস্থতা থেকে তিনি আর সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত অঘটনটি ঘটেই গেলো, যা বেশ কিছুদিন ধরে আশঙ্কা করা হচ্ছিল। কিন্তু সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার কারণে মনে হচ্ছে এটি যেন অচিন্ত্যনীয়, অপ্রত্যাশিত। সমসাময়িক ওলামা, জাতির নেতৃত্বস্থানীয় আলিম– ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর যারা স্তম্ভস্বরূপ, তাদের অন্য কারও সঙ্গে বোধ হয় এমন ঘনিষ্ঠতা আমার ছিল না যে ধরনের অন্তরঙ্গতা মুফতি সাহেবের সঙ্গে ছিলো। 'জীবনের কাফেলা'য় চলার পথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে পরামর্শ, সহযোগিতা, বিভিন্ন সফরে সঙ্গ দেয়া, অভিন্ন চিন্তাধারার দীর্ঘ উপাখ্যান সম্পর্কিত বৃত্তান্ত 'কারাওয়ানে যিন্দেগী' দ্বিতীয় খণ্ডে পাঠক পড়তে পারেন।[১]

খবরটি পেয়ে আমি যারপরনাই মর্মাহত হই। আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘনিষ্ঠজনদের অনুরোধ করলাম তারা যেন মুফতি সাহেবের জন্য ওমরা ও তাওয়াফ করে সওয়াব পৌঁছে দেন। সে সময় ভারতের কয়েক দ্বীনদরদী ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি মক্কা রওনা হচ্ছিলেন। রিয়াদের একটি রেডিও স্টেশন থেকে প্রচারিত এক অনুষ্ঠানে মুফতি সাহেব সম্পর্কে একটি আলোচনা করি, যেখানে দ্বীন, দেশ ও জাতির জন্য তাঁর অবদান, চারিত্রিক গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরা হয়। সেখানে আমি বলেছি, তাঁর ইন্তেকালে ভারতীয় মুসলমানদের মাঝে একটি বড় শূন্যতার সৃষ্টি হলো। এটিও মুফতি সাহেবের জন্য বড় সৌভাগ্য ছিলো যে, ইহকালের সফর শেষে পরকালে পাড়ি জমানোর সেই কঠিন মুহূর্তে তাঁর আপনজনেরা মহান আল্লাহর পবিত্রভূমিতে অবস্থান

---

১. হাফেয কারামত আলী সাহেব দিল্লীর শীর্ষস্থানীয় ঠিকাদারদের একজন। সেই সঙ্গে তিনি ধর্মপ্রাণ মহল, তাবলীগী জামাআতের মারকাযের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করতেন। মারকাযের অদূরেই নিযামুদ্দীন ওয়েস্টে তার বাসা ছিলো। লেখক বেশ কয়েক বছর দিল্লী গেলেই তার কাছে অবস্থান করতেন।

করছিলেন। তাঁর ভক্ত, অনুরক্ত ও বন্ধুরা দোয়া করার চমৎকার পরিবেশ ও তাওফিক হয়েছিলো। এটি আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহ, যা তিনি যাকে ইচ্ছে প্রদান করেন।[১]

ইয়েমেন সফর

ইয়েমেনের সঙ্গে সেতুবন্ধন গড়ে তোলা, এর শ্যামল ভূমির রঙ-রূপ-গন্ধ উপভোগের চিরায়ত আকাঙ্ক্ষা যে কোনো মুসলমানেরই থাকা একটি সহজাত ও প্রাকৃতিক বিষয়। ইয়েমেন সম্পর্কে স্বয়ং নবীর মুখ থেকে এরূপ বাণী নিঃসৃত হয়েছে : "তোমাদের কাছে ইয়েমেনী লোকজন এসেছেন, যারা কোমল হৃদয়ের অধিকারী। ঈমান ইয়েমেনের একটি অংশ আর ধর্মের বোধ ও হিকমত ইয়েমেনের বৈশিষ্ট্যভুক্ত।"[২] কিন্তু আমার জন্য এ সফরের আরেকটি ব্যক্তিগত কারণ ক্রিয়াশীল ছিল, তা হলো আমার আরবি ভাষার রুচি, শিক্ষা ও ব্যুৎপত্তির জন্য আমি যার কাছে ঋণী, তিনি শায়খ খলিল বিন মুহাম্মদ হোসাইন ইয়েমেনী।[৩]

তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে অধিকাংশ ইয়েমেনী বৈশিষ্ট্য বহন করেন এবং এগুলো যেন তার মজ্জাগত ও শিরা-উপশিরায় প্রবহমান। এমন ব্যক্তির সান্নিধ্য পেয়ে ইয়েমেনের প্রতি তীব্র মুগ্ধতা সৃষ্টি না হওয়াই বরং বিস্ময়কর। এর পাশাপাশি আমার হাদিসের সনদ যা শায়খুল হাদিস মাওলানা হায়দার হাসান টুংকী (রহ.)-এর শিষ্য খাতামুল মুহাদ্দিসীন শাইখ হোসাইন ইবন্ মুহসিন ইয়েমেন ভূপালীর সূত্রে প্রাপ্ত, সে সনদের শুরু ও মধ্যভাগের অনেক বর্ণনাকারী ইয়েমেনী। কিন্তু এটি হয়তো ভাগ্যচক্রের বিষয় ছিলো, মধ্যপ্রাচ্যের বহুদেশ (আলজেরিয়া, রাবাত, মরক্কো পর্যন্ত) আর নগরী একাধিকবার সফরের সুযোগ হলেও ইয়েমেন যাওয়া হয়নি আজ অবধি। ১৯৭৬ সালে ইয়েমেন সফরের আমন্ত্রণ এসেছিলো, টিকেটও এসেছিল কিন্তু ভিসাপ্রাপ্তিতে বিলম্বের কারণে সেখানকার সফর মুলতবি করে অন্যান্য সফরের কর্মসূচি (আবুধাবী ইত্যাদি) সম্পন্ন করা হয়। 'প্রতিটি বিষয়ের

---

১. অধিকতর জানার জন্য মুফতি সাহেবের স্মরণে মাসিক বোরহানের বিশেষ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২. সহীহ বুখারী (কিতাবুল মাগাযি)-তে অন্য বর্ণনায় আছে : ফিকহশাস্ত্র ইয়েমেনের, আর হেকমত ইয়েমেন থেকে প্রাপ্ত সম্পদ।

৩. বিস্তারিত পরিচয়, বৈশিষ্ট্য, যোগ্যতা ইত্যাদি জানতে পড়ুন, 'পুরানে চেরাগ' খণ্ড-১, পৃ. ২২৭-২২৮।

বাস্তবায়ন সময়ের ছকে বাঁধা' প্রবাদটি বহু শতক আগে যেমন বাস্তব ছিলো, আজও সমান বাস্তবানুগ। আমার আরবি গ্রন্থগুলো ইয়েমেন পৌঁছেছে আগেই। কিছু গ্রন্থ সেখানকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সিলেবাসভুক্তও হয়েছে। ফলে, সেখানকার আলিম-ওলামা, শিক্ষিতসমাজ লেখকগণ আমার লেখার সঙ্গে পরিচিত।

সফরের উদ্যোক্তাদের একজন ছিলেন শিক্ষিত ইয়েমেনী তরুণ আহমদ নাশের। তিনি মদিনা ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রি নিয়েছেন; বর্তমানে ইয়েমেনের মাকতাবাতুত্ তাওজীহ ওয়াল ইরশাদ (জাতীয় মানব উন্নয়ন সংস্থা) এর উপদেষ্টা। দক্ষিণ ইয়েমেনের প্রশাসন– যেখানে ধর্মানুরাগী মানুষ বর্তমানে সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারাও বেশ আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং সহযোগিতা করেছেন। সেখানে গিয়ে তো আরও অবাক হবার পালা। সরকারের পক্ষ থেকে অনেক কিছুই করা হলো, যা ইতোপূর্বে অন্যান্য আরব দেশেও দেখা যায়নি। এমনসব জায়গায় বয়ানের সুযোগ করে দিয়েছে, যেখানে বিদেশিদের প্রবেশাধিকারও নিয়ন্ত্রিত। সেসব অনুষ্ঠানে আলিম, বিচারক, পদস্থ সরকারি কর্মকর্তারাও ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেন, যারা সরকারি ও সাধারণ মানুষ উভয় মহলে সমাদৃত। রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী থেকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জাতীয় সংসদের কর্মকর্তা, তাদের বন্ধু-বান্ধব, শীর্ষস্থানীয় আলিম এবং যাদেরকে দেশের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ভাবা হয়, তারা সকলেই ছিলেন। তাদের কথা স্ব স্ব জায়গায় আলোচনা করা হবে।

রাজধানী সানাআ'তে

১৪ মে সকাল সাড়ে ৭টায় জেদ্দা থেকে সউদী এয়ারলাইন্সযোগে রওনা হলাম। ছাত্রজীবনে 'হামাসা'র একটি কবিতা মনে পড়ে গেলো। 'সফর দীর্ঘ হলেও সানাআ ভ্রমণ করা জরুরি।' এখন বিমানের সফর এ যাত্রার দীর্ঘতাকে কয়েক ঘণ্টায় নিয়ে এসেছে। সোয়া এক ঘণ্টায় আমরা সানা বিমানবন্দরে পৌঁছে গেলাম। বিমানবন্দরে এসেছিলেন, আহমদ আবদাহ নাসের, শাইখ মুহাম্মদ আল মুআয়্যিদ (আদ্ দাওয়া ওয়াল ইরশাদের প্রধান), ইয়েমেন স্টুডেন্ট ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দসহ অন্যান্য অনেকেই। ড. কবি ইকবাল কর্ডোভায় বলেছিলেন,

بوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے

رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے

"আজও এখানে বাতাসে ছড়িয়ে আছে ইয়েমেনের সুরভী
আজও এর আঙ্গিনায় ভেসে বেড়ায় হেজাযের সৌরভ-সুবাস।"

আমরা ইয়েমেনে পৌঁছে গিয়েছি। এক ধরনের আনন্দ ও পুলকিতবোধ করছি। বিমানবন্দরে আগত ব্যক্তিবর্গ সেখানকার দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পন্ন করে আমাকে নিয়ে নগরী অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। এমন একটি এলাকায় গিয়ে তারা মোড় নিলেন, যা খুবই সাদাসিধে কিছু বাড়িঘর চোখে পড়ছে। আমি মনে মনে অবাক হচ্ছি, মেহমানকে রাখার সাধারণত শহরের উন্নতমানের হোটেল ইত্যাদিতে ব্যবস্থা করা হয় অথবা কোনো সম্মানিত ব্যক্তির বড়োসড়ো অভিজাত বাড়িতে। যেখানে তারা আমাকে নিয়ে গেলেন সেখানে দেখছি, কিছু ছাগলও বাঁধা আছে। ভাবছিলাম, তাহলে এখানে থাকতে হবে! বাড়ির দরোজা খোলার পর দেখলাম বেশভূষায় পুরনো ধাঁচের এক বৃদ্ধ আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি আলাপের মাঝে দ্বীনের দাওয়াতি কর্ম ও ইসলামকে বিজয়ী করার লক্ষ্য নিয়ে যারা কাজ করে উভয় দলের ব্যাপারে পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন, "দু'টি কর্মপদ্ধতি রয়েছে একটি হলো, ঈমানদার লোকেরা ক্ষমতার মসনদে স্বয়ং অধিষ্ঠিত হবেন। আর দ্বিতীয়টি হলো, ঈমানদার লোকেরা ক্ষমতার কেন্দ্র পর্যন্ত বিচরণ করবেন (অর্থাৎ ক্ষমতাসীন লোকেরা ইসলামের দাওয়াত কবুল করবেন এবং ইসলামের বিধান ও আদর্শ অনুসরণে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম চালাবেন, এর প্রচলন আর বিকাশের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেবেন)।" তিনি বললেন, "আমি আপনার গ্রন্থাবলি পড়ে বুঝেছি, আপনি দ্বিতীয় পন্থাটির ওপর জোর দিয়েছেন।" আমি একমত হলাম; আর বললাম আমাদের উপমহাদেশে মুজাদ্দিদে আলফেছানী শায়খ আহমদ ফারুকী সারহিন্দি (মৃত্যু : ১০৩৪ খ্রি.) এ পন্থাটি অবলম্বন করেছিলেন। তিনি যে সফলতা পেয়েছিলেন, আমার জানা মতে, গোটা পৃথিবীতে কোনো বিপ্লবের মাধ্যমেও সে পরিমাণ সাফল্য আসেনি। এরপর তিনি উত্তর ইয়েমেনের বর্তমান পরিস্থিতি, কাজের সম্ভাবনা ও পরিবেশ এবং প্রয়োজনীয়তার ওপর সংক্ষিপ্ত কিছু কথা বলেন। এরপরই বৈঠকটির সমাপ্তি টানা হয়।

বৃদ্ধের নাম ছিল শায়খ ইয়াসিন আবদুল আযিয। তিনি একজন আলিম ও দাঈ। সঙ্গীরা বললেন, বিশ্রামের নির্ধারিত জায়গায় পৌঁছার আগে এখানে যাত্রাবিরতির কারণ হলো, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাতে যে ক'দিন ইয়েমেনে অবস্থান করবো তা ভালোমতো কাজে লাগানো যায়। আমার কাছে তাদের এ নতুন কর্মকৌশলটি বেশ পছন্দ হলো। এ

কাজের মধ্য দিয়ে 'আল হিকমাতু ইয়ামানিয়্যাতুন' বা প্রজ্ঞা ইয়েমেনের সম্পদ কথাটির প্রতিবিম্ব নজরে এলো। সেখান থেকে তারা আমাকে নদীর তীরবর্তী 'হোটেল আল হামদ'-এ নিয়ে গেলেন, যা কোনো যুগে রাষ্ট্রপ্রধানের মহল হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এদিকে অবস্থিত একটি মনোরম ছোট্ট কটেজে আমাকে নিয়ে আসা হলো। বাড়িটির একেবারে বারান্দার সামনে পর্যন্ত গাড়ি চলে আসতে পারে। আমি ইয়েমেনে যে ক'দিন থাকবো এ সময়ের মধ্যে বেশি অধিকতর সাফল্য এবং কার্যকর কিছু কর্মসূচির পরিকল্পনা তৈরি করা, তা বাস্তবায়নে অধিকতর সুযোগ-আনুকূল্য সৃষ্টি, সরকারি ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তাদের সাথে উন্মুক্ত মতবিনিময়ের ব্যবস্থায় করার ক্ষেত্রে যাদের বিশেষ ভূমিকা ছিলো, তাদের মধ্যে ইয়েমেনের মাদরাসা বোর্ড (হাইয়াতুল আম্মাহ লিল মাআহিদিল ইলমিয়্যাহ্)-এর চেয়ারম্যান শাইখ ইয়াহইয়া আল ফুসাইয়্যাল ও কাজী আল আরশির নাম প্রণিধানযোগ্য। প্রথমোক্ত ব্যক্তি গণপ্রজাতন্ত্রী (صار جمهورية) ইয়েমেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমানে উপপ্রধানমন্ত্রী (এখানে দুএকটি লাইনের মর্ম আমার কাছে ভালোমতো বোধগম্য ছিল না) এবং জাতীয় পরিষদের সভাপতি হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। দ্বিতীয়জন ইয়েমেনের খুবই সম্মানিত এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব, যার জ্ঞান, যোগ্যতা ও উচ্চনৈতিকতা সর্বজনবিদিত। এছাড়াও পার্লামেন্টের আরেকজন সদস্য হামুদ হাশেম আয যারাজি ও সানা ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ড. আবদুল আযিযের কথাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সানাআ ইউনিভার্সিটিতে ভাষণ

ইয়েমেন পৌঁছার দ্বিতীয় দিন ১৪ শাবান ১৪০৪ হি., ১৫ মে ১৯৮৪ খ্রি. সানাআ ইউনিভার্সিটিতে ভাষণ দেয়ার কর্মসূচি ছিলো। আমি হলে পৌঁছে দেখলাম, ইয়েমেনের শিক্ষিত শ্রেণী এবং শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে হল কানায় কানায় ভর্তি। যারা চেয়ারে আসন পাননি, তারা মেঝেতে বসে পড়েছেন। হলে বাইরে মাঠেও শ্রোতাদের ভিড়। এটি ছিলো ইয়েমেন আমার প্রথমবারের মতো বক্তৃতা। আমার অনুভব হলো, মনের দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে গেছে এবং আলোচনায় আমি বেশ উৎসাহ পাচ্ছি। আমার অন্তরের অবস্থাটি অভিব্যক্ত করতে গিয়ে এভাবেই বক্তৃতা শুরু করি: আপনারা পৃথিবীর বিখ্যাত জলপ্রপাত নায়েগ্রার কথা ভালো করেই জানেন, যা কানাডার সুপরিচিত নগরী টরেন্টোর কাছে। এটি পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম। আমি এটা স্বচক্ষে দেখেছি। একশ' আট মিটার ওপর থেকে সেই প্রপাতের পানি নিচে গড়ায়।

পানি নিচের পড়ে আবার তা লাফিয়ে উঠে ৫৪ মিটার। কিন্তু যে দেশকে আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন, তারা কেবল সেখান থেকে বৈদ্যুতিক শক্তিই উৎপাদন করে। বলা হয়ে থাকে নায়াগ্রা থেকে উৎপাদিত বৈদ্যুতিক শক্তি ৫০ লাখ মেগাওয়াট। সে উৎপাদন থেকে অনেক দূরবর্তী শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। দেশটির সমাজ ও রাষ্ট্র ধরেই নিয়েছে এ জলপ্রপাত থেকে কেবল এটাই প্রাপ্য, যা তারা নিচ্ছে। এর বাইরে তেমন কোনো করণীয় নেই। কিন্তু আজ আমি আপনাদেরকে একটি অন্যরকম জলপ্রপাতের খবর জানাবো, যেখানে সাধারণভাবে পুরো মুসলিম উম্মাহর এবং বিশেষভাবে আপনাদের ইয়েমেনবাসীর বড় অংশীদারি আছে, যার অস্তিত্ব ও শক্তির পক্ষে স্বয়ং মহানবী (সা.) সাক্ষ্য দিয়েছেন, সেটি ঈমানের জলপ্রপাত। মহান আল্লাহ বিশ্বকে বিশেষভাবে আপনাদের দেশ ইয়েমেনকে গৌরবান্বিত করেছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন, "তোমাদের কাছে ইয়েমেনের লোকেরা আগমন করেছে; তারা কোমল হৃদয়ের অধিকারী, ঈমান তো ইয়েমেন থেকে উৎসারিত আর হিকমত সে ইয়েমেনের সম্পদ।"

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও পরাশক্তি নানা সম্পদের মালিক কিন্তু তাদের কাছে তো এ ঈমানের এই জলপ্রপাত নেই। এর কারণ, তারা নিরেট বস্তুবাদী, শক্তির পূজারী, প্রবৃত্তির দাস, কেউ কেউ দলকানা ও দলীয় হঠকারিতায় অন্ধ।' আমি তাদের সামনে পশ্চিমা দুনিয়ার চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে বলেছি, আজও মুসলিম বিশ্ব এবং মুসলমান জাতি এমন কতিপয় অনন্য বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, যার সদ্ব্যবহার হলে অনেক বড় কল্যাণ সাধিত হবে, পৃথিবীতে বিপ্লবাত্মক রূপান্তর ঘটতে পারে। কিন্তু সাধারণ মানুষ সে ব্যাপারে অবিদিত এবং শাসকগোষ্ঠী তাতে শংকিত ও আর কল্পিত আতঙ্কে তটস্থ। ফলে, সে শক্তি অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত হয়ে আছে, যা থেকে কেউ উপকৃত হতে পারছে না। বরং সে শক্তিকে দুর্বল করে দিতে চলছে তাবৎ আয়োজন। সে শক্তিকে বলা হচ্ছে রক্ষণশীলতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা।

আমি তরুণদের উদ্দেশে বলেছি, তোমরা আত্মপরিচয়ের ব্যাপারে অধিকতর সক্রিয় হও, অগ্রবর্তী চিন্তায় স্বাবলম্বী হও। ইকবালের সেই চরণটি আবৃত্তি করে সেই আলোকে বক্তৃতার ভাব পরিষ্কার করতে চাইলাম :

"তুমি পৃথিবীকে দেখেছো অনেক; তবে নিজেই থেকে গেছে নিজের অগোচরে।

যখন অবকাশ কিংবা অবসর পেয়ে যাও, রাতের সেই পুরনো আলোটি জ্বেলে দিও; দেখবে, দূরদর্শিতার দূরবীন তোমার আস্তিনে। দূর আকাশের মহাজগতে পদক্ষেপ রচনা করো, তুমিই বিপুল সম্পদের আকর, তুমিই সমৃদ্ধির খনি। মৃত্যুকে ভয় পাও ওহে শাশ্বত শক্তি ? মৃত্যু এক শিকারী আর তুমি তার নাগালেরও বাইরে!"

বক্তৃতা করার মাঝখানে একটি বিষয় মনে উদয় হলো, যার কারণে স্বয়ং আমার নিজের অন্তরেই এক ধরনের পুলক অনুভূত হলো। আমি বললাম, প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! যদি কোনো চিকিৎসক কাউকে দেখে বলে, তুমি পুরোপুরি সুস্থ; তুমি স্বাস্থ্যগতভাবে বেশ ভালোই আছো। তখন এমনটি সুস্পষ্ট নয় যে, দু'চার দিন পর তিনি ঠিক তেমনি থাকবেন, অসুস্থ হবার কোনো সুযোগ নেই। ডাক্তার তার চিকিৎসাবিদ্যার অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান অবস্থাটা প্রত্যক্ষ করে লোকটিকে আশ্বস্ত করেন কিন্তু মহান আল্লাহর সেই রাসুল– যার বৈশিষ্ট্য হলো 'তিনি ওহীর বাইরে নিজ থেকে (ধর্মীয় কোনো বিষয়ে) কথা বলেন না'– যখন ঘোষণা করেন, ঈমান ইয়েমেন থেকে উৎসারিত, তখন প্রত্যেক যুগেই সে জাতির মাঝে ঈমানের দ্যুতি বিরাজিত থাকা আবশ্যক। আপনাদের জন্যও এটা গৌরবের বিষয় এবং এব্যাপারে সচেষ্ট থাকা দরকার যে, নবীর জবানে যে বৈশিষ্ট্য আপনাদের জন্য ঘোষিত হয়েছে, চিরকাল যেন তাতে আপনাদের বড় অংশ বহাল থাকে।

আমি এরপর বলেছি, পৃথিবীর বহু মুসলিম জাতিরাষ্ট্র আপনাদের কাছ থেকে এ মূল্যবান সম্পদ কিনতে প্রস্তুত হয়ে আছে। তারা প্রস্তাব পেশ করছে, তাদের কাছে যা কিছুই আছে সবকিছুর বিনিময়ে যেন আপনাদের সম্পদটি তাদেরকে দেন, যে ব্যাপারে নবীজি স্বয়ং সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। আমি তো ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষ থেকে পূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি যে, সেখানকার যত গ্রন্থাগার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সভ্যতা-সংস্কৃতি সবকিছুর জৌলুস নিয়ে বিনিময়ে আপনাদের সে সম্পদ আমাদেরকে দিন, যা নবী আপনাদের বলে ঘোষণা করেছিলেন। বক্তৃতা দেড় থেকে প্রায় দু'ঘণ্টা পর্যন্ত চলছিল; পুরো সময় শ্রোতৃবৃন্দ পিনপতন নীরবতা, মুগ্ধকর স্থিরতা ও গভীর মনোনিবেশে কথা শুনছিলেন।[১]

---

১. পুরো বক্তৃতাটি পড়তে হলে দেখুন, 'নাফাহাতুল ঈমান বাইনা সানআ ও আম্মান', প্রকাশক, মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম ও দারুস্ সাহওয়াহ, কায়রো।

মুসলমানের শক্তির উৎস

বিভিন্ন সভায় জলপ্রপ্রাত প্রসঙ্গটি আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে একাধিকবার শোনা যেতে লাগলো। সানাআতে তিনটি বক্তৃতা দেয়া হয়েছে। একটি এয়ারফোর্স ট্রেনিং কলেজে; এটি সানাআ পৌঁছার পরপরই ছিলো। মাগরিবের পরেই ছিলো বক্তব্যের নির্ধারিত সময়। আমরা মাগরিবের আগে মসজিদে পৌঁছে গেলাম। দেখলাম, উল্লেখযোগ্য-সংখ্যক তরুণ কুরআন তিলাওয়াত করছে। ধারণা হলো, এখানে নামায বাধ্যতামূলক। আফসোসের ব্যাপার হলো, এ ভাষণটির ক্যাসেট পেলাম, কোনও স্মারকও নয়। তাই এর সংক্ষিপ্তসার এখানে তুলে ধরা যাচ্ছে না। তবে আর্টিলারি সেন্টারে সৈনিকদের ট্যাংক ইউনিটের হেডকোয়ার্টারের ভাষণটি সংরক্ষিত হয়েছে; এর সারাংশ উপস্থাপন করছি :

আর্টিলারি সেন্টারের কেন্দ্রীয় ফটকে পৌঁছার পর সেখানকার একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি সৈনিকদের বিশেষ রীতিতে সকলকে সৈনিক মিলনায়তনে জমায়েতের ইশারা দিলেন। সংখ্যায় তারা কয়েকশ' হবে। বক্তার জন্য এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ জায়গার সংবেদনশীলতা বুঝে বক্তৃতা করা মুশকিল ছিলো। বিচিত্র জায়গায় নানা রকম উপলক্ষ্যে সফর ও বক্তৃতার অভিজ্ঞতা থাকলেও একটি দেশের বিমান বাহিনীর সৈনিকদের উদ্দেশে ভাষণ দেয়ার ব্যাপারটি ছিলো একেবারে নতুন এবং পুরোপুরি আলাদা। বক্তৃতার শুরুতে সূরা নিসার এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলাম :

> "শত্রুদের পিছু ধাওয়া করতে অলসতা দেখিও না; যদি তোমাদের অক্লান্ত অবস্থার বিষয়টি বলো, তবে বলা যায়, তারাও তোমাদের মতো অবিশ্রান্ত। আর তোমরা আল্লাহর কাছে এমনসব প্রত্যাশা রাখতে পারো, যা তারা পারে না। আল্লাহ সবই জানেন আর তিনি মহাপ্রজ্ঞাবান।"

এরপর আয়াতটি তাফসীর করতে গিয়ে বললাম, "মুসলমান সিপাহীদের শক্তিমত্তার প্রধান উৎস হলো মহান আল্লাহর সেসব সুসংবাদের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস, যা তিনি আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণকারীদের জন্য ঘোষণা করেছেন আর সেসব ফযিলত অর্জনের জন্য উদ্যম-উদ্দীপনা যা কুরআন-হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, যার বর্ণনাসূত্র ধারাবাহিক সূত্রপরম্পরায় সর্বোচ্চ

স্তরের। নইলে অনুভূতি, কষ্ট, সহনশীলতা, ধৈর্য ও ত্যাগের স্বাভাবিক বিষয়গুলো সকল মানুষের সাধারণ সমান হয়ে থাকে।"

এ বিষয়ক আয়াত ও হাদিস সমূহের উদ্ধৃতি দেয়ার পর শাহাদাত ও শহীদের মর্যাদা সম্পর্কে আলোকপাত করি। বলেছি, এটি এমন শক্তি যা স্বাভাবিকতার সীমানা অতিক্রম করে, যুক্তি যেখানে থমকে দাঁড়ায়, যার অলৌকিক ফলাফল পৃথিবীর বহু চিত্র বদলে দিয়েছে, বিপ্লব এনেছে মানবতার ভাগ্যেও, যেখানে ইতিহাসের বাঁক বদল হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে আমি হযরত জাফর তৈয়্যার (রা.), হযরত আনাস বিন নাযর (রা.) হযরত সাআদ বিন রাবী' (রা.) ও হযরত খোবাইব (রা.)-এর জীবন-কুরবানি, মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান ও অভাবনীয় বীরত্বের ঘটনাগুলো উপস্থাপন করলাম।

হয়তো কেউ বলবে, "সেসব তো সেই যুগের ঘটনা, যা কল্যাণ ও বরকতে পরিপূর্ণ আর সৌভাগ্যের আলোয় আলোকিত ছিলো। আপনি তো সেসব লোকের অবস্থা বর্ণনা করছেন– যারা নবুওয়তের কোলে লালিত হয়েছেন; কুরআন ও ঈমানের পাঠশালা থেকে প্রত্যক্ষ সবক নিয়েছেন, বেড়ে উঠেছেন। তাদের মতো কিছু কি এমন লোকদের কাছে আশা করা উচিৎ যারা সোনালি যুগ চোখেও দেখেনি, তেমন বরকত আর সৌভাগ্যের অংশীদারও হতে পারেনি?" তেমন প্রশ্ন অথবা ভাবনার জবাবে আমি ভারতে সংঘটিত এমন কয়েকটি ঈমানদীপ্ত জিহাদের ঘটনা তুলে ধরছি, যার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সাইয়িদ আহমদ শহীদ। "আমি আপনাদের সামনে মায়ারের যুদ্ধের কথা বলতে চাই, একজন আহত সৈনিকের ঘটনা শোনাতে চাই যিনি প্রাণ বেরিয়ে যাবার আগ মুহূর্তে কী চমৎকার শোকরিয়া ব্যক্ত করেছিলেন আর মুচকি হাসি উপহার দিয়েছিলেন।"

১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে আম্বালা মামলায় ফাঁসির আদেশ শুনে আসামীদের হাস্যোজ্জ্বল প্রতিক্রিয়া ও আল্লাহর প্রশস্তিমূলক আচরণের দৃশ্য, মাওলানা ইয়াহইয়া সাদেকপুরীর মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে স্থির, অচঞ্চল, নিরুদ্বিগ্ন থাকার ঘটনা শোনালাম। এরপর আমি বললাম, "সে সময়কার ওহী, নববী শিক্ষার সুফলগুলো যেকোনো মূল্যে ধরে রাখতে হবে। ঠিক একইভাবে আল্লাহর নাফরমানী থেকে সযত্নে বিরত থাকতে হবে।" এখানে আমি হযরত ওমর ইবন্ আবদুল আযিয-এর একটি লেখা ছোট্ট একটি অংশ শোনালাম। যা তিনি তার দেশের সেনা কমান্ডারদের উদ্দেশে লিখেছিলেন :

"যদি শত্রুপক্ষ আর আমরা উভয়ে পাপাচারে সমান হয়ে যাই, তবে আমাদের জানা উচিত যে, শক্তি ও ক্ষমতায় তারা আগে থেকেই আমাদের চেয়ে এগিয়ে ছিলো। যদি আমরা সত্যপন্থা ও নৈতিক মর্যাদার কারণে আল্লাহর সাহায্য না পেতে পারি, তবে শক্তিতে আমরা তাদের সাথে বিজয়ী হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই শক্তি আর রণকৌশলের চাইতে আমাদের নৈতিক বল আর জীবনধারার শুদ্ধতা নিয়ে চিন্তা করার অধিকতর জরুরি।"[১]

সাবা সম্প্রদায়ের ঘটনা থেকে শিক্ষা

তৃতীয় ভাষণটি ছিলো জামে মাশহাদ এর মাঠে বড় একটি জমায়েতে। যেখানে সাবা সম্প্রদায়কেন্দ্রিক ইতিহাসের শিক্ষাটিতে আলোকপাত করার সুযোগ হয়েছে। সাবা গোত্র ও সাবার রাণীর ঘটনাবলির সম্পর্ক তো ইয়েমেন এবং এর প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত।[২] আমি আয়াতের তাফসীর ও শানে নুযুল আলোচনার পর মানুষের মানবিক দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার প্রসঙ্গ অবতারণা করি। মানুষ আরাম, বিশ্রাম, স্থৈর্যের ধারাবাহিকতায় এবং একই ধরনের জিনিস (তা যতই স্বাদের বা আরামের হোক) ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে উঠে এবং পরিবর্তন চায়। সে পরিবর্তন তাকে জটিল-কঠিন পরীক্ষা ফেলে দেবার ঝুঁকি থাকলেও চায়।

মানুষের প্রকৃতিগত এ বৈশিষ্ট্য বোঝাতে কুরআন অত্যন্ত গভীর মর্মব্যঞ্জক আরবি শব্দ 'বাতার' ব্যবহার করেছে। 'আমি অনেক জনবসতি ধ্বংস করে দিয়েছি যারা নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠেছিল'[৩] এটি ছিলো সাবা সম্প্রদায়ের কাহিনী। যাদেরকে আল্লাহ সবকিছুই দিয়েছিলেন। সফরের ব্যবস্থাকে খুবই সহজ ও আরামদায়ক করে দিয়েছিলেন, দূরত্বকে ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন :

"আর আমি তাদের ও তাদের বসতির মধ্যবর্তী স্থানে অনেক প্রাচুর্য সন্নিবেশিত করেছি, তাতে এমন মনোরম

---

১. এসব ঘটনা 'সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ' অথবা লেখকের আরেক পুস্তক ঈমান যখন জাগলো (যব ঈমান কী বাহার আ'য়ী) পড়ুন।

২. সাবা তৎকালে দারুস সালতানাত ইয়েমেনের রাজধানী সানাআ থেকে ১৭৩ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত ছিল এবং এ জাতি ইয়েমেনের আদিবাসী এবং অধিবাসী ছিলো।

৩. সূরা কাসাস, আয়াত : ৫৮

জনবসতি গড়ে দিয়েছিলাম যে, দূর থেকে তা ছিল খুবই দৃষ্টিনন্দন। আমি সেখানে সফরকে থমকে দিয়েছি। তোমরা রাত-দিন সফর করতে পারো নিরাপদে।"

কিন্তু তারা এমনসব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন তথা আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে। পবিত্র কুরআন বলছে :

"তারা বললো, হে আমাদের প্রভু! আমাদের সফরে দূরত্ব বাড়িয়ে দিন।"[১] তারা বললো, "এটা কি কোনো সফর হলো, আমরা খেয়ে-দেয়ে, আরাম-আয়েশে আছি, মুহূর্তেই গল্প-আড্ডায় এখান থেকে সেখানে পৌঁছে যাচ্ছি?" তাদের এরূপ আচরণের ফলে আল্লাহর তাদের কাছ থেকে প্রাচুর্য ও নেয়ামত কেড়ে নিলেন। তাদের জনপদকে ছিন্নভিন্ন করে দিলেন। তারা ইতিহাসের করুণ ট্রাজেডির নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইলো।

'আমি তাদেরকে ইতিহাসের উপাখ্যানে পরিণত করেছি আর তাদের জনপদকে করেছি ছিন্নভিন্ন।'[২]

এরপর আমি অতীত থেকে বর্তমানের আলোচনায় প্রবেশ করলাম। আমি বলেছি, বহু মুসলমান, আরব রাষ্ট্র ও ইসলামি সমাজ সম্পর্কে এ ব্যাধির আশংকাবোধ করছি। সর্বত্রই আজ নতুন আর আধুনিকতার প্রতি নির্বিচার লালসার ও ঢালাও কৌতুহল পরিলক্ষিত হচ্ছে। 'আরও বেশি চাই' প্রকৃতির মানসিকতা যত ভয়ঙ্কর, নতুন কিছু জাতীয় প্রবণতা তার চাইতে বেশি ক্ষতিকর। কোনো বাছ-বিচার ও যাছাই-বাছাই ছাড়া নতুনের জয়গান আর পরিবর্তনের স্লোগান তোলা হচ্ছে। এটি পুরো জাতিরাষ্ট্রকে নতুন চ্যালেঞ্জে ও অনাকাঙ্ক্ষিত সংকটে ঠেলে দেবার নামান্তর। ভালো-মন্দ, নিরাপদ-অনিরাপদ, পরিণাম নিয়ে কোনোই পর্যালোচনা হবে না– ব্যস! নতুন মানে গোগ্রাসে গিলতে হবে– এহেন ভয়ানক ভুল চিন্তা এবং প্রবৃত্তিসর্বস্ব (PhYCHOLOGY) ভাবনা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এরূপ অপরিণামদর্শী পদক্ষেপ তাদের সমাজকেও সাবা সম্প্রদায়ের পরিণতিতে পৌঁছে দিতে পারে।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۝

"আপনি কি সেসব লোকের কথা শুনেছেন, যারা আল্লাহর অনুগ্রহের জবাবে কুফরী করেছে এবং আপন সম্প্রদায়কে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে।"[৩]

---

১. সূরা সাবা, আয়াত : ১৯
২. সূরা সাবা, আয়াত : ১৯
৩. সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ২৮

সরকারি দায়িত্বশীলবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ

ইয়েমেনের রাজধানী সানায় রাষ্ট্রপতি আলী আবদুল্লাহ্ সালেহসহ কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারি ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি রাষ্ট্রপতি ভবনে জুমাবার আমাদের মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করেন। শায়খ ইয়াহইয়া ফুসাইয়্যালের সঙ্গে জুমার নামায আদায় করলাম। মাআহিদে ইলমিয়ার গণসংযোগের বিভাগের প্রধান এবং রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও বেশ ভালো বলে মনে হয়।

নামাযের পরপরই খাবারের মজলিসে গেলাম। রাষ্ট্রপতির ভোজের আসরেও বিভিন্ন প্রসঙ্গে কথা এবং একান্তে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। খুবই সাদাসিধে, সরল, সমীহ, সম্ভ্রমবোধ এবং অকৃত্রিম আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ করেন। আমি উঠতে চাচ্ছিলাম। তিনি অনুরোধ করে আরও কিছুক্ষণ বসালেন। সেখান থেকে বের হবার পর টেলিভিশন-রেডিওসহ গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট কিছু কর্মসূচি ছিল। মিডিয়ার সামনে প্রদত্ত বক্তব্যে আমি নিজের শিক্ষাজীবন, আমার উস্তাদ খলিল আরব ও ইয়েমেনের সঙ্গে পুরনো সম্পর্ক প্রসঙ্গ তুলে ধরলাম, আসন্ন রমজান মোবারককে যথাযথভাবে স্বাগত জানানোর ওপর গুরুত্বারোপ এবং রামাযানের 'হক' আদায়ে সচেষ্ট হওয়ার জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম।

রাষ্ট্রপতি ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী আবদুল আযিয আবদুল গনি, ওয়াকফমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুবাইহীসহ জাতীয় সংসদের কতিপয় ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাতের সময় নির্ধারিত ছিল। প্রত্যেকে খুবই আন্তরিকতা এবং আগ্রহ দেখিয়েছেন। ওলামা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নেতৃবর্গের মধ্যে কাজী আবদুর রহমান মাহবুব, ইয়াহইয়া লতিফ আল ফুসায়্যালের সঙ্গে বরাবরই সাক্ষাৎ এবং যোগাযোগ ছিল। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, মাকতাতুত্ তাওজীহ ওয়াল ইরশাদ-এর প্রধানের নাম, যিনি সারাদেশের শিক্ষাদীক্ষার উন্নয়ন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ইয়েমেনে দাওয়াতি প্রবন্ধ উপস্থাপন ও তার প্রভাব

আমি একটি বিষয় লক্ষ্য করে অভিভূত হলাম যে, পর্যাপ্ত ও শক্তিশালী যোগাযোগের অভাবে বহির্বিশ্বের অনেক দেশে আমার গ্রন্থাবলি এখনও পৌঁছেনি কিন্তু ইয়েমেন ঠিকই এসে গেছে। অনেকে আমার রচনাবলির পাঠক। কোনও কোনও জায়গায় তো আমার গ্রন্থ-পুস্তকের বিক্রয়কেন্দ্রও

দেখলাম। যেখানে إذا هبت ريح الإيمان গ্রন্থটি চোখে পড়লো।[১] নির্ভরযোগ্য কতিপয় ব্যক্তির কাছ থেকে জানলাম, দক্ষিণ ইয়েমেনের কমিউনিস্ট সরকার যখন উত্তর ইয়েমেনের সৈন্যদের উপর হামলা চালিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু এলাকা দখল করে নেয়, যখন প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, উত্তর ইয়েমেন সরকার তাদেরকে হঠাতে সক্ষম হবে না, তখন সরকারি পদস্থ লোকদেরও মনোবলে চিড় ধরে। ঠিক সময়ে তরুণদের একটি অংশ অভিনব দাওয়াতের মিশন নিয়ে অগ্রসর হয় এবং তারা এখান থেকে কিছু ঈমানদীপ্ত ও চিন্তাশীল প্রবন্ধ উপস্থাপন করে যা মানুষের প্রাণে দ্বীনি খোরাক যুগিয়েছিল। এর ফলে মানুষের মাঝে ধর্মীয় চেতনা, উদ্দীপনা ও ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টার স্পৃহা তৈরি হয়।[২] তারা কমিউনিস্টদের লক্ষ্য, চিন্তাধারা ও তাদের নেতৃত্বের প্রভাব সম্পর্কে অবগত ছিলো।

তারা ভালো করেই জানতো কমিউনিস্টরা ক্ষমতাসীন হলে ইসলাম ও মুসলমানদের কোনো নিদর্শন বাকি রাখবে না। ব্যক্তিগত পর্যায়ে পর্যন্ত স্বাধীনভাবে ইসলামি অনুশাসন পালন করা খুবই কঠিন হয়ে পড়বে। এখানকার যুবসমাজ সরকারের অনুমতি ও সরবরাহকৃত কিছু হালকা যুদ্ধাস্ত্রের সাহায্যে দখলদার মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে যায়। সরকার প্রথমে কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিলো এই ভেবে যে, এসব তরুণের না আছে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা, না তারা নিয়মিত সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তারা আবেগ ও অপরিণত বয়সের উত্তাপে বোধ হয় এরূপ পদক্ষেপ নিতে চায়। তাদের অব্যাহত পীড়াপীড়ির পর পরীক্ষামূলকভাবে কিছু কামান ও অন্যান্য অস্ত্র সরবরাহ করা হয়। উল্লেখ্য, ইয়েমেন পাহাড়ি অধ্যুষিত জনপদ। তারা একটি পাহাড়ে ছাউনী স্থাপন করে নারায়ে তাকবীর স্লোগান তুলে অভিযানের সূচনা করে। মহান আল্লাহ তাদের এই অস্বাভাবিক পদক্ষেপে সহায়তা করেন। তারা দক্ষিণ ইয়েমেনের সৈন্যদের সহায়তামূলক লড়াইয়ে নেমে পড়ে, এর মাধ্যমে অল্প সময়ের ব্যবধানে যুদ্ধের চিত্র পাল্টে যায় এবং দক্ষিণ ইয়েমেন কমিউনিস্টদের আগ্রাসন ঝুঁকি থেকে নিরাপদ হয়।

---

১. তখনও রামাযানের এক দশক বাকি আছে; প্রত্যাবর্তনের আগে ইয়েমেনের ফিরতি সফরের কর্মসূচি ছিল, তাই সেটা কাজে লাগানো হয়েছে।

২. এ ধারাবাহিকতায় (والعهدة على الراوي) তারা তিনজন লোকের নাম উল্লেখ করেন। তারা যাদের গ্রন্থাবলি বেশি বেশি অধ্যয়ন করেছেন– তারা হলেন, সাইয়্যিদ কুতুব, মাওলানা মওদুদী ও আমি।

সানাআ ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকা

সানাআ'র বন্ধু-বান্ধবেরা এর সানাআ মহানগরীর বাইরেও কিছু কর্মসূচি ঠিক করেছিলেন। এর সুবাদে মালেকা সাবার রাজধানী প্রতিরক্ষা প্রাচীরও দেখার সুযোগ হবে (যা সানআ থেকে ১৭৩ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত)। কিন্তু সময়ের স্বল্পতা ও সফরের ক্লান্তির কারণে এটি আর সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। সরকারি কর্তৃপক্ষ হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করার ইঙ্গিতও দিয়েছেন তবুও শারীরিকভাবে এর জন্য প্রস্তুত হবার হিম্মৎ হয়নি। সানাআ'র প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, বহু গ্রন্থপ্রণেতা[১] আবদুর রাজ্জাক ইবন্ হুমাম এর কবর জিয়ারতের সুযোগ হয়, যা একটি পাহাড়ি টিলার উপর মসজিদের কোলঘেঁষে অবস্থিত। অসমতল রাস্তা আর পাথুরে ভূমি হবার কারণে কেবল সামরিক জীপগুলো এ পথে চলাচল করে থাকে। সামরিক জীপে চড়েই আমরা সেখানে পৌঁছি এবং কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ফাতেহা পাঠ করি। 'নাইলুল আওতার' গ্রন্থের রচয়িতা আল্লামা মুহাম্মদ ইবন্ আলী আশ শাওকানী (যিনি আমার হাদিসের ওস্তাদগণের অন্যতম) এর কবরটি যিয়ারত করতে পারিনি। তিনি সানাআ থেকে বেশ দূরত্বে অবস্থান করতেন। দেখার মতো জায়গাগুলোর মধ্যে ইমাম ইয়াহইয়ার বাড়িটি দেখেছি। এটি সানাআ'র উপকণ্ঠে একটি মহল্লায় অবস্থিত। এছাড়া, সানাআ'য় দেখার জায়গাও আসলে কম। অধিকাংশ রাস্তা কাঁচা আর দুর্গম। ইয়েমেনের শাসকেরা ইচ্ছাকৃতভাবে দেশটিকে অবকাঠামোগতভাবে উন্নত করছেন না। তারা যেন ইয়েমেনের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দরোজাটাই বন্ধ করে রেখেছেন।

কিন্তু মানুষের সহজাত প্রবণতা ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য আপন পথে ঠিকই চলছে। ইয়েমেনে বিপ্লব হলো; প্রথমে আধুনিকতাপন্থী ও কমিউনিস্ট নওয়াজ উনচারের উত্থান ঘটলো। তিনি ইয়েমেনকে দ্রুত বদলে দেয়ার চেষ্টা করলেন। এরপর পরিস্থিতির বেশ কয়েকটি বাঁক-বদল ঘটলো। পরিশেষে, বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হয়–যারা প্রকাশ্য ধর্মপন্থী না হলেও ধর্মবিরোধীও নয়। বর্তমানে তারা দেশটিকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে চেষ্টা চালাচ্ছে। বেশ দ্রুততার সঙ্গে রাস্তা-ঘাট তৈরি হচ্ছে, সময়ের প্রয়োজনীয়তা ও আধুনিকতার

১. আবদুর রাজ্জাক ইবন্ হুমাম হুমায়রী, সানাআয়ী, হিজরি দ্বিতীয় শতকের বরেণ্য মুহাদ্দিসগণের অন্যতম (১২৬–২১১ হি.)। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলও তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আর কেবল এ উদ্দেশ্যেই তিনি আলাদাভাবে সানাআ সফর করেন (যদিও মক্কায় মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ হতো।

চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে দেশকে সাজানো হচ্ছে। তবে এটি পরিষ্কার নয় যে, এতে সুষ্ঠু পরিকল্পনা, নতুন প্রজন্মের জন্য কল্যাণ, দেশের ভবিষ্যৎ ও ইসলামের সুরক্ষায় ইয়েমেনী ঐতিহ্য ও এ জাতির নেতৃত্বের বিষয়টি বিবেচিত হবে কিনা।[১]

ইয়েমেনে প্রাচীনকাল থেকে যায়দী মতাদর্শের[২] প্রাধান্য ছিল। এর কিছু নিদর্শনও বিভিন্নভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু ইবাদত, সামাজিকতা, চরিত্র-নৈতিকতা ও প্রাত্যহিক কাজ-কারবারে তেমন তফাৎ চোখে পড়ে না। ইয়েমেনে বংশগত, সাম্প্রদায়িক ও গোত্রীয় ভিন্নতার বাইরে যে দু'টি বিষয়ে জাতীয় ঐক্য বা বৃহত্তর সংহতি লক্ষ্য করা যায়, তা হলো– একটি বিশেষ কায়দায় মাথায় রুমাল পরিধান যা সম্ভবত প্রাচীন আরবদের রীতিসম্মত; আমি আমার উস্তাদ খলিল আরবকে প্রায় সময় এরকম রুমাল বাঁধতে দেখতাম। নজদ ও শারকিয়া অঞ্চলে রুমাল কেবল মাথায় পরা হয়। প্রাচীন আরব ও বর্তমানে ইয়েমেনে রুমাল পরার রীতিটা সুন্নতি পাগড়ির সঙ্গে বেশ খানিকটা সাদৃশ্যপূর্ণ।

আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, কোমরে খঞ্জর বেঁধে রাখা যাকে 'জাম্বিয়া' বলা হয়, যা সামাজিক অবস্থানভেদে বিভিন্ন মানের বা দামের হয়ে থাকে। এটিও ইয়েমেনীদের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। আলিমরাও এর ব্যতিক্রম নন। এদিক থেকে ইয়েমেনীদের আংশিক সশস্ত্র বলা যায়।

ইয়েমেনের জাতীয় ও ঐতিহাসিক জায়গাগুলো পরিদর্শন

সানাআ'র বন্ধু-বান্ধবরা ইয়েমেনের বাইরে কয়েকটি ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনের কর্মসূচিও তৈরি করেছেন। সময়ের স্বল্পতার কারণে কাটছাঁট করে শেষ পর্যন্ত তিনটি জায়গার কর্মসূচি বহাল রাখা হয়। একটি তায়িয যা ইয়েমেনের দ্বিতীয় রাজধানী হিসেবে বিবেচিত হয় জাবিদ, যা কোনো যুগে

---

১. ইয়েমেনের অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পর্যালোচনা, অনাগত সংকট ইত্যাদির বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, লেখকের গ্রন্থ 'মুসলিম মামালিক মে ইসলামিয়াত ওয়া মাগরিবিয়্যাত কী কাশমাকাশ'; পৃ. ৩৯-৪৮

২. সম্প্রদায়টি যদিও হযরত আলী (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রবক্তা কিন্তু তাদের মতবাদ ইসনা আশরিয়া থেকে অনেকটা ভিন্ন। তাদের মতাদর্শে নিষ্পাপ প্রশ্ন, সাহাবায়ে কেরামের একটি অংশকে কাফির আখ্যা দেয়া ও মুরতাদ মনে করা এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিরোধিতায় বাড়াবাড়ি নেই। কয়েকজন বড় মুহাদ্দিস যায়দী সম্প্রদায় ত্যাগ করে ইলমে হাদিসের ব্যাপক খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

ভাষা ও হাদিসচর্চার জন্য বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত ছিল। আরেকটি হলো হুদায়দা, যা ইয়েমেনের অন্যতম বন্দর নগরী। আমার হাদিস শিক্ষার বড় শায়খ হোসাইন বিন মুহসিন আনসারী ইয়েমেনী ও তার বংশরদের বাড়িও এখানে। সানাআ থেকে ৪/৫ জন আলিমের সঙ্গে তায়িয রওনা হলাম। পাহাড়ি রাস্তা হবার কারণে একটি সিকিউরিটি কার (Pilot Car) যাতে কয়েকজন নিরাপত্তাকর্মী থাকে। গাড়িটি আমাদের গাড়ির সামনে চলছিল। পথের দু'ধারে বৃক্ষরাজি খুবই নয়নাভিরাম ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি বেশ আকর্ষণীয়। সবুজ পর্বতমালা আর শ্যামল-সজীব জনপদ খুবই মনোমুগ্ধকর। সুন্দর ও মনোরম বাড়িঘরগুলোও দৃষ্টিনন্দন। সবমিলিয়ে মনে হচ্ছিলো যেন কাশ্মিরের কোনো পথে সফর করছি।

তায়িযে গিয়ে দু'জন বড় মাপের গুণী ব্যক্তিত্ব কাজী ইসমাইল আল-আকওয়া ও শাইখ মুহাম্মদ আলী আল-আকওয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তায়িযের একজন ধর্মপ্রাণ পেশাজীবি শহরের সম্মানিত ব্যক্তি ও প্রশাসনিক দায়িত্বরত লোককে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানায়। সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করতে হয়। দুপুরের খাবারের পর দ্বিতীয় আসর[১] শুরু হলে আমি তাদের অনুমতি নিয়ে বিশ্রামে চলে যাই।

সন্ধ্যায় নগরীর মুজাফফর জামে মসজিদে আলোচনা করলাম, যেখানে বিপুলসংখ্যক আলিম ও শিক্ষিত-সুধীজন উপস্থিত ছিলেন। মুসলিম বিশ্ব ও ইয়েমেনী সমাজের সাধারণ অবস্থা (যাদের মাথার উপর দক্ষিণ ইয়েমেনের কমিউনিস্টদের হুমকি বরাবরই ঝুলছিল) ও প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে আলোচনা করা হয়েছে। আমার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিলো মিসরবিজয়ী আমর ইবনুল আ'সের সে ঐতিহাসিক উক্তিগুলো, যা তিনি বিজয়ী আরব জাতি এবং মুসলমানদের উদ্দেশে করেছিলেন :

---

১. ইয়েমেনীরা চা, কপির চাইতের গাঢ় এক ধরনের পানীয় গ্রহণে অভ্যস্ত। মধ্যাহ্ন ভোজের পর তারা সেটা উপভোগের আসর জমায়। ছোটো ছোটে প্যাকেটেও জিনিসটি পাওয় যায়; এটি পান করলে শরীর বেশ সতেজ ও ফুরফুরে হয়ে উঠে, তবে হজম বা স্বাস্থ্যের জন্য তেমন উপাদেয় নয়। কিন্তু ইয়েমেনী আলিমদের অধিকাংশই এটাকে হালাল বলে থাকেন। এতে ধর্মীয় বিধানের কোনো লঙ্ঘন নেই বলেই বিবেচিত হয়। কোনো কোনো আলিম জিনিসকে হারাম বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, কেউ কেউ স্বতন্ত্র পুস্তিকাও রচনা করেছেন। কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইয়েমেনী অর্থনীতির জন্য এর প্রভাব নেতিবাচক। সামাজিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে এটা হয়তো পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ করা যাবে।

"তোমরা নিজেদের স্বতন্ত্র একটি রণাঙ্গণে কল্পনা করো। কারণ, তোমাদের চারপাশে বিপুলসংখ্যক শত্রু ছড়িয়ে আছে। তাদের লক্ষ্যবস্তু এবং চোখ সর্বদা তোমাদের উপর নিবদ্ধ এবং স্থির। কথাটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমি যেকোনো ঝুঁকি ও হুমকির মোকাবেলায় সদা-সর্বদা সচেতন ও অতন্দ্র প্রহরায় সচকিত থাকার ওপর গুরত্বারোপ করি। একইভাবে বিলাসিতা, নৈতিক স্খলন, সামাজিক ব্যাধির সম্পর্কেও সজাগ থাকার পরামর্শ দেই।" আল্লামা ইকবালের একটি কবিতার আরবিতে অনুবাদ করলাম :

"আমি তোমাকে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাস বলছি,
তরবারি আর দন্তনখর আগে দোতারা,
সেতারা আর হারমোনিয়াম পরে।"

এরপর আলোচনায় আমি ভারতবর্ষে মোঘল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের প্রসঙ্গ অবতারণা করি– যার সূচনা বাবরের জীবনবাজি, বীরত্ব ও ত্যাগের মাধ্যমে আর মুহাম্মদ শাহ রঙ্গিলা ও তার আয়েশী বান্ধবদের বিলাসিতা-প্রমোদে যার পরিসমাপ্তি। এরপরে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে এর বিশ্লেষণ এবং বিষয়ের সমর্থনে সংশ্লিষ্ট ঘটনায় আলোকপাত করি :

وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۟ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَٰهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾

"যখন আমি কোনো জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছে করি, তখন সেখানকার বিত্তবান লোকদের আমি নির্দেশ দেই, আর তারা না অবাধ্যতায় প্রবৃত্ত হয়। এরপর আযাবের ফয়সালা হয় এবং তাদেরকে গুঁড়িয়ে দেই।"[১]

তায়িয থেকে রওনা হয়ে জাবিদ নামক জায়গা পৌঁছলাম। এখানে আমার হাদিসশাস্ত্রের শাইখ আল্লামা সুলাইমান বিন ইয়াহইয়া বিন ওমর বিন মাকবুল আল আহদালের ঘরে নাস্তা করি। সে বংশের একজন সম্মানিত ব্যক্তি শাইখ আহদালের ঘরে অবস্থান করি। জাবিদে আল্লামা মাজদুদ্দিন ফিরোজাবাদীর কবরে ফাতেহা পাঠ করলাম। তিনি তৎকালীন ইসলামি সরকারের পক্ষ থেকে এখানে নিয়োজিত ছিলেন এবং এখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন। এই জাবিদ অঞ্চলে ফখরে হিন্দুস্তান আল্লামা সাইয়িদ মুরতজা বৈলগ্রামী (মৃত্যু : ১২০৫) সাহিত্য ও হাদিসশাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জনের স্পৃহায় এখানে এতো বেশি সময়

১. সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ১৬

কাটিয়েছেন যে, তাঁর নামের শেষে জাবিদী উপাধি যুক্ত হয়ে গেছে। অনেক বড় বড় জ্ঞানীরাও প্রায় ভুলে গেছেন, তিনি আসলে ভারতের উধাহ অঞ্চলের বৈলগ্রামের অধিবাসী এবং সাদাতের এক প্রসিদ্ধ বংশের সন্তান। সমগ্র আরব অঞ্চলে তার নামধাম ছড়িয়ে গেছে। স্বয়ং আরবি ভাষাভাষীরা তাঁকে আরবি ভাষাবিজ্ঞানী হিসেবে মান্য করতেন। বড় বড় শাসকেরা তাঁর গ্রন্থাবলি চেয়ে আবেদন পাঠাতেন এবং তা সংগ্রহ করতে পারাকে গৌরবজনক মনে করতেন।[১] তিনি 'কামুছ' এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'তাজুল আরুছ' লিখে আরব-অনারব সকলের কাছে নিজের ভাষা জ্ঞানের স্বাক্ষর রেখেছেন। অন্য কোনো ভাষার অভিধানের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটতে দেখা যায়নি।

অনেক পুরাতন ঐতিহাসিক মসজিদের পরিদর্শন করা হলো। এরপর আমরা জাবিদ থেকে হুদায়দা চলে গেলাম। ওখানের যাওয়ার পেছনে বড় আগ্রহরূপে কাজ করেছে সেখানে আমার উস্তাদ খলিল আরব ও হাদিসের কতিপয় উস্তাদের বাড়ি থাকার বিষয়টি। সেখানে হাজির হতে পেরে মনে পুলক এবং স্বস্তি অনুভব হলো। ওখানে তাবলীগী মারকাজে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো। মাআহাদে ইলমীতে বিস্তারিত ও দীর্ঘ বক্তৃতা হয়েছে। অনুষ্ঠানের শুরুতে অভ্যর্থনা হিসেবে চমৎকার সুরে ছোট বাচ্চারা একটি মনোমুগ্ধকর সংগীত পরিবেশন করে, যেখানে একটি কলি ওরা বারবার পুনরাবৃত্তি করছে যে– আমরা আবুল হাসানকে স্বাগত জানাই, তিনি আমাদের নয়নমণি, পরম শ্রদ্ধেয়'। এখানকার আলোচনায় আমি পরিষ্কার করে বলেছি, এ নগরী আমার প্রিয় উস্তাদের শহর হওয়ার এর সঙ্গে আত্মার আত্মীয়তা আছে। এছাড়াও আরবি ভাষা (কুরআনের ভাষা হওয়ার সুবাদে)'র বৈশ্বিকতা, জনপ্রিয়তা, এর বিশ্ববিস্তৃতি এবং অনারবদের সঙ্গে এর অন্তরঙ্গতার প্রসঙ্গও উত্থাপন করি।

উদাহরণ হিসেবে এটাই যথেষ্ট যে, ভারতীয় বংশোদ্ভূত একজন বড় মাপের আলিম আল্লামা সাইয়িদ মুরতজা যিনি জুবাইদী নামে প্রসিদ্ধ, চৌদ্দ বছর দুই মাস পরিশ্রম করে আরেকজন ইরানি বংশোদ্ভূত ভাষাবিদ ফিরোজাবাদীর কিতাব কামুছ গ্রন্থের দশখণ্ডে সমাপ্ত ব্যাখ্যা লিখেছেন। অন্য কোনো ভাষায় এর দৃষ্টান্ত মেলে না। এরপর আবদুল আযীয ইয়েমেনীর কথা বললাম। আমার প্রশ্নের জবাবে তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁর প্রায় পৌনে এক

১. বিস্তারিত জানতে পড়ুন 'নুযহাতুল খাওয়াতির', হাকিম সাইয়িদ আবদুল হাই হাসানী(রহ.) ৮ম খণ্ড, অনুবাদ : সাইয়িদ মুরতজা ইবন্ মুহাম্মদ বৈলগ্রামী

লাখের বেশি আরবি কবিতা মুখস্থ রয়েছে। তাই অনারবদের কুরআনের সঙ্গে সম্পর্কের খাতিরে, বিশ্বাসের ফলে, ভালোবাসা ও ভক্তির সুবাদে শাহ ওয়ালিউল্লাহর (রহ.) সেই অসিয়তের কথাও উল্লেখ করি, যা আম্মানের প্রথম বক্তৃতায় বলা হয়েছিল; এরপর আনসারী সাহাবীদের কথা, যারা বংশগত দিক থেকে ইয়েমেনী ছিলেন; রাসূলের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার কথা বলি, সে সম্পর্কের কারণে গৌরববোধ করা, কৃতজ্ঞতা আদায় এবং সে বৈশিষ্ট্যকে ধারণ ও লালনের আহ্বান জানাই। পাঠক সম্ভবত ইয়েমেনের দীর্ঘ আলোচনায় কিছুটা ক্লান্তিবোধ করছেন! কিন্তু আপনাদের বলি :

"কাহিনীতে স্বাদ ছিল বলেই তা দীর্ঘায়িত করতে আমি প্রলুব্ধ হই।"

সফর থেকে ফিরে সানায় দুদিন অবস্থান করি। ২১ মে সানা থেকে জেদ্দা এবং ২৩ মে জেদ্দা থেকে করাচি রওনা হই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সফর গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশ ও বক্তৃতা

বাংলাদেশ সফর মূলত জর্দান, হিজায ও ইয়ামেন সফরের আগে (৯ মার্চ থেকে ১৯ মার্চ ১৯৮৪) সম্পন্ন হয়। পাকিস্তান সফর জর্দান, হিজায ও ইয়ামেন সফরের পরে (২৪ মে থেকে ২৮ মে ১৯৮৪) সম্পন্ন হয়। এ কারণে ইতিহাসের পরম্পরা হিসেবে বাংলাদেশ সফরের বর্ণনা জর্দান ও ইয়ামেন সফরের পরে হওয়া উচিৎ ছিল; কিন্তু উল্লিখিত ৩টি আরব দেশ সফরের বর্ণনার জন্য একটি পৃথক অধ্যায় তৈরী করা ভাল মনে করি। কারণ, তারা একই ভাষা ও একই নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। আরেকটি পৃথক অধ্যায়ে (দ্বিতীয় অধ্যায়) বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সফরের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়।

এটা এক প্রকার বিস্ময়কর ও ভাগ্যের ফায়সালা বলতে হয় যে, আমার সফর, পরিভ্রমণ, ইলমী কর্মকাণ্ড ও দাওয়াতী তৎপরতার বেশীর ভাগ ছিল পশ্চিমে, যার একদিকে আলজিরিয়া ও মরক্কো অপর দিকে আমেরিকা ও কানাডা পর্যন্ত যাওয়া হয়েছে; কিন্তু পূর্বদিকে আমার যাত্রা মিয়ানমার ও শ্রীলংকাকে বাদ দিলে কোলকাতা পর্যন্ত সীমিত ছিল। অতীব প্রয়োজনে এ দু'দেশ সফর করতে হয়। সাধারণত হাওড়া ষ্টেশনের পূর্বদিকে আর যাওয়া হয়নি।

হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর খলিফাদের আন্দোলন ও দাওয়াতের সাথে পূর্ব বাংলার (ঢাকা ও চট্টগ্রাম) সম্পর্ক ছিল অতি প্রাচীন। সাইয়িদ সাহেব (রহ.)-এর একজন প্রখ্যাত খলিফা মাওলানা কেরামত আলী জৈনপূরী (রহ.) সাইয়িদ সাহেবের নির্দেশনায় পূর্ব বাংলাকে নিজের দাওয়াতী ও ইসলাহী কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র তৈরি করে নেন। নবাব বাহাদুর ইয়ার জঙ্গ প্রদত্ত এক ভাষণ আমি নিজ কানে শুনেছি। তিনি বলেন যে,"আল্লাহ তায়ালা মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী (রহ.) এবং দাওয়াতী ময়দানে কর্মরত তাঁর প্রতিনিধিদের এমন কামিয়াবি হাসিল হয় যে, তাঁদের মাধ্যমে পূর্ব

বাংলার যেসব মানুষের হেদায়ত নসীব হয়, জীবনে সংশোধন আসে, তাঁদের সংখ্যা দু' কোটিতে পৌঁছে।"

আমি বাল্যকাল থেকে শুনে আসছি যে, আমার পরিবারের অনেক বুযুর্গ ব্যক্তি ঢাকা ও অন্যান্য এলাকায় আসা যাওয়া করতেন। পূর্ব বাংলার এ অঞ্চল ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। আবার ১৯৭২ সালে পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে গেলেও আমার যাওয়ার সুযোগ ঘটেনি। এখানে ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। এ ব্যাপারে আমি বক্তৃতা ও লেখনির মাধ্যমে আমার অভিমত ও অনুভূতি ব্যক্ত করেছি। ১৯৭২ সালের ২ মে আমি কোলকাতায় এ বিষয়ে বক্তব্য রাখি, যা পরবর্তীতে 'ভাষা ও সংস্কৃতির জাহিলিয়াত এবং তার শিক্ষা' শিরোনামে উর্দূ, ইংরেজী, আরবী ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়। বাঙালী হাজীদের মাধ্যমে এ পুস্তিকা পবিত্র মক্কা হতে বাংলাদেশে পৌঁছে এবং তা পাঠকদের হৃদয়-মনকে নাড়া দেয়।

দ্বীনি জযবা, ইসলামী চেতনা জাগ্রতকরণ এবং ইতিবাচক ও গঠনমূলক পরামর্শ

এতদঞ্চলে বসবাসকারী মুসলিম জনগোষ্ঠী অতীতে দ্বীনি জযবা, ইসলামী চেতনা, জিহাদের আগ্রহ ও আত্মত্যাগের যে জীবন্ত নমুনা দেখিয়েছেন, তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর জিহাদী আন্দোলনে তাঁরা ঈমানী উদ্দীপনার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তার উদাহরণ মেলা মুশকিল। এ চেতনাবোধ এখনো এতদঞ্চলের জনগোষ্ঠীর রক্তধারায় প্রবহমান। অনাগত দিনগুলোতেও দ্বীনি, বুদ্ধিবৃত্তিক উৎসাহ ও প্রেরণা রাখা চাই। এ দেশের জনগণ যাতে কোন ধরনের জাহিলী দাওয়াতের শিকার হয়ে লজ্জাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন না হয়, এ ব্যাপারে সতর্ক করা এবং ভবিষ্যতের সুসংবাদ দান করা একজন দাঈ-এর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

এ দিকে বিগত ক'বছর ধরে বাংলাদেশ সফরের জন্য বাংলাদেশী বন্ধুদের পক্ষ হতে বারবার দাওয়াত ও তাগাদা আসতে থাকে। আমার লিখিত আরবী ও উর্দূ গ্রন্থাবলি ওখানে আগ্রহভরে পঠিত হয়। দারুল উলূম নাদওয়াতুল ওলামায় শিক্ষাপ্রাপ্ত বেশ ক'জন নদভী ওখানে আছেন বিশেষত চট্টগ্রামের পটিয়া আল জামিয়াতুল ইসলামিয়ার উস্তাদ মাওলানা সুলতান যওক নদভী আমার সফরের অন্যতম উদ্যোক্তা। আরবী ও ইসলামী সাহিত্যে তাঁর অধিকতর আগ্রহ বিশেষভাবে আরবী ভাষায় আমার লিখিত 'রাওয়ায়ে

ইকবাল'-এর প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আকর্ষণ। বহুদিন যাবত আমার সাথে তাঁর পত্র যোগাযোগ অব্যাহত থাকে এবং তিনি লক্ষ্ণৌস্থ দারুল উলূম নাদওয়াতুল ওলামায় দীর্ঘদিন অবস্থান করেন।

অবশেষে সে কাঙ্খিত সুযোগ হাতে এলো। বাংলাদেশের কতিপয় খ্যাতনামা মাদরাসা ও সংগঠনের ইচ্ছে ও আগ্রহ এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের দাওয়াতে সফরের কর্মসূচী চূড়ান্ত হয়। ১৯৮৪ সালের ৯ মার্চ জুমার দিন লক্ষ্ণৌ থেকে বিমান যোগে কোলকাতা হয়ে মাগরিবের সময় ঢাকা পৌঁছি। জামিল উদ্দিন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী জনাব হাজী বশির উদ্দিনের ৩৬ নিউইস্কাটনস্থ বাসভবনে উঠি। তিনি দ্বীনদার ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। অধিকাংশ আলিম ওলামাদের তিনি আতিথ্য প্রদান করে থাকেন। বাংলাদেশ পরিভ্রমণে আমার সফরসঙ্গী ছিলেন মাওলানা আবদুল করিম পারেখ নাগপূরী, মাওলানা আবুল ইরফান খান নদভী, স্নেহাস্পদ মাওলানা সালমান হোসাইনী নদভী এবং বিদেশ সফরে আমার সবসময়ের সহযোগী হাজী আবদুর রাজ্জাক রায়বেরলভী।

১৯৮৪ সালের ৯ মার্চ থেকে ১৯ মার্চ পর্যন্ত ১০দিন বাংলাদেশে থাকাকালীন ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ময়মনসিংহ ও সিলেটের কেন্দ্রীয় স্থানসমূহে যাওয়ার সুযোগ ঘটে, বড় বড় সমাবেশে বক্তব্য রাখি এবং বিভিন্ন মাদরাসা পরিদর্শন করি। চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সফরে মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী হ্নীলা পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ হয়। আমাদের আগমনের সংবাদ শুনে বহু আলিম ও সচেতন ব্যক্তি সেখানে জমায়েত হয়। ঢাকায় অবস্থানকালীন প্রাচীন মুসলিম রাজত্বের রাজধানী সোনারগাঁ সফর করি। এখান থেকে শেরশাহ সূরী কর্তৃক নির্মিত 'গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড' শুরু হয়ে সিন্ধুর নিলাবে গিয়ে শেষ হয়। বর্তমানে এ জায়গা ঢাকার অদূরে পায়নাম (Palnam) নামে পরিচিত।

ইসলামী নিয়ামতের কদর এবং শোকরের প্রয়োজনীয়তা

প্রথম বক্তৃতার আয়োজন হয় ১৯৮৪ সালের ১০ মার্চ বাদ আছর চট্টগ্রামের পটিয়া আল জামিয়াতুল ইসলামিয়ার বার্ষিক মাহফিলে। 'ইসলামী নিয়ামতের কদর এবং শোকরের প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক বক্তৃতায় বাংলাদেশে সংঘটিত বিগত দিনের ঘটনাবলিকে সামনে রেখে ঈমানের নিয়ামত, দ্বীনের সম্পর্ক, কালিমাপন্থী মুসলমানদের হক, তাঁদের প্রাণ ও সম্মানের হিফাযতকে একেবারে ভুলে গিয়ে এমন আন্দোলন ও সংগ্রামের নিন্দা করা হয় এবং তার

করুণ পরিণতি তুলে ধরা হয়, যাতে উৎসাহ উদ্দীপনার যৌক্তিক লক্ষ্যে পৌঁছতে সান্ত্বনা মেলে। এ ক্ষেত্রে বনী ইসরাঈলের নানা ঘটনার উদ্ধৃতি পেশ করা হয় এবং উভয়ের সমস্যা ও দুর্বলতার সদৃশ্যতা খুঁজে পাওয়া যায়; জাহিলী জাতীয়তাবাদ, গোত্র ও ভাষাপ্রীতির সমালোচনা করা হয়, যা আপন সীমা ছাড়িয়ে যুলুম, কুফর, বর্বরতা এবং মুসলিম হত্যা পর্যন্ত গড়ায়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক ১৩ মার্চ আমাদের সম্মানে হোটেল পূর্বাণীতে আয়োজিত সংবর্ধনায় অনুষ্ঠানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখি। বক্তৃতা শেষে ডিনারের ব্যবস্থা ছিল। রাজধানীর সচেতন নামিদামি ব্যক্তিবর্গ (Cream), উলামা ও বুদ্ধিজীবীগণ ব্যাপকহারে অংশ নেন। ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক জনাব আবূল ফায়েদ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া সাহেব এ অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যাপারে অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন এবং স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন।

আমার বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'মুহাব্বত ও সাচ্চা আধ্যাত্মিকতার বিজয়'। বক্তৃতায় মুসলিম জাতির ঐসব বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়, যার দৃষ্টান্ত অন্যান্য জাতির মধ্যে নেই বললেই চলে। বিশেষত নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, ঈমানী জোশ, আত্মত্যাগের জযবা, বীরত্ব ও সাদাসিধে জীবনের মত গুণাবলির প্রসঙ্গ আলোচিত হয়, যা আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলামের মু'জিযা। আফসোস! এসব গুণাবলির ঘাটতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ঈমান, ইখলাস, আনুগত্যের প্রবহমান স্রোতস্বিনী থেকে ক্ষেতে জলসিঞ্চন করা হয় না। এখন সে গুণাবলি ও যোগ্যতার বৈদ্যুতিক শক্তি নেই, যা দিয়ে মীমাংসা-অযোগ্য সমাস্যাবলির সমাধান মুহূর্তের মধ্যে সম্ভব। অথচ ওইসব গুণ, যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকলে পুরো জাতিকে কেবল সোনা নয়, তার চেয়ে আরো উন্নত ধাতব পদার্থের ন্যায় মূল্যবান কিছুতে পরিণত করা সম্ভব। কেবল এ দেশ নয় পুরো মুসলিম দুনিয়ায় বিপ্লব আনা সম্ভব। এ কাজ কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা সম্ভব নয়, সাচ্চা দিল ও নিষ্টাবান মানুষের কাজ। প্রবীন, নবপ্রজন্ম, ওলামা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের মাঝখানে সাগরসম যে ব্যবধান তৈরী হয়েছে, ক্রমশ তা গভীর ও বিস্তৃত হতে চলেছে। এ শূন্যতা ঘোচাতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে, আলিম ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জাতি ও মিল্লাতের সেবায় নিয়োজিত থাকতে হবে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন আধুনিক শিক্ষিত তরুণদের উপযোগী

ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করবে– এ আমার প্রত্যাশা। ইসলামিক ফাউন্ডেশন জাতির আকাঙ্খার প্রতীক, যার সাথে বহু আশা ভরসা বিজড়িত।

বাংলা ভাষায় আলিমদের দক্ষতা ও নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা

১৯৮৪ সালের ১৪ মার্চ কিশোরগঞ্জ জামিয়া ইমদাদিয়ার উদ্যোগে এক বিরাট সম্মেলন স্থানীয় মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। বিপুল সংখ্যক আলিম, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী এতে অংশ নেন। সম্মেলনে উলামা-মাশায়েখ ও বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করে আমি বাংলা ভাষায় তাঁদের ও নেতৃত্ব প্রদানের আহ্বান জানাই, "নিজেদের দৃষ্টি ও যোগ্যতাকে কেবল মাত্র আরবী ও উর্দূ চর্চায় (সওয়াবের কাজ মনে করে) সীমাবদ্ধ রাখবেন না, বাংলা ভাষায় স্বতন্ত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সৃষ্ঠি করুন। এ ক্ষেত্রে শুন্যতা থাকলে ভাষা, সাহিত্য, লেখনি, বক্তৃতা, নেতৃত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব আলিমদের স্পষ্ট করে বললে দ্বীনদারদের হাতে থাকবে না। অত্যাধুনিক, সংস্কারপন্থী অথবা ইসলাম বিরোধী শক্তির ইজারাদারীতে পরিণত হবে। আমি মসজিদের এ মেহরাবে বসে আপনাদের বলতে চাই, এদেশ কখনো সমৃদ্ধ হতে পারবে না, এদেশে শান্তি ও স্থিতি কোন দিনে আসবে না যদি এদেশের জনগণ ইসলামকে ছেড়ে দেয়। কোন প্রকল্প (Project), কোন পরিকল্পনা (Plan), বহির্বিশ্বের কোন সাহায্য (Aid) ও ভিতরে বাইরের নিরাপত্তা এদেশকে বাঁচাতে পারবে না। বুদ্ধিমানগণ ভাল করে এ কথা হৃদয়ঙ্গম করুন এবং লেখকগণ ভাল করে লিখে রাখুন।"

অতঃপর আমি ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত থাকার এবং পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবনধারা গ্রহণের জন্য ভবিষ্যত বংশধরদের পরামর্শ প্রদান করি। ধর্মীয়, ঈমানী, আমলী ও বিশ্বাসগত ধারাবাহিকতা এদেশে অব্যাহত রাখা চাই। এ বিষয়ের উপর আমি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করি।

জ্ঞান, সাহিত্য ও চিন্তাশক্তিতে স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল হওয়ার প্রয়োজনীয়তা

সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা করেছি ১৯ মার্চ, ১৯৮৪ তারিখে ঢাকাস্থ ইসলামী ফাউন্ডেশন আয়োজিত বুদ্ধিজীবী ও গবেষকদের সম্মেলনে। এ সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল– "এদেশকে জ্ঞান, সাহিত্য, কবিতা ও রচনাশৈলীতে বাইরের গোলামী, মুখাপেক্ষিতা ও প্রজাসুলভ মনোবৃত্তি না

হওয়া চাই। সাহিত্য ও কবিতার অঙ্গনে কর্মরত কোন ব্যক্তি বা সমষ্টি চিন্তার ক্ষেত্রে বাইরের গোলাম হয়ে যাওয়া, মারাত্মক পর্যায়ে প্রভাবিত হওয়া, নিজেরা হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত হওয়া, চিন্তা, স্বকীয়তা ও সাহিত্য বাইরে থেকে আমদানী করা বড্ড বিপজ্জনক। এ অবস্থায় একটি দেশ, একটি প্রজন্ম মুরতাদ হওয়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে। আপনাদেরকে নিজেদের মধ্যে সাহিত্যকর্মী ও কবি তৈরি করতে হবে। মুসলমান কবি সাহিত্যিকদের নায়ক বানাতে হবে, যারা ইসলামের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে জীবনে নতুন প্রাণের সঞ্চার করছেন এবং কবিতা ও সাহিত্যকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। যেমন– আপনাদের কাজী নজরুল ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বের আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল।"

এ প্রসঙ্গে আমি তাতারীদের একটি ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিই। তাতারীগণ একসময় পুরো মুসলিমবিশ্ব রাজনৈতিকভাবে দখল করে নেয়। তাঁদের কাছে নিজেদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র পরিচালনার বিধিবিধান এবং সুসভ্য একটি জাতিকে শাসন করার মত নিজস্ব কোন আইন ছিল না। এক্ষেত্রে তাঁরা মুসলিম মনীষী ও পণ্ডিতদের মুখাপেক্ষী ছিলেন। তাঁরা মুসলমানদের সহযোগিতা নেন। এ সাহায্য, সহযোগিতা ও মুখাপেক্ষিতার ফলে ক্রমান্বয়ে তাতারীগণ ইসলামের ঝাণ্ডাতলে জমায়েত হতে শুরু করে। আমি স্পষ্ট করে উল্লেখ করি :

> "আমি আপনাদের একথা বলতে চাই যে, ঐ জাতি সবসময় বিপদে থাকবে এবং কখনো পুরো স্বাধীন হতে পারবে না, যতক্ষণ না জ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতির দিক দিয়ে অন্য জাতির মুখাপেক্ষী ও সাহায্যপ্রার্থী হবে। যে জাতি প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম, তাঁরা অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর মন মানসিকতা ও চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। প্রভাবিত জনগণ তাঁদের আদর্শ ও মূল্যবোধকে অবলীলাক্রমে মেনে চলে। পরিশেষে, আশংকা থাকে একসময় হয়তো তাদের ধর্মকেও তারা গ্রহণ করে বসবে।"

এ ভাষণ কেবল সম্ভাবনা ও দূরবর্তী আশংকার উপর নির্ভর ছিল না। বাংলাদেশে অবস্থানকালীন আমি শুনেছি, পশ্চিমবঙ্গ থেকে একজন অমুসলিম লেখক ও সাহিত্যিক এসেছিলেন, তাঁর অভ্যর্থনা ও সম্মানে মুসলমান কবি সাহিত্যিকগণ এমন বাড়াবাড়ি শুরু করে যে, মনে হয় যেন আসমান থেকে

ফেরেশতা নাযিল হয়েছে। সবাইকে দেয়ালের লিখন পড়তে হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শ ও চিন্তাদর্শন (আমরা নিজেরাও তাঁর কবিতা ও সাহিত্যের গুণমুগ্ধ পাঠক) যদি এদেশের মানুষের চিন্তা চেতনাকে যাদুর সম্মোহনে আচ্ছন্ন করে, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মত বাংলাদেশের মানুষও রবীন্দ্রবৃত্তে বন্দী হয়ে যাবে। যেমন– ইউরোপ ও এশিয়ায় বহু দেশ গ্রীক দর্শনের গোলাম হয়ে যায়। এর দ্বারা মুসলমান ও খ্রিষ্টান জগতে ধর্মহীনতা ও বুদ্ধিপূজা বিস্তার লাভ করে।

এটা জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ ইসলামী সাহিত্যের মূদ্রণ ও প্রচারের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। আমার বেশ কিছু গ্রন্থ লক্ষ্ণৌস্থ মজলিসে তাহকীকাত ও নাশারিয়াতে ইসলাম এর পক্ষ হতে অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছে। যতদূর জেনেছি, এর গতি শ্লথ, আরো বেশি মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন।

সফরসঙ্গীদের ব্যস্ততা

বাংলাদেশে ১০ দিনের সফরে আমার তিন সফরসঙ্গী মাওলানা আব্দুল করিম পারেখ, মাওলানা ইরফান নদভী, স্নেহের মাওলানা সাইয়িদ সালমান নদভীর বক্তৃতার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। তাঁদের বক্তব্য দ্বারা বহু মানুষ উপকৃত হয়। পবিত্র কুরআনুল কারীমের উপর মাওলানা আব্দুল করিম পারেখের বেশ পান্ডিত্য থাকায় তিনি এর আলোকে উপকারধর্মী ও আত্মসংশোধনমূলক বক্তৃতা করেন। পুরনো নিসাবে তালিম, দারসে নিযামীর ইতিহাস-এর লিখন ও সংকলকদের বিভিন্ন স্তর এবং ভারতের ইসলামের ইতিহাসের উপর মাওলানা আবুল ইরফান নদভীর এমন পারঙ্গমতা রয়েছে– যা আমাদের আলিমদের মধ্যে কম মানুষেরই আছে। তাঁর বক্তৃতা সাধারণত মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য বড্ড উপকারী। স্নেহের মাওলানা সালমান নদভী উর্দূ ও আরবী ভাষায় সমান পারদর্শী। মাদরাসাগুলোতে সাধারণত তাঁর বক্তৃতা আরবীতে হয়। মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য তাঁর বৈচিত্র্যময় ভাষণ ছিল অত্যন্ত সময়োপযোগী ও উপাদেয়। ২০ মার্চ বিমানযোগে কোলকাতা প্রত্যাবর্তন করি।

এ সফরে মাওলানা সুলতান যওক নদভী সাহেব, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক আবুল ফায়েদ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া সাহেব, হাজী বশিরুদ্দীন সাহেব, ঢাকা আলিয়ার সাবেক সদর মুদাররিস মাওলানা ওবায়দুল হক সাহেব, তাঁর ছেলে স্নেহের মাওলানা সাউদুল হক নদভী ও মাসিক মদীনার

সম্পাদক মাওলানা মুহীউদ্দিন খান সাহেব সবসময় আমাদের সঙ্গ দিয়েছেন এবং সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। আমীন।

করাচীতে ৪ দিন : ব্যাপক ব্যস্ততা

১৯৮৪ সালের ২১মে ইয়ামেনের রাজধানী সানআ হতে জেদ্দায় পৌঁছি। দু'দিন ওখানে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎ, বৈঠক ও পাকিস্তানের ভিসা সংগ্রহে অতিবাহিত হয়। ২৩ মে জেদ্দা থেকে করাচী রওনা হই। সাধারণত আমি রামাযানে মাতৃভূমি রায়বেরেলীতে অবস্থান করি। আশেপাশের বিভিন্ন এলাকা হতে বন্ধু-বান্ধব এবং আমার সাথে যারা ইসলাহী সম্পর্ক রাখেন, তাঁরা ওখানে এসে রামাযান অতিবাহিত করেন। যেহেতু রামাযান আসন্ন, তাই পাকিস্তানে বেশি দিন অবস্থান করা এবং নানা স্থানে পরিভ্রমণের সুযোগ ছিল না। মাত্র ৪ দিন অবস্থানের প্রোগ্রাম ছিল। এ ৪ দিন করাচীতে কাটিয়েছি ১৯৭৮ সালের পর। রাবেতা আলমে ইসলামীর এশীয় সম্মেলন উপলক্ষে পাকিস্তান গিয়েছিলাম এবং বিভিন্ন শহর পরিভ্রমনের সুযোগ হয় (দ্রঃ বিস্তারিত জানতে দেখুন 'কারওয়ানে যিন্দেগী' ২য় খণ্ড, অধ্যায় ১১।

আমার আত্মীয় স্বজনের বিরাট একটি অংশ করাচী ও লাহোরে থাকেন। পরিবারের দু'তৃতীয়াংশ সদস্য বিশেষত টুংক ও ভূপালের নিকট আত্মীয়গণ দেশবিভাগের পর পাকিস্তানে চলে আসেন। স্নেহের রাবে হাসান নদভী ও ওয়াযেহ রশীদ নদভীর চাচাত ভাই করাচীতে থাকেন। এজন্য সময়স্বল্পতা, পাকিস্তানের বিশালতা এবং এখানকার আপনজনদের আধিক্য সত্ত্বেও ৪/৫ দিন সময় বের করতে হয়। নিয়মমাফিক আমি করাচীতে আমীরুল মুলক নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালীর দৌহিত্র মাওলানা কারী সাইয়িদ রশীদুল হাসানের বাসভবনে উঠি। এটি আমার ভাগ্নীর ঘর। কারী সাহেব বিন্নুরী টাউনের (নিউটাউন) জামে মসজিদের ইমাম ও খতীব ছিলেন। এ মসজিদটি দারুল উলুম নিউটাউনের সন্নিহিত অঞ্চলে হওয়ায় মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মিলিত হওয়ার সুবিধে ছিল।

৪ দিনের এ সফরে ৬টি বক্তৃতা করি গুরুত্বপূর্ণ ও নির্বাচিত সমাবেশে। সে সময় পাকিস্তানে রাজনৈতিক সংকট চরমে। ছাত্র আন্দোলনের অস্থিরতা ক'দিন আগে স্তিমিত হয়েছে মাত্র। বহুদিন পর সবেমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে। যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তা কেবল পাকিস্তানের জন্য নয় বরং মুসলিম উম্মাহর জন্য উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। এ দেশ অনেক আশা

ও কুরবানীর বিনিময়ে অর্জিত হয়। উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে এদেশের জন্য চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। পাকিস্তানের বন্ধু-বান্ধব, ভক্ত-অনুরক্ত এবং ইসলামী রাষ্ট্রের কল্যাণকামীদের যখন আমার আগমনের খবর পৌঁছে, তখন বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থার পক্ষ হতে বক্তৃতার দাওয়াত আসে। প্রত্যেকের আবদার রক্ষা করা তো সম্ভব হয়নি। তবুও ফার্সী ভাষার এ পুরনো কবিতার উপর আমল করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

এসব বক্তৃতা ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। আমার পুরনো বন্ধু মাওলানা মুহাম্মদ নাযিম সাহেব নদভী 'তুহফায়ে পাকিস্তান' শীর্ষক বক্তৃতায় কিছু ভূমিকা উল্লেখ করেন। যেমন–

১. মুসলিম উম্মতের ঐতিহাসিক শত্রুদের ভূমিকা

২. পাকিস্তানের ইসলামী ব্যক্তিত্বের হিফাযত ও তাঁদের অবদানের স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন

৩. পাকিস্তানের সাধারণ নাগরিকদের জীবনধারা।

একটি বিষয় বেশ উদ্বেগজনক ও বেদনাদায়ক-তা হলো দৈনন্দিন জীবনে অপচয়, অনুষ্ঠানাদিতে বিত্তশালীদের জীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে অহেতুক ও মাত্রাতিরিক্ত প্রতিযোগিতা, যার ফলে সামাজিক অধঃপতন, নৈতিক ব্যাধি ও জীবনের বহু সমস্যার উদ্ভব ঘটে।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী সমাজব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা

করাচীতে অবস্থানকালে প্রথম ভাষণ অনুষ্ঠিত হয় ২৫ মে বিন্নুরী টাউন জামে মসজিদে। জুমার নামাযের আগেই উলামা, শিক্ষিত ব্যক্তি ও সাধারণ জনগণ মসজিদে হাযির হয়ে যান। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী সমাজব্যবস্থার প্রয়োজনীতা'।

এ সম্মেলনে পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করা হয় যে, ইসলামের আগমন ও রাসূলুল্লাহর (সা.) আবির্ভাবের সময় ব্যক্তি জীবনে সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও আমানতদার মানুষ একেবারে নিঃশেষিত হয়নি। পবিত্র কুরআনে এর উল্লেখ রয়েছে।[১] কিন্তু বংশ, মানব সংস্কৃতি ও মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গির উপর তাঁরা কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তাঁরা ছিলেন বর্ষণমুখর অন্ধকার রাতে জোনাকির মত অথবা অন্ধকার রাতে বনবাদাড়ে পথদেখানো প্রদীপের মত। সে সময় প্রয়োজন ছিল রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় পর্যায়ে একটি ইসলামী

১. সূরা আলে ইমরান : ১১৩-১১৫

সমাজব্যবস্থা, যা গোটা পৃথিবীর জন্য আদর্শ নমুনা হতে পারে এবং মানুষকে চিন্তা ও বিপ্লবের দাওয়াত দিতে পারে। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহ.) এর মতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আবির্ভাবের ফলে পুরো উম্মত শক্তিশালী রূপ পরিগ্রহ করে। এই উম্মত এমন এক স্বাধীন, আদর্শ মানোত্তীর্ণ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে গেছে, যার কোন প্রতিনিধি পর্বত চূড়ায় অথবা নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে পারে না। তাঁদের সাথে ছিল রাষ্ট্রীয় কর্ণধার, সম্পত্তি, শক্তি, ব্যবসা, জীবিকা নির্বাহের উপায়-উপকরণ ও বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ। তাঁরা এমন এক জীবনের নকশা সফলতার সাথে তৈরী করে, যার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করার জন্য সেসময় গোটা পৃথিবী বাধ্য হয়। সারা দুনিয়ার সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার অগ্রযাত্রায় ইসলাম এমন সুগভীর প্রভাব বিস্তার করে, যা ভাবতে অবাক লাগে। বিভিন্ন দেশ ও জাতিগোষ্ঠীর মানুষ অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করে যে, ইসলামী আকিদা মানব জীবনধারায় কী নবতর পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়।

আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ ও হিদায়াত মানবজাতিকে কীভাবে সজ্জিত ও আলোকে উদ্ভাসিত করে এবং শরীয়তের শিক্ষা ও আদর্শ মানবচরিত্রে কীভাবে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে, গোটা পৃথিবী তা প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য হয়। ইসলামের আগমন ও মুসলিম উম্মতের প্রয়াস-প্রচেষ্টা ছাড়া মানবতার পূর্ণতা সাধন অসম্ভব ছিল।

"আপনাদের এদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি মহৎ উদ্দেশ্য ও দাবী নিয়ে, তা হলো– একটি আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে আপনারা মুসলিম দুনিয়াকে দেখাবেন। চিন্তা করে দেখুন, উদ্দেশ্য ও দাবী পূরণে আপনারা কতদূর সফল; পরীক্ষায় আপনাদের ভূমিকা কতটুকু কার্যকর।"

নৈতিক ও শক্তিশালী সমাজব্যবস্থাই নেতৃত্ব ও সভ্যতা নির্মাণের ভিত্তি

২৫মে মু'তামার-ই আলাম-ই ইসলামী-এর উদ্যোগে করাচী ইয়ারজঙ্গ একাডেমিতে সংবর্ধনা ও নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। রাবেতা আল আলম আল-ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও মু'তামার আলমে ইসলামীর মহাসচিব বন্ধুবর ড. ইনামুল্লাহ খান ছিলেন অনুষ্ঠানের মূল আয়োজক। এ অনুষ্ঠানে শুধু করাচী নয় বরং পুরো পাকিস্তানের বাছাইকৃত শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ ব্যাপকভাবে উপস্থিত ছিলেন। ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ও বাস্তবতার নিরিখে এবং সমাজবিজ্ঞান, নীতিবিদ্যা এবং রাজনীতি

বিজ্ঞানের সহায়তায় আমি প্রমাণ করার চেষ্টা করি যে, শক্তিশালী সমাজব্যবস্থা হলো নৈতিকতানির্ভর সংস্কৃতি ও নেতৃত্বের আসল বুনিয়াদ। এ প্রসঙ্গে তাতারীদের ইসলাম গ্রহণের মনস্তাত্ত্বিক কারণ এবং মুসলমানদের জ্ঞানচর্চা, রূহানী ও নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের উপাদানগুলো তুলে ধরা হয়।

এভাবে ভারতে মুসলিম রাজত্ব দীর্ঘকাল যাবত টিকে থাকার আসল কারণ ব্যাখ্যা করা হয়। মুসলিম সমাজকে অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে কামিল দরবেশ ও সুফীদের ভূমিকা ও অবদানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। পরিশেষে এ কথাও বলা হয় যে, গণতান্ত্রিক কোন রাষ্ট্রের সমাজ যখন দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখন গণতন্ত্রের প্রদীপ নিভে যায় এবং স্থায়ীত্ব ও উন্নতির সম্ভাব্য পথগুলো রুদ্ধ হয়ে পড়ে।

সত্যিকারের ইসলামী নেতৃত্বের দায়িত্ব ও তাঁর সুফল

২৭মে ফারান ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় করাচীতে বিখ্যাত মেট্রোপোল হাসপাতালে এক বিরাট সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উর্ধতন সরকারী কর্মকর্তা, নগরের অভিজাত ব্যক্তি ও উচ্চশিক্ষিত লোকেরা অধিকহারে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় 'সত্যিকারের ইসলামী নেতৃত্বের দায়িত্ব ও তাঁর সুফল'। এ ভাষণে সত্যিকারের ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্র, তাদের ত্যাগ ও কুরবানী, নিষ্ঠা ও আল্লাহভীতির বিস্ময়কর উদাহরণ পেশ করা হয়। আমি উল্লেখ করি যে, তাকবিরের ধ্বনি একসময় আকাশে বাতাসে অনুরণিত হয়েছিল, তা এখন দোকানে, বাড়িতে এমনকি যুদ্ধের ময়দানে পর্যন্ত তাঁর প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। এ মুহূর্তে সবচে' বড় প্রয়োজন পৃথিবীর সামনে একটি নতুন জীবনব্যবস্থা পেশ করা, যার মধ্যে থাকবে বিরামহীনতা, গতিবেগ, স্পন্দন ও উদ্দীপনা। যে দেশে এমন জীবন ব্যবস্থা চালু থাকবে, পৃথিবীর নানা জাতিগোষ্ঠীর কাতারে সে দেশ সম্মান ও মর্যাদার আসন লাভ করবে।

পদলিপ্সা ও ক্ষমতার মোহ সবচেয়ে বড় বিপদ

আমি স্পষ্ট ভাষায় বলেছি যে, একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশে আমি যে বিপদের আশংকা করি, তা হলো– পদলিপ্সা ও ক্ষমতার মোহ। এ লিপ্সা ও মোহ দেশকে ফোকলা বানিয়ে দেয়। আপনারা জানেন যে, প্রতিটি যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের যে পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হয়েছে, তার পেছনে আছে সুযোগসন্ধানীদের অপপ্রয়াস। আব্বাসীয় খিলাফত থেকে মুঘল যুগ এমনকি

টিপু সুলতানের সময় পর্যন্ত সুযোগসন্ধানী ও ক্ষমতালিপ্সুদের অপতৎপরতা চোখে পড়ার মত। তারাই এসব শাসন ও রাজত্ব নিঃশেষ করে দিয়েছে। এর পরে আমার যে আশংকা তা হলো, আঞ্চলিকতা ও ভাষাগত বিদ্বেষ। এটি আসলে বড় ধরনের বিপদ। আপনাদের দেশ এ বিপদের মুখোমুখি। সবাইকে এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

তরুণদের দায়িত্ববোধ ও আত্মসচেতনতা রাষ্ট্রের মূল সম্পদ

২২মে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ আসে। এতে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জামিল জালভী। যেসব বর্ণনা কানে এসেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে হিংসা-বিদ্বেষের যেসব চিহ্ন লেগে আছে এবং ক্ষমতাসীনদের উদ্দেশ্যে লিখিত অসম্মানজনক শ্লোগান দেখে আমার মনটা ভারী হয়ে উঠে। এ কারণে বক্তৃতার প্রকৃতি ও প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করি তরুণদের চরিত্র ও ভূমিকা। আমি জানতে চেয়েছি, তাদের এমন কোন চরিত্র ও অবদান রয়েছে, যা দেশের অগ্রগতি ও হিফাযতের নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম? আমি বলেছি, "আমাকে যদি কেউ কোন দেশের প্রশংসা করে বলে সে দেশ সামরিক শক্তির মালিক, অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বৃহৎশক্তিবর্গের সাথে সে দেশের সম্পর্ক মধুর– এ কথা শুনে আমি সন্তুষ্ট হবো না। বরং আমি বলবো, আমাকে বলুন সে দেশের স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের নবপ্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মধ্যে দায়িত্ববোধের অনুভূতির মাত্রা কোন পর্যায়ে রয়েছে, নিজকে নিয়ন্ত্রণে রাখার কতটুকু শক্তি তাদের আছে, নিজেদের অনুভূতি ও সংবেদনশীলতাকে ভারসাম্যের সীমার মধ্যে রাখার দক্ষতা কতটুকু এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার অভ্যাস তাদের আদৌ আছে কিনা। যদি ঐ ব্যক্তি আমাকে বলেন, "এসব ব্যাপারে আমিতো সন্তোষজনক জবাব দিতে পারবো না।" তখন আমি বলবো– "সে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের ব্যাপারে আমি সন্তুষ্ট নই বরং উদ্বিগ্ন।"

আমি শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে এ সমাবেশে উল্লেখ করি, "আমি ব্রিটিশ ইতিহাসের (English History) ছাত্র নই। সেজন্যে পূর্ণ দায়িত্বশীলতার সাথে চারিত্রিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিপ্লবের উৎস এবং আন্দোলনের পথিকৃৎদের চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছে না, যারা ইংরেজ জাতির অন্তরে নবতর প্রেরণার বীজ বপন করেন। এভাবে তাঁরা ভারতীয় উপমহাদেশসহ আশেপাশের অনেক দেশকে ব্রিটিশ শাসনাধীন নিয়ে আসতে সক্ষম হন। এ বিষয়টি নিয়ে আপনাদের এবং ইতিহাসের পাঠকদেরকে আরো অধ্যয়ন ও

অধিকতর গবেষণার আহ্বান জানাই। এর চাইতে আরো বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল মরুচারী আরবদের বিপ্লব। শত বছর ধরে যারা নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ময়দানে পশ্চাৎপদ ছিল– ইসলাম তাদেরকে বিশ্বসভ্যতা ও শক্তিধর রাষ্ট্রের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়। আপনাদের এক বিখ্যাত কবি মাওলানা যফর আলী খান যথার্থই বলেন :

> 'কী আশ্চর্য! প্রশিক্ষণহীন কতিপয় উষ্ট্রচালক পারস্য ও রোমের শক্তির কাছে হার মানেনি। বাধার সৃষ্টি করেছে যারা, কর্পুরের মত উবে গেছে তারা। তাঁদের পরশে মাটি হয়েছে সোনা।'

আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, এক বিরাট রাষ্ট্র এবং এত বড় দায়িত্ব পাওয়ার পরও এখানে বিপ্লব আসেনি কেন? পরিশেষে আল্লামা ইকবালের কথা দিয়ে বক্তব্যে ইতি টানছি :

> 'তুমি তো ফিনিক্স পাখির শিকারী, সবে তো তোমার যাত্রা শুরু। সম্পদে ভরা এ দেশ মোটেই উপযোগিতাশূন্য নয়।'

একটি স্বাধীন দেশে আলিমদের দায়িত্ব

স্নেহাস্পদ মাওলানা মুফতী ওলী হাসান টুংকীর আমন্ত্রণে জামিয়াতুল উলুম আল ইসলামিয়া বিন্নুরী টাউনে ছাত্র-শিক্ষক ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করি। এতে একটি স্বাধীন দেশের আলিমদের দায়িত্ব ও কাঙ্ক্ষিত গুণাবলির ঐতিহাসিক উদাহরণ সবিস্তারে তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি, আশংকাগুলোকে চিহ্নিত করার প্রয়াস পাই। অনেক সময় বাইর থেকে আগত ব্যক্তিদের চোখে এসব ধরা পড়ে বেশী। এখানে প্রথমত, রয়েছে আস্থা ও বিশ্বাসের ঘাটতি এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা, দ্বিতীয়ত, আলিমদের সাথে জনগণের যোগাযোগের অভাব; তৃতীয়ত, আলিমদের মধ্যে সাধারণত আমাদের কীর্তিমান মনীষীদের মত বুযুর্গ, তাওয়াক্কুল, সাদাসিধে জীবন, পরোপকারের মানসিকতা কম। এ অবস্থা কেবল পাকিস্তানে নয় গোটা মুসলিম বিশ্ব এসব রোগে আক্রান্ত। এ সংক্রান্ত কতিপয় উদাহরণ তুলে ধরা হয়। চতুর্থত, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বিদ্বেষ এ দেশের জন্য ভয়ানক সমস্যা; এটাকে বন্ধ করার জন্য আলিমদের সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে।

অতঃপর আমি পূর্বসূরী মুরব্বিদের নিয়ে গৌরব করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করার সমালোচনা করি। আমাদের মুরব্বিগণ এমন ছিলেন, এমন করতেন–

এসব কথা সব সময় অযিফার মত উচ্চারণে কোন ফযিলত নেই। ইতিহাস দিয়ে কোন দাওয়াত ও মিল্লাত চলে না বরং আন্দোলনের মাধ্যমে চলে। উল্লেখ্য যে, ১৯৮৭ সালে করাচীতে সিন্ধী-পাঠান-মুহাজিরদের মধ্যে সংঘটিত দাঙ্গা ও সংঘাতে যে বিপুল পরিমাণ রক্তপাত ঘটে, তাতে ভারতীয় মুসলমানদের মাথা হেঁট হয়ে যায়।

সর্বদা সতর্ক ও প্রস্তুত থাকার প্রয়োজনীয়তা

২৬মে 'আঞ্জুমানে ইশায়াতে কুরআনে আযীম'-এর ব্যবস্থাপনায় আরেকটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয় হায়দ্রাবাদ কলোনিস্থ ফোরকানিয়া মসজিদে। এ সংবর্ধনার উদ্যোক্তা ছিলেন পাকিস্তানের সাবেক একাউন্টেন্ট জেনারেল সাইয়িদ মুহাম্মদ জামিল সাহেব। বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল মিশরবিজয়ী হযরত আমর ইব্ন আল আস (রা.)-এর দার্শনিক উক্তি 'আন্‌তুম ফি রিবাতিন দাইম' অর্থাৎ– 'হে মিশর বিজয়ী সেনা সদস্যগণ ও শাসকবর্গ! তোমরা স্থায়ীভাবে যুদ্ধের ময়দানে রয়েছ।' এর বিশদ ব্যাখ্যা ও বিবরণ ইয়ামেনের বক্তৃতায় রয়েছে। এখানকার সমাবেশে স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্রের দূরদর্শী ও দৃঢ়চেতা নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য তুলে ধরা হয়। আমি উল্লেখ করেছি, "ফিতনা ফ্যাসাদ কেবল বহিঃশক্তির ষড়যন্ত্রে নয় অভ্যন্তরীণ কারণেও হতে পারে। এমন অবস্থা সবচেয়ে বিপজ্জনক ও দূরপ্রসারী হয়ে থাকে। যখন কোন রাষ্ট্রে অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা সৃষ্টি হয়, তখন ঘুনের মত সব ক্ষয় করে ফেলে। যেমন– পোকা তেতুল বা বটবৃক্ষকে ভেতর থেকে সাবাড় করে দেয় অথচ গাছটি তখনও দাঁড়িয়ে থাকে। দূর থেকে মজবুত বলে মনে হয়। পথিক ও বরযাত্রীগণ দলে দলে সে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়। কিন্তু বাতাসের সামান্য ঝাপটায় মুহূর্তে সে গাছ ধরাশায়ী হয়ে যায়। আপনারা 'আন্‌তুম ফি রিবাতিন দাইম'-কে জীবনের সংবিধান বানিয়ে নিন। সর্বদা সচেতন, হুশিয়ার, কর্মচঞ্চল ও প্রস্তুত থাকা চাই।"

২৯ মে আমরা দিল্লী হয়ে লক্ষ্ণৌ পৌঁছি। দু'দিন পরই রামাযান শুরু হতে যাচ্ছে। তাই রায়বেরেলী পৌঁছে প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

'তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত' ৫ম খণ্ড

'কারওয়ানে যিন্দেগী' ১ম খণ্ডে 'তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত' সিরিজের সূচনার বিস্তারিত পর্যালোচনা উল্লিখিত হয়েছে। এর প্রয়োজনীয়তা এবং এ আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিদের উপর আলোকপাতও রয়েছে।[১]

১. 'কারওয়ানে যিন্দেগী', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১১-৪১৭

এ সিরিজের ৪র্থ খণ্ড হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.)-এর সময়কাল এবং তাঁর নজীরবিহীন ইসলাহী ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে ঘিরে রচিত। এ খণ্ডটি ১৯৮০সালে মুদ্রিত হয়। এর আরবী অনুবাদ কুয়েতের'দারুল কলম প্রকাশনী' থেকে বের হয়। হাকিমুল ইসলাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর জীবন, কর্ম ও তাঁর খলিফাদের নিয়ে ৫ম খণ্ড তৈরীর কাজ অত্যধিক ব্যস্ততা ও ধারাবাহিক সফরের কারণে বেশ বিলম্বিত হয়ে পড়ে। অবশেষে ১৯৮৪সালে ৫ম খণ্ড রচনার সুযোগ আসে।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর ব্যক্তিত্ব সত্যিকার অর্থে শায়খুল ইসলাম হাফিয ইব্ন তাইমিয়া (রহ.)-এর পর পবিত্র কুরআন ও সুন্নাতে রাসূলের জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহ.) ছিলেন শায়খ ইব্ন তাইমিয়া (রহ.)-এর উদ্যমী মুখপাত্র, চিন্তার ধারক ও চেতনার বাহক এবং যুগান্তকারী এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। [১. কিছু কিছু ক্ষেত্রে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহ.) ছিলেন হাফিয ইব্ন তাইমিয়া (রহ.)-এর চাইতেও ব্যাপক ও সর্বজনীন ব্যক্তিত্ব]

ভারতীয় উপমহাদেশের কথা যদি বলি, তাহলে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহ.) ছিলেন তাঁর যুগের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এমন এক যুগের সূচনা করেন, যার ভিত্তি ছিল আহলে সুন্নাতের আদর্শ, চিন্তা-গবেষণা, শিক্ষাবিস্তার, গ্রন্থপ্রকাশনা, মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, সংস্কারধর্মী কর্মপ্রয়াস ও ভারতে মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা। সে যুগের ধারাবাহিকতা এখনো চলমান এবং ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, সে যুগের কোন চরিত লেখক ও ইতিহাসগবেষক শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর জ্ঞাননির্ভর, সংস্কারধর্মী ও গবেষণামূলক কর্মপ্রয়াসের উপর প্রামাণিক কোন গ্রন্থরচনায় হাত দেননি। তাঁর উচ্চতর গবেষণা, দ্বীনের ব্যতিক্রমধর্মী গভীরতর ইলম, জ্ঞানবত্তা ও সজ্ঞা যবনিকার অন্তরালে থেকে যায়। অথচ শায়খের সাথে সম্পর্কিত কলমসৈনিক ও আহলে ইলমের উপর এ গুরু দায়িত্ব বর্তায়। আরবদেশ, মিশর, সিরিয়া ও হিজায তো দূরের কথা, জ্ঞান-গবেষণার জগতে বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহ আল বালিগা'-এর ভূমিকা, টীকা-টিপ্পনী ও লেখক পরিচিতি ছাড়াই ভারত থেকে প্রকাশিত হয়। এ অভাব বহুদিন ধরে অনুভূত হয়ে আসছে। এ গ্রন্থের লেখকের পরিবারের সাথে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে। আমার আগ্রহ ছিল, এ কাজটি যেন আমাদের উপরে আসে। অবশেষে আল্লাহ আমাদের

তাওফিক প্রদান করেন। 'তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত'-এর ৫ম খণ্ড পরিকল্পনামতে প্রস্তুতির কাজে হাত দিই।

কিন্তু এ কাজটি সহজসাধ্য ছিল না। দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বের ইলমী, দ্বীনি, চৈন্তিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উপর নজর দেয়ার প্রয়োজন ছিল। একইভাবে এ শতাব্দীর ভারতের সার্বিক অবস্থার মূল্যায়ন, শাহ সাহেবের তাজদিদী ও সংস্কারধর্মী অবদানের বৈশিষ্ট্য, ইসলামী শরীয়তের দালিলিক প্রতিনিধিত্ব, হাদীস ও সুন্নাতে নববীর পরিচয় ও দু'টি জগতখ্যাত গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহ আল বালিগা' ও 'ইযালাতুল খাফা'-এর পরিচয় তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল। অতঃপর হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক অস্থিরতা, মুঘল রাজত্বের পতনযুগে শাহ সাহেবের মুজাহিদসুলভ দুঃসাহসিক নেতৃত্ব ও ভূমিকার বর্ণনা, উম্মতের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ, দাওয়াতী কর্মপ্রয়াস এবং শাহ সাহেবের সন্তান-সন্ততি, শিষ্য ও মর্যাদাবান খলীফাদের পবিত্র কুরআন হাদীসের তালীম, শিক্ষাবিস্তার, বিদআতের মূলোৎপাঠন, সুন্নাতে রাসূলের পুনরুজ্জীবন ও ভারতে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ৫ম খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়াস পাই।

আল্‌হামদুলিল্লাহ! ১৯৮৪ সালের প্রারম্ভিক মাসগুলোতে গ্রন্থরচনা সম্পন্ন হয় এবং মে মাসে ছাপা হয়ে বাজারে আসে। এ গ্রন্থের মানবৃদ্ধিকারী একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' ও 'ইযালাতুল খাফা' গ্রন্থদ্বয়ের সারসংক্ষেপ এতে বর্ণিত হয়েছে। আমার লিখিত দাওয়াতী সিরিজের ৫ম খণ্ডটি প্রকাশিত হওয়ার আগে বহু আলিম ওলামা ও জ্ঞানী-গুণী মানুষের পক্ষে শাহ সাহেবের উক্ত গ্রন্থ দু'টি গভীরভাবে অধ্যয়নের সুযোগ হয়নি। দিন দিন আরবী ও ফার্সী ভাষার প্রতি জনগণের দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ায় একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষের গ্রন্থ দু'টির আবেদন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। 'তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত'-এর ৫ম খণ্ডটি আরবী তরজমা করেন স্নেহাস্পদ মাওলানা সাইয়িদ সালমান নদভী এবং কুয়েতের 'দারুল কলম প্রকাশনী' তা প্রকাশ করে। এভাবে ইসলামের ইতিহাসের সংস্কারমূলক পুনরুজ্জীবনধর্মী কর্ম প্রয়াসের এবং এ আন্দোলনের ঝাণ্ডাবাহী মনীষীদের ধারাবাহিক ও প্রামাণিক দলিল তৈরী হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত অন্য কোন মুসলিম দেশের ভাষায় এ বিষয়ের কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। কিন্তু আফসোসের বিষয় উপমহাদেশের জনগণ শাহ ওয়ালীউল্লাহী আন্দোলনের প্রয়োজন ও গুরুত্ব পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি এবং লাভবানও হতে পারেনি। অথচ এ দেশে ও এ যুগে এর প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক।

তৃতীয় অধ্যায়

সর্বভারতীয় হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী আন্দোলন
মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর নামে একটি ঐতিহাসিক চিঠি
ইন্দিরাজীর নিহত হওয়া, শিখদের বিরুদ্ধে তার গৃহীত পদক্ষেপ ও আমার অবস্থান
আরবের পথে একবারের ভ্রমণবৃত্তান্ত
পয়ামে ইনসানিয়ত-এর সাংগঠনিক সফর
ইংল্যান্ড ও বেথলেহেম যাত্রা

হিন্দু পুনর্জাগরণবাদের ঝড় এবং মুসলিম মিল্লাতের শঙ্কা

প্রিয় পাঠক! আপনাদের হাতে থাকা এ গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পড়েছেন, অগাস্ট ১৯৭৯ জনতা পার্টি সরকারের পতন ঘটে, যারা ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন হয়েছিল। ১৯৮০ সালের সাধারণ নির্বাচনে ফলাফলের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিসমাপ্তি ঘটে আর কংগ্রেস (আই) পুনরায় ক্ষমতাসীন হয়। একটি সুসংগঠিত, সুসংহত, নিয়মতান্ত্রিক দল হিসেবে যার দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে, স্বতন্ত্র কর্মপদ্ধতি, দেশগড়া ও উন্নয়নে যাদের নৈতিক অঙ্গীকার, ঘোষিত কর্মসূচি ও রাজনৈতিক ইশতেহার রয়েছে। সেই রাজনৈতিক দলের সরকার ও বিশেষভাবে সরকারের কর্ণধার হিসেবে ইন্দিরাজীর কাছে প্রত্যাশা ছিল, তিনি কঠোরভাবে কংগ্রেসের নীতিমালা ও ঘোষিত ইশতেহার অনুসরণ করবেন। দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় জনগোষ্ঠী বিশেষত, অমুসলিম সংখ্যগরিষ্ঠ ও মুসলিম সংখ্যালঘুদের মাঝে পারস্পরিক আস্থা আর গভীর সৌহার্দ প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠা ও প্রত্যয়দীপ্ত ভূমিকা পালন করবেন। একই সঙ্গে, এমন কোনো আন্দোলনকে সফল হতে দেবেন না, যা নাগরিকদের মাঝে পারস্পরিক ঘৃণা, বিভেদ ও সংঘাতকে উস্কে দেয়। সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অর্জন, প্রতিভা, উদ্যম, কর্মস্পৃহাকে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, প্রতিরক্ষা, জাতীয়তা স্বাতন্ত্রের সুরক্ষা, দেশগড়া ও এর উন্নয়নে (যা এই মুহূর্তে রাষ্ট্রের জন্য খুবই জরুরি ছিল এবং যা ছাড়া কোনো

গণতান্ত্রিক সমাজ টিকে থাকতে পারে না) কাজে না লাগিয়ে সেই অর্জন, প্রতিভা, উদ্যম প্রভৃতি শক্তিকে নিজেদের নিরাপত্তা, জাতীয় স্বাতন্ত্র্যরক্ষা, মূল্যবোধ (Values), বিশ্বাস, প্রতীকসমূহ আর স্বকীয় ঐতিহ্যের সুরক্ষায় নিয়োজিত করবেন, যা তাদের কাছে স্বীয় জীবনের চেয়েও প্রিয়।

বর্তমান নির্বাচনী-পদ্ধতির অন্যতম বড় নেতিবাচক দিক হলো, এতে লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রের বৈধ-অবৈধ, কল্যাণ-অকল্যাণকর উপায় বা পন্থার বাছ-বিচার পুরোপুরি উপেক্ষিত। পশ্চিমা রাজনীতি ও তাদের এই পুরনো নৈতিক দর্শন উদ্দেশ্যের যথার্থতা অর্জনের উপায়-অবলম্বনকে আপনি আপনিই বৈধতা দেয়। এতে (The End Justifies The Means) তত্ত্বকে আগাগোড়াই অনুমোদন দেয়া হয়। যখন অনুসৃত অবলম্বনগুলো উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে সফলতা এনে দেয়, তখন সেসব অবলম্বনকে উপেক্ষা করা সম্ভবপর হয় না। এভাবে ক্ষমতা রক্ষার জন্য উপায়-অবলম্বনের বেলায় নীতি-কৌশল, মানদণ্ড, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা এড়িয়ে চলতে হয়। আর বিরত থাকতে হয় এমনসব বিষয় থেকেও– যা সরকারকে অর্জনপ্রিয় এবং প্রভাবশালী শ্রেণীর কাছে অপছন্দের কিংবা তাদের সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু হবার ঝুঁকি তৈরি করে।

নিজেদের সামষ্টিক (শ্রেণীগত) দুর্বলতা এবং ফলে হীনম্মন্যতা, উপদেষ্টাগণের ব্যক্তিগত অভিলাষ, বিভিন্ন প্রদেশের প্রশাসনিক দায়িত্বশীলদের নিজস্ব পছন্দ ও দৃষ্টিভঙ্গি, ইংরেজি ও হিন্দি গণমাধ্যমগুলোর নেতিবাচক তৎপরতার ঝড়, নতুন ক্ষমতাসনীদের ইসলামবিরোধী প্রচারণার ফলে, হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী আন্দোলন আর চরমপন্থা ও সংঘাত (Violence)-প্রবণতার ব্যাপারে কংগ্রেসের পুরনো নীতি এবং গান্ধীজির অহিংস নীতির (Non-Violence) প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকা প্রয়োজন বিবেচনা করেনি। এ ইস্যুতে তিনি ঔদাসীন্য ও ঢিমেতালে নীতি অবলম্বন করেছেন। হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ের আন্দোলনগুলো বিশেষত, বিশ্ব হিন্দুপরিষদ (হিন্দুত্ববাদী বৈশ্বিক সংগঠন), মহারাষ্ট্রের শিবসেনা ও আরএসএসকে স্ব স্ব তৎপরতা চালানোর অবাধ সুযোগ করে দিয়েছেন।

গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক মসজিদগুলোকে মন্দিরে রূপান্তরের দাবি

৭ ও ৮ এপ্রিল ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এক গোপন সভা অনুষ্ঠিত হয়, এতে গোটা দেশের চরমপন্থী হিন্দু নেতৃবর্গ অংশ গ্রহণ করেন। এই সভায় মুসলমানদের জাতিগতভাবে নির্মূলের নানান প্রস্তাব পেশ করা হয়,

যাতে ভারতের কোথাও যেন মুসলমান নাম ধারণ করে এমন কোনো সংগঠনের অস্তিত্ব না থাকে। সেই সাথে বেনারসের 'জ্ঞানবাণী' মসজিদ, মথুরার 'ঈদগাহ' ও অযোধ্যার 'বাবরী মসজিদ' (যার ব্যাপারে সাধারণ হিন্দু নাগরিকদের বোঝানো হয়েছে যে, এটি রামের জন্মভূমি ছিল[১] বাবর এটি ভেঙে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেছেন।)-কে মুক্ত করে প্রথমটিকে বিশ্বনাথ মন্দির, দ্বিতীয়টি কৃষ্ণের জন্মভূমি, তৃতীয়টিকে রামের জন্মভূমিতে রূপান্তরের দাবি উত্থাপন করা হয়। ভারতের ইংরেজি ও হিন্দি ভাষার প্রায় সব ক'টি সংবাদমাধ্যম পূর্ণ উদ্যমে, বিপুল উদ্দীপনায় এ দাবির সত্যতা প্রতিষ্ঠা উঠে-পড়ে লেগেছে। এটি একটি বড় ধরনের দুর্যোগের পূর্বাভাস ছিল, যা ঈশাণ কোণে ঘণীভূত ও উচ্ছ্বসিত হচ্ছিল এবং ক্রমেই পুরো দেশে ছেয়ে যাবার পথে অগ্রসর হচ্ছিল। এরূপ অস্থিতিশীল পরিবেশে কেবল জাতীয়, শিক্ষাবিষয়ক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মতৎপরতাই যে দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছিল তা নয় বরং একটি জাতির তার স্বকীয় অস্তিত্ব টিকে রাখতে পারাই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠে।

এই গ্রন্থের নগণ্য লেখককে আল্লাহ তা'য়ালা তার সেই বিশেষ পরিবেশের বরকতে– যাতে তাঁর মানসগঠন, জ্ঞানগত বেড়ে ওঠা ও কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা, ইতিহাস অধ্যয়নের অনুকুল সুযোগ ঘটেছে– এতটুকু মাত্রাজ্ঞান (Common Sense) ও বাস্তবাদিতা দান করেছেন তাতে আমার সবটুকু শিক্ষানুরাগ, সাহিত্য-রুচি, অধ্যয়ন, অভিনিবেশ, দেশ-বিদেশে দাওয়াতি

---

১. এই রটানো বুলি ও প্রচারণার জবাবে 'মজলিসে তাহকীকাত ও নাশরিয়াতে ইসলাম', 'দারুল মুসান্নিফীন আজমগড়'সহ বহু মুসলিম ও হিন্দু শিক্ষিত ব্যক্তি, ইতিহাসবিদ ও সত্যনিষ্ঠ লেখকদের লেখনীতে একাধিক প্রবন্ধ, প্রামাণ্য গ্রন্থ ও পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে, যাতে প্রমাণিত হয়েছে এর দাবির কোনো ঐতিহাসিক সত্যতা নেই যে, বাবর এখানে কোনো মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। এমনকি এখানে রামের জন্মভূমি হবারও কোনো ইতিহাসসিদ্ধ দলিল-প্রমাণ মেলে না। আর যদি আছে বলে ধরেও নেয়া হয় তবে তা মসজিদের বাইরে এবং দূরত্বে অবস্থিত। এ প্রসঙ্গে দারুল মুসান্নিফীন সাইয়িদ সাবাহুদ্দিন আবদুর রহমান (এম.এ) এর লেখা গবেষণামূলক লেখা 'বাবরী মসজিদ তারিখি পছ মনযর আওর পেশ নজর কি রুশনী মে' বাবরি মসজিদের পশ্চাদপট ও বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনার আলোকে বিশেষভাবে পাঠ করা দরকার। খোদ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় হিন্দু শিক্ষাবিদ এ বিষয়ে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে সত্য ও বাস্তবতা তুলে ধরেছেন, যাদের মধ্যে ড. আর.এল শুকলা ও চিত্তানন্দ দাশ এর নাম প্রণিধানযোগ্য।

তৎপরতা, মধ্যপ্রাচ্য ও আরবদেশসমূহের পরিস্থিতি, সমস্যাবলির সাথে গভীর আগ্রহ ও সম্পৃক্ততার আলোকে এটি হৃদয়ঙ্গম হয়েছে যে, যদি ভারতে এই হিন্দুত্ববাদী পুনর্জাগরণ, সহিংসতা সর্বোপরি স্বজাতির জাতীয় সমস্যাবলি ও বিপদাপদের ইস্যুগুলো যদি পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে– আমার আশঙ্কা মিথ্যে প্রমাণিত হোক– এদেশ দ্বিতীয় স্পেন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে; দীর্ঘকাল থেকে হিন্দু চরমপন্থীরা যেমনটি স্বপ্ন দেখে আসছে।[১]

এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর পদক্ষেপ ছিল, এ বিষয়ে একাধারে দেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি (প্রধানমন্ত্রী) হবার পাশাপাশি ক্ষমতাসীন ও দেশের স্বাধীনতায় নেতৃত্ব দানকারী দল কংগ্রেসেরও কর্ণধার ছিলেন, তাকে বিষয়টি অবগত করা। তাই নিজেদের জাতীয় ঐতিহ্য, উত্থান-পতন, সঙ্কট-সম্ভাবনা, উৎকর্ষ-অপকর্ষ ও স্বকীয়তার (প্রবাদে আছে– সবার আগে নিজের মূল্যায়ন কর) বিষয়টি সামনে রেখে ১৯৮৪ সালের অক্টোবরে আমি মিসেস ইন্দিরাগান্ধীর নামে এক দীর্ঘ পত্র লিখি এবং পত্রটি বিশ্বস্ত মাধ্যমে পৌঁছানো চেষ্টা করি। কিন্তু এটি নিয়তির বিষয় ছিল যে, এ পত্র তার হাতে পৌঁছানোর আগে (এসব ঘটনাবলির প্রেক্ষাপট সেই ট্রাজেডির কার্যকারণরূপে হাজির হয়ে যায়– যার আশঙ্কা আমি ব্যক্ত করেছি এবং এর বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন নেই) ৩১ অক্টোবর সেই ভয়ানক ঘটনাটি সংঘটিত হয়, যা সকলেরই জানা আছে।

এই চিঠির সুফল ও গুরুত্ব তার মৃত্যুর পরও বহাল আছে এবং আগের চাইতে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাতে কেবল এই পুনর্জাগরণের ঝুঁকি সম্পর্কেই সতর্ক করা হয়নি, যা একটি কালবৈশাখী হিসেবে উত্থিত হয়েছিল এবং সে সকল চরম অনৈতিক কর্মকাণ্ড ও দুর্নীতির ভয়াবহতা সম্পর্কেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যা দেশকে ঘুণপোকার মতো ভেতর থেকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। সে চিঠি কেবল রাষ্ট্রের কর্ণধার, শীর্ষপর্যায়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ, প্রশাসনিক ও দেশের চিন্তাশীল শিক্ষিত শ্রেণীর জন্যই পাঠ্য নয় বরং খোদ মুসলিম সংগঠনগুলোর নেতৃবর্গ ও মুসলমান শিক্ষিত আর রাজনীতিক মহলেরও অভিনিবেশসহ পাঠের দাবি রাখে এবং স্বয়ং তাদেরও রাষ্ট্রের

---

১. কোনো কোনো তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তি আমাকে বলেছেন, দেশভাগের সময় বহু প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে ইংরেজিতে বিপুলসংখ্যক এমন বইপত্র প্রকাশ করা হয়েছে, যা স্পেন ও সেদেশ থেকে মুসলমানদের বিতাড়নের বিষয়ে লেখা। এখনও সেই ধারাবাহিকতা চলমান।

শাসকশ্রেণী ও প্রকৃত শুভার্থীদের সামনে নিজেদের চিন্তাসূত্রকে এই ধারায় (Approch) উপস্থাপন করা উচিত।

পত্রটি এখানে তুলে ধরা হলো :

মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর নামে ঐতিহাসিক পত্র

ইন্দিরা গান্ধীজি!

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

সালাম ও আদাব গ্রহণ করুন।

লিখিতভাবে নিজের আবেদনগুলো পেশ করার সুযোগ দেয়ার কারণে আমি আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। দেশ যখন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও চূড়ান্ত সন্ধিস্থলে উপনীত হতে চলেছে, তখন আমাদের মাতৃভূমিকে অত্যন্ত সাহস, প্রজ্ঞা, মেধা ও নিষ্ঠার সাথে এমন এক অভিমুখে এগিয়ে নেয়া দরকার যাতে দেশবাসীকে অপ্রয়োজনীয় সমস্যা, পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি ও বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করা যায় এবং একই সাথে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি থাকে। আমি আপনার মূল্যবান সময় ভারতের বৃহৎ সংখ্যালঘু (মুসলমান) জনগোষ্ঠীর কোনো বিচ্ছিন্ন সমস্যা, মামুলি অভিযোগ ও খুঁটিনাটি দাবি-দাওয়ার আলোচনায় নষ্ট করবো না, যা বহুবার আপনার ও আপনার সম্মানিত সরকারের বরাবরে উপস্থাপিত হয়েছে আর আপনি সেসব বিষয়ে অবিদিত নন। আমি আজকের পত্রে ভারতের জাতীয় স্বার্থ ও মৌলিক নীতির আলোকেই কিছু জরুরি বিষয় উপস্থাপন করছি।

প্রথম বিষয়টি হলো, আমাদের এদেশের অস্তিত্ব, উন্নতি, মর্যাদা ও সংহতি এবং সমকালীন বিশ্ব ও তার ভয়ানক, জটিল পরিস্থিতিতে নিজেদের উপযুক্ত ভূমিকা পালনের জন্য সঠিক, নিরাপদ, সম্মানজনক ও ঝুঁকিমুক্ত পথ হলো যা স্বাধীনতা আন্দোলনের নিষ্ঠাবান, শিক্ষিত, মর্যাদাবান ও বলিষ্ঠ মুখপাত্র যথা– পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু (আপনার পিতা), মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এবং তাঁদের

সতীর্থদের অনুসৃত পথ এবং এটাই প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা, সত্যিকার গণতন্ত্র এবং হিন্দু-মুসলিম সংহতির পথ, হোক সে পথ যতই দীর্ঘ ও বন্ধুর। এর বাইরে যে পথই অবলম্বন করা হবে, তা সাময়িকভাবে সফল হলেও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে যে ত্যাগ স্বীকার করা হয়েছে তাতে পানি ঢেলে দেয়ার শামিল। সর্বোপরি, এর মধ্য দিয়ে দেশকে ক্রমেই ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়ার নামান্তর– যা ভবিষ্যতে সমাধানের কোনো পথ খোলা রাখবে না।

প্রথম জিনিস– যা আমি ধর্ম, মানবেতিহাস, দর্শন ও নীতিশাস্ত্রের একজন ছাত্র হিসেবে বলতে চাই এবং আমার আশঙ্কা এখানে রাজনৈতিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত কেউ হলে এভাবে বলবেন না– এদেশের জন্য সবচেয়ে বড় দুটি হুমকি রয়েছে যার দিকে আপনার প্রথমেই দৃষ্টি দেয়া দরকার। যথাক্রমে– প্রথমত, জুলুম নিপীড়নপ্রবণতা, নাগরিক মর্যাদা আর মানবাধিকার লঙ্ঘন (হোক সে ব্যক্তি যে দল-গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কযুক্ত), যার প্রকাশ ঘটে জাতিগত দাঙ্গা, সামান্য অর্থের লোভে নির্দ্বিধায় মানুষ হত্যা ও সহিংসতামূলক অপরাধে। আর দ্বিতীয়ত এবং সর্বশেষ কিন্তু সবচেয়ে লজ্জাকর বাস্তবতা, প্রত্যাশিত যৌতুক না দিতে পারার কারণে স্ত্রীকে পুড়িয়ে, বিষপ্রয়োগে বা অন্যকোনোভাবে হত্যা ও নির্যাতন করা ইত্যাদি।

ধর্মে বিশ্বাসী মানুষমাত্রেরই এটি অত্যন্ত সাধারণ ও সহজবোধ্য বিষয় যে, জগতের স্রষ্টা যিনি মানুষকে তার মায়ের চাইতেও বেশি ভালোবাসেন– তিনি এসব আচরণে কখনও সন্তুষ্ট হতে পারেন না এবং এই আচরণ বেশিদিন বরদাশত করবেন না। সমাজে এরূপ অবক্ষয় চলতে থাকলে হাজারো সম্ভাবনা ও চেষ্টা সত্ত্বেও দেশ এগিয়ে যেতে পারে না, সমাজও বেশিদিন টিকতে পারে না। কিন্তু যারা ধর্মে বিশ্বাসী নন, তারাও এর ঐতিহাসিক পরিণতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল যে, যুগে যুগে বহু দোর্দণ্ড প্রতাপশালী

সম্রাট, লৌহমানব শাসক এবং পৃথিবী দাপিয়ে বেড়ানো বহু সভ্যতা– আজও ইতিহাসের পাতায় যার গৌরবগাঁথা জ্বলজ্বল করছে– এর চেয়ে কম জুলুম ও রক্তপাতের দায়ে তাদের পতন ঘটেছে, পরিণত হয়েছে পুরনো ইতিহাসের অংশে। এই পরিস্থিতির দিকে দ্রুত দৃষ্টিপাত জরুরি হয়ে পড়েছে বলে আমি মনে করি। রাজনৈতিক সমস্যা ও নির্বাচনী কর্মসূচির চেয়েও উক্ত সমস্যা মোকাবেলায় বলিষ্ঠ তৎপরতা জরুরি হয়ে পড়েছে। এ জন্য প্রয়োজনে গ্রামের পর গ্রাম চষে বেড়াতে হবে। কঠোর আইন, দৃষ্টান্তমূলক সাজা, গণমাধ্যমের যথাযথ ব্যবহার ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক। নইলে 'আমও যাবে, ছালাও যাবে'।

এই ধারাবাহিকতার দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী (Hindu Revivalism) আন্দোলন। হিন্দু পরিষদ, শিবসেনা, আর.এস.এস.-এর সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, চরমপন্থার প্রতি ন্যূনতম শৈথিল্য ও নমনীয়তার মাধ্যমে সাময়িক কিছু সুবিধা লাভ আর মাথাব্যথাকে এড়ানো গেলেও দীর্ঘ মেয়াদে এটি পুরো দেশকে এক অন্ত হীন ও ভূমিধ্বস বিপর্যয়ের অন্ধকার সুরঙ্গের অনিশ্চয়তার উপরই ছেড়ে দেয়ার শামিল– যা একসময় পুরো দেশকে নিয়েই তলিয়ে যাবে। গান্ধীজি এই বাস্তবতাকে ভালোমতো উপলব্ধি করতেন যে, সাম্প্রদায়িক বৈরিতা, চরমপন্থা ও সহিংসতা প্রথমেই দেশের প্রধান দুই জনগোষ্ঠী (হিন্দু ও মুসলমান)-এর মধ্যে বিষবাষ্প ছড়াবে। এরপর পর্যায়ক্রমে এই সাম্প্রদায়িক বিরোধের ফলে পরস্পরের বিরুদ্ধে গোষ্ঠী, ভাষা, অঞ্চলভিত্তিক চরম বিদ্বেষে রূপ নেবে। পরবর্তী ধাপে এই আগুন (যখন জ্বালানোর কোনো ইন্ধন খুঁজে পাবে না, তখন নিজেই নিজেকে গ্রাস করবে) দেশ এবং নাগরিকদের গিলে খাবে এবং চূড়ান্ত বিচারে এ দেশ ছাড়খার হয়ে যাবে।

তাই এ সহিংস পুনর্জাগরণ (Aggressive Revivalism), চরমপন্থা, এক তরফা কেবল একটি সম্প্রদায়ের কাছে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রত্যাশা ও একপেশে সমালোচনা, নিজেদের আমূল বদলে দেয়া, জাতীয়, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য পর্যন্ত পরিত্যাগের অব্যাহত দাবি হাজার বছরের সুপ্ত কিংবা মৃত ইতিহাসকে পুনর্বার জাগ্রত ও জীবন্ত করা এবং হাজার বছর আগে ঘটেযাওয়া পরিবর্তন অস্বীকার করা (ভালো হোক কিংবা মন্দ)– যা এদেশের উদার ও আত্মমর্যাদাশীল নাগরিকেরা গ্রহণ করে নিয়েছে, আবারো সেই আগের জায়গা থেকে তাদের পুনঃযাত্রার সূচনা করতে বলা, হারিয়ে যাওয়া অতীতের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার চেষ্টা দেশকে এমনসব নিত্য-নতুন সমস্যায় জর্জরিত করবে, যা মোকাবেলার অবকাশ ও প্রয়োজন কোনোটাই দেশের নেই। এভাবে সরকার, প্রশাসন ও চিন্তাশীল মহলের শক্তির অপচয় ঘটবে। দেশগড়া, দেশে স্থিতিশীলতা ও জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য যেহেতু ঐক্যবদ্ধ শক্তির প্রয়োজন রয়েছে, সেহেতু এই সমস্যাকে প্রাথমিক এবং মামুলি থাকা পর্যায়েই চুকিয়ে ফেলা দরকার যাতে তা আয়ত্বের বাইরে না চলে যায়। দেশের এই সাধারণ এবং মৌলিক কল্যাণের স্বার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে কারও অসন্তুষ্টি, ভোটের ফলাফলে প্রভাব পড়া এবং প্রশাসনের অনীহা প্রভৃতি বিষয় আমলে নেয়া সমীচীন হবে না। কেননা, এসব বিষয়ের ওপর দেশ ও দেশের কল্যাণ অগ্রাধিকারের দাবি রাখে। আর এটা কেবল নীতি-নৈতিকতা লালনের দাবিই নয় বরং দূরদর্শিতা, বাস্তবাদিতা ও গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দাবিও বটে। আপনার অসাধারণ প্রতিভা, ঘটনার গভীরতা অনুধাবন, ইঙ্গিতেই পুরো প্রেক্ষাপটের আদ্যোপান্ত বুঝে নেয়ার আল্লাহপ্রদত্ত যোগ্যতার কারণে এর বেশি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অপ্রয়োজনীয় মনে করছি।

তৃতীয় বিষয় যেদিকে দ্রুত নজর দেয়া দরকার এবং যা বরাবরই অস্থিরতার অনুঘটক হতে পারে, তা হলো– নৈতিক অবক্ষয়, প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা ও (Corruption) দুর্নীতি। এটি এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে– যার দৃষ্টান্ত অন্তত এদেশে আমার দৃষ্টিতে ইতোপুর্বে কখনো ছিল না। এ ক্ষেত্রে আপনি বাস্তবতা অনুধাবন করার জন্যে সরকারি রিপোর্ট ও ব্যবস্থাপনাগত বহিরাবরণের চাকচিক্যের দিকে তাকিয়ে লাভ নেই। সাধারণ নাগরিক, মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং তাদের কাছে জিজ্ঞেস করুন– যারা আদালত, সরকারি অফিস, রেলওয়ে, বিমান সার্ভিস, পুলিশ, থানা, টেলিযোগাযোগ, হাসপাতাল, ঠিকাদারি প্রভৃতি জায়গায় দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বহু বিষয়ে প্রায়ই যাতায়াত করেন। ঘুষ ছাড়া মামুলি কোনো কাজও উদ্ধার হয় না। টাকার বিনিময়ে হয় না এমন কোনো কাজ নেই। টাকা ছুড়লে যেকোনো অপরাধীকে ছাড়িয়ে আনা যায়।

ঔষধ ও খাদ্যে ভেজাল তো চলছেই। চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তি দিনদিন দুর্লভ ও কঠিন হয়ে উঠছে। রোগীদের জন্য বরাদ্দকৃত সুবিধা অনর্থক পথেই যাচ্ছে। নিষ্ঠুরতা সীমা অতিক্রম করেছে। রেলওয়ে ও বিমানে রমরমা দুর্নীতির ফলে সরকারকে দৈনিক লাখ-লাখ টাকার লোকসান গুণতে হচ্ছে। উল্লিখিত সব পর্যায়ে এহেন অবস্থার মূলে অর্থের লালসার চেয়েও যা বেশি দায়ী, তা হলো– আল্লাহভীতি না থাকা, পরকালীন জবাবদিহিতার ব্যাপারে বেপরোয়া মনোভাব, দেশপ্রেমিকের অভাব, মানবিতাবোধ হ্রাস, দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং স্বদেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়ার মানসিকতা বিলুপ্তি। এমত প্রেক্ষাপটে দেশ প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ, রাজনৈতিক অগ্রগতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ও বৈদেশিক সম্পর্কে প্রভূত উন্নতি লাভ করলেও প্রকৃত বিচারে দ্রুতই অধঃপতনের দিকে ধাবিত হচ্ছে, মানুষের জীবনযাত্রা থমকে যাবার উপক্রম হয়েছে। সবচেয়ে লজ্জা ও ব্যর্থতার ব্যাপার হলো, এরূপ ভোগান্তিতে মানুষ বিরক্ত হয়ে ঔপনিবেশিক বৃটিশ শাসনে ফিরে যাবার বাসনা পর্যন্ত ব্যক্ত করতে শুরু করেছে, যখন প্রশাসনে ছিল চৌকস কর্মকর্তা, রেল তার নির্ধারিত সময়ে

প্লাটফরম থেকে ছেড়ে যেতো এবং নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছেও যেতো গন্তব্যে। হাসপাতালগুলো সেবা, স্বস্তি ও নির্ভরতার জায়গা ছিল, তরুণসমাজ তাদের পরিশ্রম ও যোগ্যতার সদ্ব্যবহার করতো, চাকুরি ও পদোন্নতি ছিল যোগ্যতা ও উপযুক্ততার ভিত্তিতে। বর্তমান এসব কেবলই স্বপ্ন ও কল্পনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপরোক্ত বিষয় তিনটি অবশ্যই দ্রুত বিবেচনার দাবি রাখে। এসবের সমাধানের উপর টেকসই রাষ্ট্রকাঠামো দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। এ প্রসঙ্গে অন্তত এটুকু বলতে চাচ্ছি, উপর্যুক্ত সমস্যার নেপথ্যে রয়েছে নির্বাচন পদ্ধতি, সর্বাবস্থায় ভোটারদের মন-যোগানো, নির্বাচনী এলাকার নেতৃত্বস্থানীয়দের সব কথা রক্ষা করা, সংসদ সদস্যদের হিতাহিত যেকোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার মতো বেশি এখতিয়ার থাকা। সংসদ সদস্যরা এমন এক সোনার ডিমপাড়া হাঁস অথবা প্রাচীনকালের কাল্পনিক 'হুমা' পাখি– এটি যার মাথায় একবার বসে তিনি রাজত্ব পেয়ে যান।

উপসংহারে একজন বিশ্বাসী মানুষ, বিশ্ব-রাজনীতির প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসের একজন ছাত্র এবং ইতিহাস বিষয়ের লেখক হিসেবে বলতে চাই যে, ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা একথা প্রমাণ করে– সবচেয়ে বড় ও সার্থক রাজনীতি হলো 'নিষ্ঠা'। শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠবান লোকেরাই জয়ী হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি হলো যে শত্রুকে বন্ধুতে এবং বন্ধুকে অন্তঃপ্রাণ আত্মোৎসর্গকারীতে পরিণত করতে পারে, চূড়ান্ত পর্যায়ে অন্যকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতে পারে। এটাই সেই মূল্যবোধ যা মায়ের অতুল মমতায়, পয়গম্বর ও নিঃস্বার্থ সাধক-দরবেশদের দয়ার্দ্রতা, দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গকারীদের দেশপ্রেম ও নিজের স্বার্থের উপর অপরের কল্যাণকে প্রাধান্য দেয়ার উন্নত মানসিকতাসম্পন্ন মহান ব্যক্তিদের দূরদৃষ্টির মধ্যদিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এখনো বহুজাতি-গোষ্ঠী অধ্যুষিত বিশাল ভারতকে নতুন নতুন সমস্যাদি থেকে কেবল এ মূল্যবোধ ও 'নিষ্ঠা' রক্ষা করতে পারে। আপনার কাছে এটাই আমাদের প্রত্যাশা, এটাই সময়ের অগ্রাধিকার।

দীর্ঘ চিঠির জন্য ক্ষমা করবেন। মনের ব্যথা ও পরিস্থিতির ভয়াবহতা পত্রকে দীর্ঘায়িত করার অনুঘটক হয়ে উঠেছে।

আপনার আস্থাভাজন
আবুল হাসান আলী
লক্ষ্ণৌ, ২৪ অক্টোবর, ১৯৮৪ ঈসায়ী

মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর হত্যা ও প্রতিবাদ

৩১ অক্টোবর ১৯৮৪ ঈসায়ী। আমি যথারীতি আমার অধ্যয়নকক্ষে গ্রন্থ অনুলিপি করানো কাজে ব্যস্ত ছিলাম। আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর তত্ত্বাবধায়ক ও একান্ত সহকারী স্নেহভাজন আবদুর রহমান ভাট নদভী একটি টেলিফোনের উদ্ধৃতি দিয়ে বললো যে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর উপর নৃশংস হামলা হয়েছে এবং এ হামলা থেকে তিনি বাঁচতে পারেননি। অপ্রত্যাশিত এ আকস্মিক হামলার খবর আমার মনে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সত্যি বলতে কি, আমার পুরো অস্তিত্ব কেঁপে উঠে। গান্ধীজি হত্যাকাণ্ডের মতোই খবরটি শোনার পর আমার অন্তরে একটি ভাবনা নাড়া দিয়ে উঠলো যে, এটা যেন কোনো মুসলমানের অপরিণামদর্শী পাগলামী না হয়, যার ফলে পুরো ভারতজুড়ে মুসলিম নিধনযজ্ঞ শুরু হয়ে যাবে, যা খোদ সরকারেরও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। অল্পক্ষণ পরেই আবদুর রহমান ভাট জানালো যে, এটি নিরাপত্তা বাহিনীর কয়েকজন শিখ সৈন্যের কাজ। তথ্যটি জানার পর আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি এবং আল্লাহর শোকর আদায় করি।

এ মর্মান্তিক ঘটনার পর শিখদের বিরুদ্ধে ভারতজুড়ে শুরু হলো এক ক্রুদ্ধ উন্মত্ততাতাড়িত দমনাভিযান, যা বিচক্ষণতা, ন্যায়-ইনসাফ ও ভারসাম্যের সকল সীমা অতিক্রম করে। আল্লাহর কুদরতি রহস্য! এই সহিংস দমনাভিযান সবচেয়ে বেশি পরিচালিত হয়েছে দিল্লীতে। প্রায় পাঁচশ' লোক এত প্রাণ হারায়। পাশবিক কায়দায় প্রতিশোধ, নির্মম সহিংসতা ও লোমহর্ষক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির ধরন ছিল সংখ্যার চাইতে জঘন্য। বহু জায়গায় পেট্রোল ঢেলে শিখদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে, কোনো ব্যক্তিকে স্কুল বা অন্য কোনো দালানের স্তম্ভের সঙ্গে শরীরে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে, তাদের দোকান, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি লুট করা হয়েছে। জনশ্রুতি রয়েছে, অধিকাংশ জায়গায় পুলিশের মদদ, কমপক্ষে প্রশ্রয় ও উদাসীনতা ছিল। কিছু

কিছু জায়গায় কতিপয় মুসলিম সাধারণত নিজের নৈতিক শিক্ষা ও খোদাভীতির অভাব আর সম্পদের লোভে এসব অপকর্মে জড়িয়েছে, অংশ নিয়েছে লুটতরাজেও।

বিষয়টি জানার পর এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়াকে প্রথমেই আমি নিজের জন্য অত্যাবশ্যক কর্তব্য বিবেচনা করেছি। কমপক্ষে মুসলমানদেরকে এই কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা চালাবো। এই লুটের মাল আমাদের বাড়ি দায়েরায়ে শাহ্ আলামুল্লাহ (তাকিয়া কেলাঁ)-এর পাশের গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আমরা সভা-সমিতিতে বলতে শুরু করি, যেসব ঘরে এই লুণ্ঠিত সম্পদ ঢুকবে, সে ঘরে আল্লাহর পক্ষ থেকে রোগ-বালাই ও আসমানী আপদ আসবে। আমার উক্তিটি শহরেও পৌঁছে যায়। এর এতো বেশি প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে যে, অনেকে এই উক্তিকে তাৎপর্যপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে বিবেচনা করে এবং অশুভ পরিণতির কথা ভেবে অনেক মুসলমান বহু সম্পদ ফেরতও পাঠায়। অনেকেই এই সম্পদ গ্রহণ থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখে।

আমার কথাটি শিখদের কাছে পৌঁছে যাওয়ায় তারা কয়েকদিন কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে আর কেউ দলবদ্ধভাবে আমার কাছে যাতায়াত করেছে। এমনকি অনেকে আমার পা ছুঁয়ে এর জন্য কৃতজ্ঞতা আদায় করে গেছে। এলাকার বাইরে থেকে আসা শিখেরা যখন জেনেছে যে, 'এই লোক একজন মৌলভী সাহেব, যিনি কাজটি (লুটতরাজ ও শিখদের ওপর নির্বিচার নিপীড়ন) ঘৃণা করেছেন, তখন তারাও আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসে আমার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। আমি বলেছি, এটা আমার নৈতিক এবং ধর্মীয় দায়িত্ব। বাস্তবেও তাই যে, ইসলাম ও কুরআন তো মুসলমানদের এ শিক্ষাই দিয়েছে এবং ঘোষণা করেছে যে,

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

"আর কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতা তোমাদেরকে যেন এ বিষয়ে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা (তাদের সাথে) ন্যায়সংগত আচরণই করবে না! বরং তোমরা সর্বাবস্থায় ইনসাফ করতে থাকো– এটি পরহেযগারীসুলভ কাজ।"[১]

ঐতিহাসিক বাস্তবতায় আমি এমন এক গোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত, যার একজন কীর্তিমান পুরুষ (হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ) উনিশ শতকের

১. সূরা আল মায়েদা : ৮

গোড়ার দিকে মহারাষ্ট্রের রাজা রঞ্জিত সিংহ কর্তৃক পাঞ্জাব ও সরহদ প্রদেশে মুসলমানদের উপর যে অত্যাচার চালানো হয়েছিল, পাঞ্জাবের (প্রাদেশিক) শিখ সরকার তাদের বিরুদ্ধে গৃহীত এ পদক্ষেপে যে অংশ নিয়েছিল, তার ফলে ৬ মে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ২৪ জিলক্বদ ১২৪৬ হিজরিতে ৩০০ শত জন সাথী-সঙ্গীসহ বালাকোটের ময়দানে শহীদ হয়েছেন (যা বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত)। এই শহীদি কাফেলায় আমার ছোট্ট গোত্রের বেশ কিছু লোকও রয়েছেন– যাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। এসব কিছু সত্ত্বেও আমি এ সম্প্রদায়ের লোকদের নির্বিচারে ও গণহারে হত্যাযজ্ঞ, সহিংসতা এবং তাদের সম্পদ লুটপাটকে সমর্থন করার কোনো নৈতিক বৈধতা দেখি না। তাদের 'অপরাধ' শুধু এটাই যে, তারা এমন এক সম্প্রদায়ের সদস্য যাদের একটি অংশ সেই অগ্রহণযোগ্য কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল। আমার মতে, এরূপ প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের ভূমিকা এমন হওয়া উচিত যে, তারা নৈতিকতা, সত্যবাদিতা ও ইনসাফ থেকে একচুলও সরবে না।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ

'হে ইমানদারগণ আল্লাহর ওয়াস্তে সত্য সাক্ষ্য দেবার ক্ষেত্রে পুরোপুরি যত্নবান হও এবং ন্যায়নীতির ওপর অটল থাকো।'[১]

পবিত্র হেজাযের সফর, একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা ও এক অনবদ্য অভ্যর্থনা

১৪০৫ হিজরির রবিউলসানি মাসে রাবেতা আলমে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কমিটির সভার তারিখ ধার্য ছিল। আমি রবিউস্‌সানির শুরু ও ডিসেম্বরে শেষের (১৪০৫/১৯৮৪) দিকেই মক্কার উদ্দেশে রওনা হই। এ সফরে আমার স্নেহাস্পদ মুহাম্মদ ওয়াজেহ নদভীর ছেলে সাইয়িদ জাফর মাসউদ নদভীকে নির্বাচন করি। এ সফরের আগে তাঁর আরব সফরের সুযোগ হয়নি। ইতোমধ্যে আরবি বলা ও লেখার যোগ্যতা তাঁর সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। তাঁকে মনোনীত করার পেছনে যে প্রত্যাশা কাজ করেছে, তা ছিল– একদিকে আমি তাঁর সহযোগিতা পাবো আর সেও এ সুবাদে উমরাহ, যিয়ারত ও শীর্ষস্থানীয় আলিম ও বড় ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং সেই সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে উপস্থিত থাকার সুযোগ পাবে। আমার প্রিয় ভাই সাইয়িদ হাসান

১. আল মায়েদা : ৮

আসকারী তারেক (মদিনার টেলিফোন ইঞ্জিনিয়ার) আমার আরাম ও স্বচ্ছন্দের কথা সব সময়ই বিশেষভাবে খেয়াল রাখেন। তিনি ছুটিতে ভারতে এসেছিলেন। তিনি ফেরার দিন-তারিখ এমনভাবে সাজিয়ে নিয়েছিলেন যাতে এই সফরে আমার সঙ্গে থাকতে পারেন এবং জাফরকে (যে প্রথমবারের মতো আরবদেশ সফর করছে) প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে পারে।

রাবেতার সম্মেলন যথারীতি কয়েকদিন ধরে চলছিল। সম্মেলনের কাজ শেষে মক্কা ও মদিনায় কয়েকদিন অবস্থানের সুযোগ পাওয়া যায়। মদিনার একটি সাহিত্য সংস্থা نادي المدينة المنورة পক্ষ থেকে গত বছর সাহিত্য সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে আলোচনার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু গত বছর সে দাবি পূরণ করতে পারিনি। তাদের কিছু সময় দেবার জন্যে এবার বেশ জোরালো দাবি এসেছে। তারাই বিষয় নির্ধারণ করেছে دورالإقبال في توجيه الأدب والشعر 'কবিতা ও সাহিত্যে ইকবালের ঐতিহাসিক ভূমিকা'। ২৪ রবিউস সানি, ১৬ জানুয়ারি বাদ মাগরিব মালিক আবদুল আজিজ লাব্রেরিতে সেমিনারের তারিখ ঠিক হলো। তখন আমার খেয়াল ছিল না যে, জায়গাটি মসজিদে নববী থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরত্বে অবস্থিত। যখন থেকে আমার মক্কা-মদিনা যিয়ারতের সুযোগ হয়েছে (কোনো কঠিন অপরাগতা না থাকলে), আমি সচরাসচর মাগরিব ও এশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়টি মসজিদে নববীতে অতিবাহিত করি। মক্কায় হলে এ সময়টি হারাম শরীফে কাটাই। কোনো কোনো সময় হয়তো এ ধরনের সম্মেলনের সময় আরও পরে হতো।[১]

তবে এখন এসব সাত-পাঁচ ভেবে লাভ নেই। অনুষ্ঠানের সময়ক্ষণ সবকিছু ঠিক হয়ে ঘোষণাও হয়ে গেছে। নিজের ভেতর ভারী অস্বস্তিবোধ হচ্ছিল যে, মদিনা শরীফে নফল নামায তিলাওয়াত ইত্যাদির পরিবর্তে সময়টি একটি সাহিত্য সেমিনারে আলোচনা করে কাটিয়ে দিতে হবে (যদিও এটি নিছক সাহিত্য আসর ছিল না)। হারামাইনে মাগরিব ও এশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়টি সংক্ষিপ্ততম (দেড় ঘন্টা) সময়ই হয়ে থাকে। বক্তব্য চলাকালে এশার আযান হয়ে গেলে একদিকে এশার জামাআতে অংশগ্রহণ না করা কঠিন, অন্যদিকে আলোচনা অসম্পূর্ণ রাখাও অস্বস্তিকর। কিন্তু এ সমস্যা এখন সমাধানই বা কী? আল্লাহর ওপর ভরসা করে অনুষ্ঠানের দাওয়াত কবুল করে নিলাম।

---

১. মদিনায়ে তায়্যিবায় এর আগে এ ধরনের অনুষ্ঠান সাধারণত এশার পর তায়্যিবা সানিয়াতে হতো, বাদ মাগরিব হলে মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে হতো যা মসজিদে নববী থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত।

তবে দেখা গেল, এদিন সময়ের বরকত, অনুষ্ঠানের সফলতা বড়-বড় ব্যক্তিদের (মসজিদে নববীতে যাদের পাঠদান চলে, তারা এসব বিষয় খুবই সযত্ন সতর্কতায় খেয়াল রাখেন) অংশগ্রহণ, নির্দিষ্ট সময়ে আলোচনা সমাপ্তি, নিশ্চিন্ত-স্থিরতার সঙ্গে মসজিদে নববী শরীফে শুধু এশার নামায নয় নফলসহ পড়ার সুযোগ পেয়ে যাবার এক চমৎকার অভিজ্ঞতা অর্জিত হলো। এটি আমার কাছে পরিষ্কার আল্লাহর সাহায্য বলেই প্রতিভাত হয়েছে। কালামে পাকের তিলাওয়াত, পরিচিতিপর্ব ও স্বাগত বক্তৃতার পর আমি এভাবে আমার আলোচনা শুরু করেছি যে, "আপনাদের মুবারক ও পবিত্র মসজিদে নববীর একেবারে পাশে দাঁড়িয়ে আপনাদের ছাড়া পৃথিবীর অন্য কারো আলোচনা করা করবো এটা আমার জন্য মহান আল্লাহ ও উপস্থিত সুধীবৃন্দের সম্মুখে লজ্জিত হবার মতো ব্যাপার মনে হয়। জনৈক আরব কবিকে সপ্রশংস ধন্যবাদ দিতে চাই, যার কবিতাটি আজকের পরিবেশে খুবই প্রাসঙ্গিক :

وما نزلنا منزلا طله الندى أنيقا وبستانا من النور حاليا

أجدلنا طيب المكان وحسنه منى فتمنينا. فكنت الأمنيا

যখন এমন এক জায়গায় এলাম, যেখানে শিশির সবুজের বুকে প্রাণ জাগায়, যে জায়গাটি নতুন গজানো তৃণগুল্মের পুষ্পকলিতে সেজে ছিল। জায়গাটির অপরূপ সৌন্দর্য আর মনোলোভা দৃশ্যের প্রভাবে আমার প্রাণের কোনে সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাগুলো আড়মোড়া ভাঙছিল। আমার নিজের মনোবাসনা পরিব্যক্ত করলাম কিন্তু স্বয়ং তুমিই ছিলে আমার অভিলাষ ও মনোবাঞ্ছার প্রতিপাদ্য।

এটি সেই জায়গা, যেখানে সর্বশেষ আসমানী পয়গামের স্নিগ্ধ শীতলতা ও নববীর সান্নিধ্যের সুরভী প্রাণজুড়ে ছড়িয়ে দেয় বেহেশতের প্রশান্তি ও সুখানুভূতি। তাই এখানে সেই মহান ব্যক্তিত্বের আলোচনা হওয়া উচিত, যার বরকতময় সত্তার কারণেই পুরো শহরটি চিরকাল অপ্রতিদ্বন্দ্বী মর্যাদার অধিকারী হয়েছে, যার মাধ্যমে মানবতা পেয়েছে নতুন জীবন ও জীবনের প্রকৃত সার্থকতা।

তবে এখানে এমন এক ব্যক্তির আলোচনা শুরু করছি, যার সঙ্গে প্রিয়নবীর (সা.) সম্পর্ক গভীর ও সুনিবিড়। এটাই এখানে (প্রাচীন প্রচলিত পরিভাষায় মসজিদে নববী থেকে যার দূরত্ব এক তীর পরিমাণ মাত্র) সে ব্যক্তির আলোচনাকে বৈধতা দেয়।

আমাদের মহান কবি মুহাম্মদ ইকবাল এর অবস্থা এরূপ ছিল যে, (আমি যার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বলতে পারি এবং মসজিদে নববীর নিকটে সে প্রসঙ্গে সাক্ষ্যও দিতে পারি) রাসূলের আলোচনা এলে তো কথাই নেই, কেবল মদিনার আলোচনা উঠলে তাঁর চোখ অশ্রুতে টলমল করে উঠতো। আমাকে যেহেতু কয়েকটি ফার্সি কবিতা আবৃত্তিরও অনুমতি মিলেছে আর আজকের সভায় ফার্সির সমঝদার কিছু লোক রয়েছে, তাই উদ্ধৃত করছি :

"এই বার্ধক্যে মদিনার পথ ধরেছি, প্রিয়নবীর প্রেমের
করুণা লাভ করার অভিপ্রায়ে সেই মোরগের মতো যে
সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার জন্য পাখা ঝাপটায়।"

এরপর সাহিত্য ও কবিতায় নতুন ধারা সৃষ্টিতে ড. মুহাম্মদ ইকবালের নির্ধারকসুলভ বৈপ্লবিক কর্ম ও অবদানের বিষয়ে আলোকপাত করি। বলেছি "পুরো বিশ্ব না হলেও এতে কমপক্ষে ভারতীয় উপমহাদেশের চিন্তাধারার জগৎ ছাড়াও ভাষা ও আঙ্গিকে ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।" উপস্থিত সকলে অত্যন্ত ধীরস্থিরতার সঙ্গে আমার আলোচনা শুনেছেন এবং নিজেদের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন[১]। এই সেমিনারে মদিনার সহকারী বিচারপতি শায়খ আতিয়্যা সালেমও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও হারামে নববীর অন্যান্য আলিমও ছিলেন। মদিনায় অবস্থানকালীন সময়ে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীলদের আমন্ত্রণে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে আলোচনা করতে হয়েছে। যার বিষয় ছিল 'বিশ্বজুড়ে ঈমানি দুর্ভিক্ষ বনাম জ্ঞানী ও ইমানদারদের দায়িত্ব।"

এ সময় ইথিওপিয়া সুদান ও সোমালিয়ায় দুর্ভিক্ষ চলছিল। প্রসঙ্গটিকে বিপরীত দিক থেকে তুলে ধরে আমি বললাম, "এ দুর্ভিক্ষের চাইতে বর্তমানের ঈমানি দুর্ভিক্ষ আরও বেশি ভয়ানক। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ এমনকি ধনী রাষ্ট্রগুলোও এর শিকারে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এ সম্পর্কে কারও কোনো ভাবনা নেই।"

মক্কায় অবস্থানকালীন না'দী মক্কা আসসাক্বাফীতেও একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করা হয়েছে। এ সফরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, ১৫ রবিউস্ সানি, ১৪০৫ হিজরি, ৬ জানুয়ারি ১৯৮৫ ঈসায়ীতে জেদ্দার একজন সম্মানিত ব্যক্তি ও নেতৃত্বস্থানীয় অধ্যক্ষ শায়খ আবদুল মাকসুদ খাওজাহর পক্ষ থেকে আমাকে একটি অভ্যর্থনা জানানো হয়। এতে জেদ্দা ও মক্কার জ্ঞানী-গুণী,

১. সেমিনারে একাধিক ভারতীয় ও পাকিস্তানি ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন

লেখক, বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের বিরাট এক জমায়েত হয়েছিল। এতো বিপুল সংখ্যক বিদ্বানদের এমন সমাবেশ ইতোপূর্বে ঘটেনি। এদের মধ্যে বিশেষভাবে বিশিষ্ট দাঈ' ও অনুষ্ঠানের আয়োজক শায়খ আবদুল মাকসুদ খাওজাহ, বিদগ্ধ শিক্ষাবিদ আবদুল্লাহ বাগদাদী, (সাবেক প্রধান, কুল্লিয়াতু তাহজীরুল বি'সাত, মক্কা) সাইয়িদ আলী হাসান ফিদআক (সাবেক মেয়র, জেদ্দা) ও সাবেক তথ্যমন্ত্রী শায়খ আবদুল্লাহ্ বিল খায়ের আমাকে বিশেষ মেহমান হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন। বক্তব্যে তারা নিজেদের চেতনা ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। অনুষ্ঠানের আরেকটি বিশিষ্টতা হলো, জেদ্দার 'দারুশ শারক' প্রকাশনীর পক্ষ থেকে প্রকাশিত আমার দুটি গ্রন্থ 'আসসীরাতুন্নাবভিয়্যাহ্' ও 'মুখতারাত মিন আদাবিল আরব' উপস্থিত মেহমানদের মাঝে উপহার হিসেবে বিতরণ করা হয়।

আমি উপলক্ষটিকে (যা আমার দিক থেকে খুবই তাৎপর্যবহ এক মাহেন্দ্রক্ষণ। আমার জন্য এটি জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা ছিল) নিছক একটি সম্মাননা ও অভ্যর্থনা হিসেবে গ্রহণ করে এর জবাবে গৎবাঁধা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার মধ্যেই দায়িত্ব শেষ করাকে সমীচীন ও যথেষ্ট মনে করিনি। আমি অনুভব করলাম, সমাজের নির্বাচিত বিশিষ্টজনদের এ সমাবেশকে –যা হারামের নিকটেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে– বিশেষ কিছু বার্তা দেয়া দরকার।

معمار حرم باز بہ تعمیر جہاں خیز!

'পুরো পৃথিবীর নির্মাণযজ্ঞের চাইতেও হারামের একটি কংকর হতে পারা অধিকতর সৌভাগ্যের!'–এর স্লোগান তোলাই এখানে সংগত। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য একান্ত দরকারি বাক্যগুলো আওড়ানোর পরপরই আমি বললাম– "সুধীবৃন্দ, পৃথিবী ওজন ও পরিমাপের দু'টি নিক্তি আছে। একটি 'আকার-আয়তন' আরেকটি 'মূল্য'। কিন্তু আল্লাহ আকারের চাইতে মূল্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আমি যখনই সূরা আনফালের এই আয়াত :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

(যারা কাফের তারা পরস্পরের উত্তরাধিকারী। যদি এটি না করো তাহলে পৃথিবীতে বড় বিপর্যয় ও মারাত্মক নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে)– পড়ি, তখন বিস্ময়ের সমুদ্রে হাবুডুবু খাই যে, কথা আসলে কার উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে? এই অল্পক'জন লোকদের উদ্দেশ্যে, নিজেদের মাতৃভূমিতে বসবাসকারী আনসারদের নিয়ে গঠিত এই ক্ষুদ্র দলটির উদ্দেশ্যে আর মুহাজিরদের উদ্দেশ্যে, যারা মক্কা থেকে হিজরত করে এসেছে! গণনা করা হলে তাদের

সংখ্যা দেড় হাজারের বেশি হবে না। আল্লাহ তাঁদেরকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছেন, আনসার-মুহাজির পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে বলছেন। প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে এমন এক ঐক্য গড়ে তোলার নির্দেশ দিচ্ছেন, যার ভিত্তি দাঁড়িয়ে থাকবে ঈমান ও ইয়াকিন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-ঘোষিত ঐক্য, মানবতাবোধ, মানবিক চেতনার মূলনীতি ও বিশ্বাসের পাদদেশে।

এ ক্ষুদ্র দলটিকে আল্লাহ বলছেন, এই ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় যদি তোমরা অবহেলা প্রদর্শন কর, উদাসীন হও, এ-নতুন ঐক্য প্রতিষ্ঠায় যদি অলসতা প্রদর্শন করো যার সম্পর্কে পৃথিবী ওয়াকেবহাল নয়, হাজার বছরের ইতিহাস মানুষকে যা ভুলিয়ে দিয়েছে, উপেক্ষা করেছে যুগযুগ ধরে, যদি তোমরা এই ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে দুর্বলতার পরিচয় দাও, যা এক মহান ও উচুঁস্তরের বার্তাবাহী, যদি এই সংহতিকে টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হও সত্যিকার ও নিষ্ঠাপূর্ণ ভ্রাতৃত্বের ওপর গড়ে উঠেছে, তাহলে পৃথিবীজুড়ে নৈরাজ্য বিস্তার লাভ করবে, মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দেবে সর্বত্র।

একটু ভেবে দেখুন, এই ক্ষুদ্র দলটি যারা ইয়াসরিবের (যা পরে মদিনাতুর রাসুল হিসেবে নামকরণ হয়েছে) অধিবাসী, বাস্তবতার আলোকে তারা কী হিসাব রাখে? তাদের মোট জনসংখ্যা কতোই বা ছিল ? রাজনীতির ময়দানে তাঁদের কতটুকুই বা মূল্য? বিশ্বমঞ্চে তাদের কী মূল্যায়ন হতে পারে ? সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকি বাস্তব দুনিয়ায় তাঁরা কতটুকু মর্যাদার দাবিদার? তিনবার আদমশুমারি করা হয়েছে যেমনটি বুখারী শরীফে এর উল্লেখ আছে। তৃতীয় আদমশুমারিতে তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক হাজার পাঁচশ'। গভীর ভাবনার বিষয়, কথাগুলো কাদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে। রোমীয়দের উদ্দেশ্যে কী, যারা প্রায় অর্ধপৃথিবীর মালিক-মুখতাররূপে অন্যতম পরাশক্তির আসনে ছিল, যারা বিশাল সাম্রাজ্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি, বিপুল সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত তৎকালের এক আন্তর্জাতিক শক্তিরূপে পরিচিত?

আল্লাহর কথাগুলো কী ইরানিদের উদ্দেশ্যে ছিল– যারা রোমানদের এক শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে সমকালীন পৃথিবীতে নিজেদের দাপুটে অস্তিত্ব বলিষ্ঠভাবে টিকিয়ে রেখেছিল দীর্ঘ সময় ধরে? নিশ্চিতভাবেই তখন রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্য তখন গোটা পৃথিবীর 'ভাগ্য নিয়ন্ত্রক' ছিল, জীবনযাত্রার গতিপ্রবাহ তারাই নির্ধারণ করছিল, সভ্যতা-সংস্কৃতির বাগডোর ছিল তাদের হাতেই। বিশ্ববাসীর জীবনধারণের সমূহ উপকরণ ও পৃথিবীর গতিধারা (এমন বলা যদি ভুল না হয়) তাদের কব্জায় ছিল।

তাদের উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছিল :

إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

প্রিয় শ্রোতা! 'ফিৎনা' শব্দের প্রভাব, অন্তর্গত শক্তি , ওজন ও ব্যাপ্তি নিয়ে ভাবুন। আয়াতে কেবল 'ফাসাদ' বলা হয়নি; বলা হয়েছে فَسَادٌ كَبِيرٌ মহা বিপর্যয়। কথাগুলো সেই ক্ষুদ্র দলটির উদ্দেশে বলা হলো, যাদের উপর ইসলামের ভিত স্থাপন করা হয়েছে, যাদের স্কন্ধে ইসলামের পয়গামের ভার অর্পিত হয়েছে। এই অল্পসংখ্যক লোকসমষ্টিতে গড়া শক্তিকে বলা হয়েছে– 'যদি তোমরা ইসলামি, ঈমানি, মানবিক ও ইনসাফভিত্তিক ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় অলসতা দেখাও এবং প্রতিষ্ঠিত ভ্রাতৃত্ব যদি ঠিকঠাক মতো প্রকৃত ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, পরার্থপরতা, ত্যাগ ও আত্মনিবেদনের ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো না হয় তবে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটে যাবে।'

তখন মুসলিম উম্মাহর কী-ই বা গুরত্ব ছিল, যখন তাদের সংখ্যা মাত্র হাজারের কোঠায়! তখন থেকেই তাদেরকে এতো উঁচু পর্যায়ের কথা হচ্ছিল, সংখ্যাতাত্ত্বিক বিবেচনার বাইরে তাদের মূল্যায়ন করা হচ্ছিল, সমগ্র পৃথিবীর বাদ-বাকি ধর্মানুসারী জনগোষ্ঠী সমান্তরালে তাদের মাপা হচ্ছিল!

এমন ঘোষণার মাধ্যমে এই বাস্তবতাই পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, মুসলিম উম্মাহর গুরুত্ব 'বস্তুগত শক্তি ও অবয়ব'-এ নয়, 'অন্তর্নিহিত মর্যাদা ও নৈতিক মূল্যে'ই নির্ধারিত হয়। তাদের অবস্থান ও মর্যাদা যে শ্বাশত পয়গাম, আকিদা-বিশ্বাস, চরিত্র-নৈতিকতার ফল, সেই দীপ্তচেতনা শরীরী অবয়বে উদ্যম ও উদ্দীপনা হয়ে, উৎকৃষ্ট বোধ ও অন্তঃসলিলা চিন্তাস্রোত হয়ে প্রভাব বিস্তার করে, যা দুর্দান্ত ও সদাসজাগ-চঞ্চল অন্য এক প্রাণরূপে তার মাঝে বিরাজ করে। এ প্রাণপ্রবাহ আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ।

মুসলিম উম্মাহর মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি এমনসব ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত যা মহান আল্লাহ তাদেরকে উপহার দিয়েছেন। তার কাছে সংখ্যা ও উপায়-উপকরণ বা শক্তি-সামর্থের প্রাচুর্য মোটেও বিবেচ্য নয়। কোনো জায়গার দূরত্বও ধর্তব্য নয়। কারণ, তার ক্ষমতার বলয় কোনো সীমানাতে আবদ্ধ নয়। নির্দিষ্ট বা মেয়াদকালের প্রশ্নও তার কাছে অবান্তর। কারণ, তিনি সীমিত সময়ের ক্ষমতাবান নন।

আমি মুসলমানদের এ ছোটখাটো দলটিকে–তাদের সংখ্যা যাই হোক– সে আয়নাতেই দেখি যে, আতশী কাঁচের আলোকে তাদের আল্লাহপ্রদত্ত বৈশিষ্ট্যাবলি স্পষ্ট ফুটে ওঠে। আমি আজকের সভায় উপস্থিত সকলের

শোকরিয়া আদায় করছি, আপনারা আমাকে এখানে কথা বলার সুযোগ করে দেবার জন্যে। আপনারা সংখ্যায় বেশি নন কিন্তু মর্যাদাগত বিচারে আপনাদের মূল্য অনেক। আমি আজকের এই মূল্যবান সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আপনাদের সকলের কাছে ইসলামের পয়গাম পেশ করতে চাই এবং আপনারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের সাথে আমার সম্বন্ধকে মূল্যায়ন করেছেন বলেই আবারও আপনাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই সম্পর্ক কতটুকু পূর্ণতা পেয়েছে, আমি তা ঠিক জানি না; কিন্তু ধর্মীয় জ্ঞান ও দাওয়াতের ময়দানে এই সম্বন্ধের একটি ব্যাপক পরিচিতি আছে। আপনারা এ পবিত্র জনপদে আমাকে সম্মানিত করে প্রকৃতপক্ষে এই সম্বন্ধ, জ্ঞান, দ্বীনি দাওয়াত ও ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও চেতনার মূল্যায়ন করেছেন, তাই এটি আমার ব্যক্তিগত সম্মান নয়, ইসলামের সাথে সম্পর্কযুক্ততার মর্যাদা :

> 'গোলামির চিহ্নই খসরুকে উঁচু মর্যাদায় আসীন করেছে,
> বেলায়েতের আমির হতে পারার নেপথ্যে বাদশাহ কর্তৃক
> ক্রীত হওয়ার ভূমিকা ক্রিয়াশীল।'

হারামাইন শরীফাইনে অবস্থানের সময়টি অতিবাহিত করে রিয়াদ হয়ে ভারতের ফিরলাম। রিয়াদে কয়েকদিনের সফর, জামেয়াতুল ইমাম মুহাম্মদ ইবনু সাউদের উপাচার্য ড. আবদুর রহমান মুহসিন আত্ তুরকীর আমন্ত্রণ ও আগ্রহে হয়েছিল। তিনি খুব গুরুত্বের সঙ্গে দাওয়া ও প্রকাশনা বিভাগ পরিদর্শন করিয়েছেন। রিয়াদের অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি শায়খ আবদুল আযিয রেফায়ী (সউদী আরবের সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সদস্য) এর (যিনি স্বয়ং একজন আরবি সাহিত্যিক ও ইসলামি সাহিত্যকর্মী, সুলেখক) বাড়িতে প্রতি সপ্তাহে সন্ধ্যায় সাহিত্যের আসর অনুষ্ঠিত হয়, সেই আসরে যোগ দিয়ে সাহিত্য আলোচনায় অংশ নেবার সুযোগ হয়েছে। ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশার ঘরে রাবেতার সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে, ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাবেতাতুল আদাব আল আলমীর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। এ সফর সম্পন্ন করে সুস্থ অবস্থায় ভারতে ফিরে আসি।

পয়ামে ইনসানিয়তের একটি সফর

এসব দাওয়াতী তৎপরতা, শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক দেশ-বিদেশের সফর প্রভৃতির মাঝেও যে বাস্তব ভাবনা মন ও দৃষ্টি থেকে আড়াল হয় না, তা হলো– যে দেশটিতে আমার জন্ম ও জীবনযাপন এর প্রকৃত অবস্থা, ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা ও অনাগত ভবিষ্যতের অনাকাঙ্ক্ষিত হুমকিগুলোর বিষয়

কোনোভাবেই এড়িয়ে যাওয়ার পথ দেখি না। তাই ঘুরেফিরে পয়ামে ইনসানিয়তের বার্তা কীভাবে আরও জোরালো এবং বিস্তৃত পরিসরে ছড়িয়ে দেয়া যাতে সেই ভাবনা হাজির হয়। এ সময় পর্যন্ত, ইউপি, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও পূর্বপাঞ্জাব সফর করা হয়ে গেছে। এসব সফর ফলপ্রসূও হয়েছে। মার্চ ১৯৮৫ ঈসায়ী সালে বোন্দেলখণ্ড সফরের কর্মসূচি গৃহীত হয়। ১১ মার্চ ১৯৮৫ সালে ছোট একটি প্রতিনিধিদল রওনা হয়। কাফেলাটির গন্তব্যগুলোর মধ্যে হাথুরা, বান্দাহ, পান্না, নাগোরা, সিদ্ধি ও রেওয়াঁ ছিল অন্যতম। প্রতিনিধি দলে ছিলেন বন্ধুবর ড. মুহাম্মদ ইশতিয়াক হোসাইন কুরাইশী, মুহাম্মদ হাসান আনসারী, কাজী আবদুল হামিদ আন্দুরী, মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ মুরতজা (পরিদর্শক, নদওয়াতুল উলামা কেন্দ্রীয় পাঠাগার) ও আমার স্নেহভাজন সাইয়িদ ইসহাক হোসাইনী।

এ সফরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, মাওলানা কারী সিদ্দিক আহমদ– যিনি জামিয়া আরবিয়া হাথুরার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ (তিনি এতদঞ্চলে একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব) তিনি কেবল সফরসঙ্গীই ছিলেন না বরং নিজের দ্বীনি ও নৈতিক প্রভাবসমূহ পুরোদমে কাজে লাগিয়ে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে স্বীয় আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বকে এ সফর সফল করায় ব্যাপৃত রেখেছিলেন। প্রায় প্রতিটি গন্তব্যে তিনি আগেভাগে পৌঁছে যেতেন এবং আমাদের বিশ্রাম ইত্যাদির সুব্যবস্থা করার পাশাপাশি সম্মেলনগুলোর সফরসূচি বিন্যাস করতেন। পান্নাতে মহারাজা পান্না আমাদের সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন, এই কর্মসূচির ব্যাপারে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। সাতনা থেকে সেখানকার একজন সম্মানিত বড় ব্যক্তিত্ব প্রফেসর আখতার হোসাইন প্রতিনিধিদলে যোগ দেন। সিদ্ধিতে সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ড. শোভন সিংহজী, যিনি মধ্যপ্রদেশের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন সিংহের ভাই। তিনি রেওয়া থেকে সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য চলে এসেছিলেন। সাতনার সম্মেলনে বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ড. রাঠোর সভাপতিত্ব করেন। ১৭ মার্চ এ সফর সমাপ্ত হয়।

লন্ডন, অক্সফোর্ড ও লুক্সেমবার্গে দিনগুলো

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা ও সেই সুবাদে সফর বিষয়ে 'কারওয়ানে যিন্দেগী' দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।[১] ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠার অনুমোদন ও সে

১. কারওয়ানে যিন্দেগী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৪-৩৮১

ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতাও দিয়েছিল। কিন্তু কাজটি যথারীতি শুরু করাটা বাকি ছিল। এদিকে লুক্সেমবার্গ (বেলজিয়াম)-এ কয়েকজন বিশিষ্ট আরব শিক্ষাবিদ– যাদের মধ্যে উস্তাদ জামালুদ্দিন আতিয়্যার নাম অগ্রগণ্য ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক একটি সভা আহ্বান করেন। আমাকে সে সভার সভাপতি হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল। এর তারিখও নির্ধারিত হয়েছিল অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে ইসলামিক সেন্টারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পরে। ধর্মীয় ও শিক্ষাবিষয়ক এসব কর্মসূচিকে সামনে রেখে ব্রিটেন ও বেলজিয়াম সফর চূড়ান্ত হয়। ৮ অক্টোবর থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত সময়টি ব্রিটেনেই অতিবাহিত হয়। মধ্যবর্তী সময়টি ইসলামিক সেন্টারের নীতিমালা ও কর্মকৌশলের রূপরেখা তৈরি এবং ইউনিভার্সিটির সহযোগিতা ও সমর্থন সাপেক্ষে এর ভিত্তিস্থাপনের আইনি প্রক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করার জন্য বরাদ্দ ছিল।

ব্রিটেন সফরটি ছিল ৮ অক্টোবর '৮৫ খ্রিস্টাব্দে। সেন্টারের রূপরেখা প্রস্তুত হয়ে গেছে। এটাকে একটি ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানের রূপ দেয়া হবে। এর একটি পরিচালনা পর্ষদ থাকবে। ট্রাস্টিদের সংখ্যা ১৪ জন রাখার সিদ্ধান্ত হলো, যাদের মধ্যে দুজন নেয়া হলো ইউনিভার্সিটি ও সেন্টক্রস কলেজের প্রতিনিধি হিসেবে। আর বার জন হলেন ইসলামি বিশ্বের বিশুদ্ধ চিন্তাধারার ব্যক্তিবর্গ থেকে। সিদ্ধান্ত হলো, ১৪ জন ট্রাস্টির মধ্যে ১১ জন হবেন মুসলিম। অন্যান্য মৌলিক নীতিমালা সম্বলিত একটি খসড়া গঠনতন্ত্র নিবন্ধনের জন্য ব্রিটেনের সংশ্লিষ্ট আদালতের রেজিস্টার বরাবরে জমা দেয়া হয়। এটাতে কমপক্ষে ছয় জন ট্রাস্টির স্বাক্ষর প্রয়োজন ছিল। ৯ অক্টোবর আইনজীবীর উপস্থিতিতে আমিসহ ট্রাস্টিগণ স্বাক্ষর করলেন। এভাবে 'অক্সফোর্ড সেন্টার ইসলামিক স্টাডিজ' নামের প্রতিষ্ঠানটি দুই বছরের চিন্তা-ভাবনা ও প্রস্তুতিমূলক তৎপরতার ফসল হিসেবে একটি আইনি অবয়বে দাঁড়িয়ে যায়। ১১ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের এক সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে এর ঘোষণাও দেয়া হয়। সেন্টারের রূপরেখা ঘোষণার অনুষ্ঠানটি খুবই উৎসাহব্যঞ্জক হয়ে উঠেছিল। অনুষ্ঠানটির উদ্বোধনে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেয়া হয়। সেন্টারের চেয়ারম্যান (বর্তমান লেখক) এর পক্ষ থেকে একশ'জন মেহমানকে নৈশভোজে দাওয়াত করা হয়, যেখানে ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, পদস্থ কর্মকর্তা ও ব্রিটেন প্রবাসী শিক্ষিত শ্রেণীর বিশিষ্ট লোকজন অন্তর্ভুক্ত ছিলো। সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এতে অংশ নেন। নৈশভোজের পর আলোচনার পর্ব রাখা হয়েছিল। উপস্থিত

সুধীগণ খুবই ধীর-স্থিরভাবে বক্তৃতা শুনছিলেন। আমি আরবিতে বক্তৃতা করেছি, ড. ফরহান এর পূর্বপ্রস্তুতকৃত ইংরেজি অনুবাদ পড়ে শোনান। সভায় ড. ডেভিড ব্রাউনিং, ড. ফরহান নিজামী, ড. কে. বি গ্রিফেন, প্রেসিডেন্ট ম্যাগডালিন কলেজ, মিস্টার এসি বোর্ড, প্রিন্সিপাল সেন্টক্রস কলেজ ও রাবেতা আলমে ইসলামির সেক্রেটারী জেনারেল ড. আবদুল্লাহ ওমর নাসিফ বক্তৃতা করেন। আমার বক্তব্যের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল :

> "অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে এই সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হওয়া একটি সৌভাগ্যের বিষয়। এতে করে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি ও পারস্পরিক বোঝা-পড়ার নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে, জ্ঞান-গবেষণার নতুন মহাসড়ক উন্মুক্ত হবে। ইসলাম মানবতার যে পাঠ দান করেছে এবং মানবতাকে উঁচু মর্যাদায় অভিষিক্ত করে এর সর্বজন ও ব্যাপক উপলব্ধির প্রয়োজন রয়েছে। বিশ্বনবীর (সা.) আবির্ভাবকালীন সময়ে মানবতার অবস্থা মুমূর্ষু অবস্থা চলছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মৃত শিরায় নতুন প্রাণের তরঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে মানবজাতি যে উন্নতি সাধন করেছে, এটি ছিল মানবতাকে বাঁচিয়ে রাখার সে প্রয়াসেরই ফল, যা রাসূলুল্লাহর হাতে শুরু হয়েছে। মানবতার সুরক্ষায় সেদিন যদি রাসুলে করিম (সা.) এরূপ অবদান না রাখতেন, তাহলে আজ না এসব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতো, না এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন ঘটতো। মানবতার মুক্তির সে সংগ্রাম-সাধনা আজ অবধি মানবতার জন্য কল্যাণ-প্রত্যাশার ব্যাপক সম্ভাবনা তৈরি করেছে।
>
> এই বিচারে মূল্যায়ন করলে ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ নয় বরং কৃতজ্ঞতা ও স্বীকৃতির অভিপ্রকাশ, ভালোবাসার মূল্য পরিশোধ ও সৌজন্যের দাবিপূরণ, যা সানন্দে-স্বচ্ছন্দে ইসলামের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে।"

কথিত আছে ইউরোপে যে নৈশভোজে মদের আয়োজন থাকে না, তা জমে উঠে না। কিন্তু এই নৈশভোজ শুধু সফল নয় বরং ইউনিভার্সিটির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আমার বক্তৃতার পর্যালোচনায় ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধি বি গ্রিফেন বলেন :

> "মানবসভ্যতার উৎকর্ষে ইসলামের প্রভাব সুগভীর ও দীর্ঘস্থায়ী।"

তিনি চীনের বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষত, সিংকিয়াং (যেখানে তিনি কিছুকাল সময় অতিবাহিত করেন) এ মসজিদসমূহের কথা উল্লেখ করলেন, যা চতুর্দশ শতকে নির্মিত। তিনি বলেন :

> "সেখানেও মাও সেতুং ও মার্কসের আগেই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ উপস্থিত হয়েছে। তাদের আদর্শ বিদায় হবার পরও তাঁর আদর্শ বহাল থাকবে। ইসলামিক সেন্টারের মতো একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল।"

রাত সাড়ে দশটায় নৈশভোজ শেষ হয় এবং মেহমানরা যার যার গন্তব্যে ফিরে যান। ১১ অক্টোবর সন্ধ্যায় ইসলামিক সেন্টারের কাজ শেষ হয়। পরের দিন আমি লন্ডনে চলে আসি। আমার পুরনো বিশ্রামের ঠিকানা মসরুর আহমদ লক্ষ্ণৌভী এর ঘরে উঠি। লন্ডন পৌঁছে সেদিনই লুক্সেমবার্গ সফরের কথা ছিল– যেখানে আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহকীকাতের কর্মপরিষদের বৈঠক হবার কথা রয়েছে। সেখানে আমার সভাপতিত্ব করার কর্মসূচিও আছে। এতে অংশগ্রহণের জন্য কয়েক মাস ধরে চিঠি-পত্র আদান-প্রদান চলছিল। আমি বোধ হয় নিজের ব্যস্ততা ও শারীরিক দুর্বলতার কারণে অপারগতাও প্রকাশ করেছিলাম। অক্সফোর্ডের সফর যেহেতু সম্ভব হয়েছে, সেহেতু লুক্সেমবার্গ সম্মেলনেও অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিই। কারণ, লুক্সেমবার্গ লন্ডন থেকে মাত্র একঘণ্টার দূরত্বে অবস্থিত। লন্ডন পৌঁছার পর ড. জামালুদ্দীন আতিয়্যাকে (যিনি সম্মেলনটির সেক্রেটারী), ফোনে জানানো হল। হঠাৎ মনে পড়লো, আমার কাছে তো বেলজিয়ামের ভিসা নেই। অফিসের অবকাশ না হওয়ায় ভিসার ব্যবস্থা করা যায়নি। আমাকে ব্রুকসেলস নামতে হবে, সেখান থেকে লুক্সেমবার্গ প্রায় দুইশ' মাইল হবে, এ দু'টি আলাদা দেশ। ড. জামালুদ্দিন আতিয়্যা ব্রুকসেলস একজন সফরসঙ্গীর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, এন্ট্রি ইত্যাদি কাজে তিনি সহায়তা করবেন। আমি আমার 'মেজবান' মসরুর আহমদকেও সাথে নিলাম। ড. আতিয়্যার প্রতিনিধি ব্রুকসেল্‌সে উপস্থিত ছিলেন। বিমান বন্দরে ভিসা ও এন্টিসংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলো। সেখান থেকে রাত ১০টায় লুক্সেমবার্গের উদ্দেশে রওনা হই এবং প্রায় দেড়টার দিকে সেখানে পৌঁছে যাই।

লুক্সেমবার্গে সকাল ১০টায় 'ইদারায়ে তাহকীকাতে ইসলামিয়া'-এর নির্ধারিত সভা সংস্থাটির মিলনায়তনে শুরু হয়। এ সভায় প্রথমবারের মতো ফিলাডেলফিয়ার টেম্পল ইউনিভার্সিটির ধর্মবিজ্ঞান অনুষদের ইসলামি অনুশাসন বিভাগের চেয়ারম্যান ড. ইসমাইল রাজী ফারুকীর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তখন কি জানা ছিল, কিছুদিন পরেই তিনি ইসলামের কোনো শত্রু আরব ইয়াহুদির হাতে সপরিবারে শাহাদত বরণ করবেন! সম্মেলনে কমিটির পূর্ণাঙ্গরূপ প্রস্তুত হয়। নতুন দায়িত্বশীলগণ নির্বাচিত হন, গবেষণামূলক কাজগুলোর প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়, আগামীদিনের কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য কর্মসূচিসমূহকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ ও বিন্যাস করা হয়। এদিনই লন্ডন ফেরার কথা ছিল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে লুক্সেমবার্গ বিমান বন্দরের উদ্দেশে রওয়ানা হই। লন্ডনে থাকার তখনও আমার হাতে একদিন দুইরাত সময় আছে। এ সময়ের কর্মসূচি ছিল, ইসলামিক ওয়েল ফেয়ার, মুসলিম ওয়েল ফেয়ার সেন্টার প্রভৃতির অনুষ্ঠানে যাওয়া এবং বেকার স্টেটের ইসলামিক সেন্টারে বক্তৃতা। সেখানে গিয়ে অকস্মাৎ পুরনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু ড. সাঈদ রমজানের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, যিনি জেনেভা থেকে শুধু আমার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে চলে এসেছেন। তিনি জেনেভা যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কিন্তু আমার অপারগতার কারণে তিনি নিজেই লন্ডন চলে এলেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে অনেক্ষণ কাঁদলেন, পরে বিশ্রামকক্ষে এসে সাক্ষাৎ করলেন। পরের দিন বিদায় জানাতে বিমানবন্দর পর্যন্ত এলেন। ১৫ অক্টোবর (লন্ডন সময়) সকাল ১০টায় দিল্লীর উদ্দেশ্যে বিমানে যাত্রা করে ভারতে ফিরে আসি।

নিষ্ঠাবান এক সহযোগীর ইন্তেকাল

৫ নভেম্বর ১৯৮৫ ঈসায়ী সালে দ্বীনি তা'লিমী কাউন্সিলের সেক্রেটারী মাওলানা মাহমুদুল হাসান (উত্তরপ্রদেশ) এর ইন্তেকাল করেন। আমাদের এ আন্দোলন একজন সক্রিয় কর্মী, নিষ্ঠাবান নেতা ও অকৃত্রিম জাতির সেবককে হারালো। এ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও সুফল সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয়, নতুন প্রজন্মকে ধর্মীয় শিক্ষা বঞ্চিত করার বর্তমান হুমকি সম্পর্কে প্রখর সচেতনতার ক্ষেত্রে কাজী আদিল আব্বাসীর পরেই তার স্থান। তিনি কাউন্সিলের কর্মতৎপরতাকে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। যফর আহমদ সিদ্দিকীর (রহ.) ইন্তেকালে পর কাউন্সিলের জন্য এটি দ্বিতীয় বিপর্যয় ও শূন্যতা, যা পূরণ হওয়া সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ বলতে হয়। আল্লাহ তাদেরকে নিজের বিস্তৃত রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দিন!

চতুর্থ অধ্যায়

মুসলিম পার্সোনাল ল' (মুসলিম পারিবারিক আইন) সংরক্ষণের তাৎপর্য ভারতীয় মুসলমানদের সামনে নতুন পরীক্ষা ভারতজুড়ে সর্বাত্মক আন্দোলন ইসলামি পারিবারিক আইনের ব্যাপারে উচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপ মোকাবেলায় মুসলমানদের বিজয়

মুসলিম পার্সোনাল ল' (মুসলিম পারিবারিক আইন) : তাৎপর্য, আন্দোলন ও কর্মতৎপরতা

মুসলিম পারিবারিক আইন আন্দোলন, এর গুরুত্ব এবং অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড গঠন, যা ১৯৭২ সালের ২৭-২৮ ডিসেম্বর মুম্বাই নগরীতে সম্পন্ন হয় – সে সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে।[১] সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে এ সংগঠনের প্রধান নির্বাচিত দারুল উলুম দেওবন্দের (তৎকালীন) মুহতামিম হযরত মাওলানা কারী তৈয়্যব (রহ.)। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে আকর্ষণীয় ও বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্বের গুণে ভূষিত করেছেন। ১৯৭৭ সালে রাঞ্চিতে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সম্মেলনে কোনো কোনো মহল থেকে সভাপতির পদে পরিবর্তন আনার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় এবং আমার নাম প্রস্তাব করা হয় কিন্তু আমার প্রতিক্রিয়ায় সকলে চুপ মেরে যায়, তা ছিলো এরূপ যে, "তুফানের সময় তো নৌযান বদলানো যায় না। এটি এসেছিল, চলে গেছে আর বিষয়টির ইতিও ঘটে গেছে।" আমি এমনটি বলার অন্যতম প্রধান কারণ হলো, মাওলানা কারী তৈয়্যব সাহেবের মতো ব্যক্তিত্ববান ও সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তি কোনো সংগঠনের সভাপতি হিসেবে পাওয়াই তো দুর্লভ ! আর অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড-এর মতো ব্যাপকভিত্তিক জাতীয় সংগঠনের জন্য তিনিই উপযুক্ত লোক।

---

১ . কারওয়ানে যিন্দেগি, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৬-১৩৯

কিন্তু ১৭ জুলাই ১৯৮৩ খ্রি. হযরত মাওলানা কারী তৈয়্যব (রহ) পৃথিবীর সফর শেষে পরপারে চলে যান। ফলে, তার পদটি শূন্য হয়ে যায়। এ বছর ২৭-২৮ ডিসেম্বর (১৯৮৩ খ্রি.) মাদ্রাজে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড এর বার্ষিক সম্মেলনের তারিখ চূড়ান্ত হয়। আমি দেশের বাইরের বিভিন্ন কর্মসূচি ও স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে ইতোপূর্বে কার্যকরী পরিষদের একাধিক সভায় উপস্থিত থাকতে পারিনি। এ সভায় উপস্থিত থাকার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। এতদুদ্দেশে সফরের যাবতীয় আয়োজন প্রায় সম্পন্ন, এমন সময় আমার পায়ের অসুখটি (Gout) – যে রোগে আমি অনেকদিন আক্রান্ত – আমাকে শক্তভাবে জেঁকে ধরে। এ সময় আমি আমর রায়বেরেলীর বাড়িতে শয্যাশায়ী। খাট থেকে নামাই ছিল বেশ কঠিন। অপরাগ হয়ে সফর মুলতবি করতে হলো। সম্মেলন শেষে আমি খবর পেলাম সভাপতি হিসেবে আমার নাম প্রস্তাব করা হয়েছে। যারা আমার স্বভাব-প্রবণতা সম্পর্কে অবগত তারা বললো, "তিনি কেবল সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলে এটি মেনে নিতে পারেন অন্যথায় নয়।" আমি জানতে পারলাম, কোনোরূপ মতান্তর ছাড়াই সর্বসম্মতিক্রমে আমার নাম অনুমোদিত হয়।

এখবরটি আমার জন্য জগদ্দল পাথরের মতো উদ্বেগ বয়ে আনে। এ খবরটি আমার স্বভাব-প্রকৃতি, মন-মেজাজ ও স্বাস্থ্যগত বাস্তবতা ও অন্যান্য কর্মব্যস্ততার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। যদি এটি কোনো রাজনৈতিক, জাতীয় নেতৃত্ব আর সম্মান-গৌরবের প্রশ্ন হতো, তাহলে আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে তা গ্রহণে অস্বীকৃতির কথা সংশ্লিষ্টদের জানিয়ে দিতাম। কিন্তু একদিকে সমস্যার প্রকৃতি, অন্যদিকে এ আন্দোলনের তাৎপর্য (যা আমি নিজের আকিদা-বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং মুসলমানদের জাতীয় অস্তিত্বের প্রশ্নে শাহরগ বলে বিবেচনা করি); দ্বিতীয়ত মাওলানা মিন্নাত আলী (রহ.)-এর প্রতি সমীহবোধ (যিনি নদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌ-এর প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গিরীর বংশধর হওয়ার কারণে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখে থাকি)-এর কারণে চাই বা না চাই পদটি গ্রহণ করতে হলো। বন্ধুদের অভিমত অনুযায়ী এ সময় বোর্ডের ঐক্য ধরে রাখতেও এমনটি করতে হয়েছে যেন পুরনো যুগের সেই ফার্সি কবিতাটির প্রতিফলন ঘটলো :

'সব রণাঙ্গনে তরবারি চালনা করা সম্ভব নয়; অনেক ক্ষেত্রে বরং আত্মসমর্পণ যথাযথ পদক্ষেপ।'

আমার কল্পনাতেও ছিল না দায়িত্ব গ্রহণের অল্প সময়ের ব্যবধানে কেবল মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের নয় বরং পুরো ভারতীয় মুসলমানদের জীবনে একটি কঠিন অধ্যায় উপস্থিত হবে, যেমনটি এর আগে কখনও ঘটেনি। এমন কঠিন সময়ে মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল নেতৃত্বকে অসাধারণ দৃঢ়তা, আত্মপ্রত্যয়, জাতিকে ঐক্যবদ্ধ, সুসংগঠিত ধর্মতত্ত্ববিদগণের বিস্তৃত আইনি গবেষণা, গভীর ও দূরদর্শী চিন্তা-ভাবনা, মেধা-প্রতিভার স্বাক্ষর রাখা, জনগণের আনুগত্য অটুট রাখা, ধৈর্য, অবিচলতা, নেতৃত্বের প্রতি আস্থা, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বলিষ্ঠতা ইত্যাদির প্রশ্নে অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দেয়া এবং জাতীয় চেতনা প্রকাশে সর্বোচ্চ অন্তর্নিহিত শক্তির সবটুকু কাজে লাগানোর প্রয়োজন দেখা দেয়।

কোলকাতার সাধারণ সম্মেলন

৬,৭ ও ৮ এপ্রিল ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতায় অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড এর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। এ সম্মেলনে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় সংগঠনের দায়িত্বশীল, মুসলিম শিক্ষাবিদ, আলিম, আইনজীবীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শরিক হন। আমি দেশ-বিদেশের সফর, অব্যাহত কর্মসূচির ব্যস্ততার চাপে উদ্বোধনী বক্তব্য প্রস্তুত করতে পারিনি। ফলে, লিখিত সূচনা বক্তব্যের পরিবর্তে মৌখিক বক্তৃতা দিয়েই সেদিনের কর্মসূচি শুরু করি। পরে মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের অফিসে খানেকায়ে রাহমানিয়া মুঙ্গের, বিহার থেকে এর রেকর্ডকৃত কপির অনুলিপি মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করা হয়। বক্তব্যটিতে সমস্যার মূল অংশগুলো একনজরে উপস্থাপিত হয়েছে। একইসঙ্গে, মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণার প্রেক্ষাপট, এর স্বরূপ এবং আল্লাহর আইন আর মানুষের তৈরি আইনের মাঝে সংবেদনশীল পার্থক্য ছাড়াও অভিন্ন দেশ হওয়ার প্রেক্ষিতে অভিন্ন সিভিল কোর্ডের অকার্যকরিতা ও অযৌক্তিতার এভাবে তুলে ধরা হয়েছে– যাতে কেবল বাস্তববাদী অমুসলিম নয় বরং মুসলমানদেরও নির্মোহ পর্যালোচনার সুযোগ উন্মুক্ত হয়।

৭ এপ্রিল ১৯৮৫ সালে বিকেল বেলা শহীদ মিনার ময়দানে বিশাল এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণভাবে ধারণা করা হচ্ছিল, চার-পাঁচ লাখ মানুষের সমাগম হবে।[১] বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বিপুলসংখ্যক

১. অধিকাংশ পর্যবেক্ষক ও অভিজ্ঞজনদের মতে এ সমাবেশে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের সমাগম ঘটেছিল।

মানুষ বাস ইত্যাদি যানবাহনে এসে সমাবেশে যোগ দেয়। এটি ছিল স্মরণকালের বৃহৎ মুসলিম সমাবেশ। পুরো মহাসমাবেশ লাখো জনতার উদ্বেলিত তরঙ্গে যেন আন্দোলিত হচ্ছিল। আমি সত্যিকার ও নিষ্ঠাবান মুসলমানদের সম্বোধন করলাম, তাদের ব্যাপারে নির্ভীক ও নিঃসঙ্কোচ পর্যালোচনা তুলে ধরলাম। তাদের উদ্দেশে আমি বলেছি, খোদ মুসলমানদের মধ্যে নিজেদের পারিবারিক আইন (যা আল্লাহ কর্তৃক তাঁর শেষ নবীর প্রতি নাযিলকৃত এবং সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত) লঙ্ঘনের কত ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে, তারা কীভাবে অহরহ হিন্দুয়ানী রেওয়াজ ও সংস্কৃতি অনুসরণ করছে, অমুসলিম সমাজের দ্বারা তারা কতো বেশি প্রভাবিত ও মোহাবিষ্ট হচ্ছে! আমি তাদেরকে অনুরোধ করেছি, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে নিজেদের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা এবং প্রথমে নিজেদের ঘরে নিজেদের জন্য 'আদালত' প্রতিষ্ঠার এবং ডাক দিয়েছি মুসলিম সমাজে আপনকর্ম মূল্যায়ন অর্থাৎ আগে নিজের 'বিচার' করার মানসিকতা তৈরির ব্যাপারে প্রত্যেকের কাছে যেন আহ্বান জানানো হয়। নিজের স্রষ্টা ও প্রতিপালকের ইবাদত না করে তার বন্দেগি এড়িয়ে চলার কুফল কতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, তার বর্ণনা দিতে চেষ্টা করেছি। বলেছি, এর ফলে এ জাতির সম্মান, ভাবমর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি কীভাবে দিনের পর দিন হ্রাস পাচ্ছে, জাতিকে কীরূপ সমস্যাবলির মুখোমুখী হতে হচ্ছে। যেহেতু মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের প্রথম উদ্দেশ্য হলো, মুসলিম সমাজকে পরিশুদ্ধ ও সংস্কার এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিসরে ইসলামি পরিবেশ ও আবহ তৈরির আহ্বান, সেহেতু এ ধরনের সাহসী ও নির্মোহ পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ! এ বক্তব্যের বেশ ভালো প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে।

এ সমাবেশ শুরু হয়েছিল আছরের নামাযের পর। বহু আলিম ও সংগঠনের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি বক্তব্য পেশ করেন। মাঝখানে মাগরিবের নামাযের সময় হয়ে গেল। সমাবেশেই মাগরিবের জামাআত অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু তাতে সমাবেশে কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়নি, লোকসংখ্যাও কমেনি। পরের দিন ভোরেই আমার আসানসোল যাওয়ার কর্মসূচি রয়েছে। আমার সফরসঙ্গীকে সবক'টি ইংরেজি পত্রিকা কিনে নিতে বললাম। পত্রিকা দেখে মনে হলো, গণমাধ্যমগুলো তাদের চিরাচরিত প্রবণতায় এতবড় সমাবেশকে অনেকটা এড়িয়ে গেছে। স্থানীয় কোনো কোনো পত্রিকা শিরোনাম করেছে, সমাবেশটিতে কয়েকশ' মুসলমান জমায়েত হয়েছে (Hundreds Of Muslims Attended)। বিষয়টি একদিকে সংবাদমাধ্যমের দায়িত্বহীনতার পরিচয় বহন

করে, অন্যদিকে সরকারের হিতাকাঙ্ক্ষী না হবার প্রমাণ পেশ করে। এতে দেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সমস্যা, তাদের চেতনা, অনুভূতি, সভা-সমাবেশের খবর চেপে রাখার একটি অসহিষ্ণু প্রয়াস লক্ষণীয়, যার ফলে এসব গণমাধ্যম সঠিক সিদ্ধান্ত, বিচক্ষণতা ও সাহসিকতার পথে বরাবরই ব্যর্থতার স্বাক্ষর রাখে।

সুপ্রিম কোর্টের রায় : ধর্মীয় বিষয়ে প্রকাশ্য হস্তক্ষেপ ও ইসলামি শরীয়তের ওপর নগ্ন আক্রমণ

উর্দু ভাষার একটি পুরনো প্রবাদ 'লোম বাছতে কম্বল উজাড়'-এর ভাবার্থবোধক। আমার সঙ্গে যেন ঠিক তাই ঘটলো। ২৭-২৮ ডিসেম্বর ১৯৮৩ সালে (কোলকাতা সম্মেলনে দু-সপ্তাহ পরেই) তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ভরণপোষণ প্রসঙ্গে এমন এক রায় দিলো যাতে ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ, কুরআনের মনগড়া তরজমা-তাফসীর উপস্থাপন, ইসলামি শরীয়তের অবমাননা এবং ইসলামি শরীয়তের ওপর নগ্ন আক্রমণ করা হলো। এটি পুরো জাতিকে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ করে তোলে। ফলে, এটি প্রত্যেক মুসলমানের স্বীয় ধর্মের মর্যাদা সমুন্নত রাখার ব্যাপারে নিজের ঈমানী অঙ্গীকার ও আত্মমর্যাদার প্রশ্নে সিদ্ধান্তমূলক ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়।

এটি মুহাম্মদ আহমদ খানের আপিলকৃত শাহবানু প্রমুখ মামলার ধারাবাহিকতাভুক্ত। বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচৌড়-কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের কিছু অংশ নিম্নরূপ :

> 'আইনপ্রণেতা মনু বলেছিলেন, নারীরা স্বাধীনতা পাওয়ার উপযুক্ত নয়। আর এটা প্রকাশ্যেই বলাবলি হয় যে, ইসলামের অন্ধকার দিক হলো– ইসলাম নারীদের মর্যাদা হ্রাস করেছে। (কুরআনের নির্বাচিত অংশ, এ্যাডওয়ার্ড উইলিয়াম লেন, ১৮৪৩; দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৮২ পৃ. xo পরিচিতি) নবীর (সা.) বরাতে উদ্ধৃত আছে যে, 'নারীকে বাঁকা হাড় থেকে তৈরি করা হয়েছে (খুব সম্ভবত উদ্ধৃতিটি ভুল)। তোমরা যদি এই বাঁকা হাড়কে সোজা করতে চাও তবে তা ভেঙে যাবে। তাই তোমরা নিজেদের সহধর্মিনীর সঙ্গে ভালো আচরণ করো।'
>
> 'যদি এমন কোনো ব্যক্তি যাকে এ ধরনের নির্দেশ (ভরণপোষণের আদেশ) দেয়া হয়েছে, সে যদি যৌক্তিক

কোনো কারণ ছাড়া তা পালনে ব্যর্থ হয়, তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট এ অর্থ অনাদায়ে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করতে পারে। গ্রেফতার করার পর তার কাছে ভরণপোষণের অর্থ একদফায় বা মাসিক কিস্তিতে আদায়ের ব্যবস্থা করতে পারে এবং পূর্বের অনাদায়ী সময়গুলোর জন্য কিছুদিনের শাস্তির হুকুম দিতে পারে।'

কুরআনের ২৪১ বা ২৪২ নম্বর আয়াত এ কথাই ব্যক্ত করে যে, পয়গম্বরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মতে, একজন মুসলমান স্বামী নিজের তালাকপ্রাপ্তাকে ভরণ-পোষণ দিতে বাধ্য। এখানে আয়াতগুলোর আরবি মূল উদ্ধৃতি সন্নিবেশিত হলো।

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [٢:٢٤١]

আর তালাকপ্রাপ্তাদের জন্য নিয়মমাফিক সুবিধাদি নিশ্চিত করা, যা সুনির্ধারিত। এটি পরহেযগারদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। এসব আয়াতের তরজমা দ্বান্দ্বিক নয়; প্রশ্ন হলো, আপিল দায়েরকারীর বক্তব্য হচ্ছে– ২৪১ নম্বর আয়াতে مَتَاعٌ শব্দের অর্থ দান করা, ব্যবস্থা করা– ভরণপোষণ নয়।

মুহাম্মদ যফরুল্লাহর 'দ্য কুরআন'-এ (পৃ. ৩৮) আয়াতদ্বয়ের ইংরেজি অনুবাদ এভাবে করা হয়েছে :

'তালাকপ্রাপ্তদেরকেও যৌক্তিক নিয়মে প্রদান করা হবে। এটি এমন এক দায়িত্ব যা পরহেযগার লোকদের ওপর আবশ্যিকরূপে আরোপিত হয়। এভাবে আল্লাহর তাঁর বিধানসমূহ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুঝে নিতে পারো।'

'দ্য মিনিং অব কুরআনে'ও (প্রথম খণ্ড, প্রকাশক বোর্ড অব ইসলামিক পাবলিকেশন্স, দিল্লী)-এ ২৪০–২৪২ নম্বর আয়াতের অনুবাদ এভাবে দেয়া হয়েছে। ড. আল্লামা খাদেম রহমানী নূরীর 'দ্য রানিং কমেন্ট্রি অর দ্য হলি কুরআন' (সংস্করণ ১৯৬৪ খ্রি.)। বিজ্ঞ বিচারক নিজের প্রদত্ত উদ্ধৃতিতে পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলো উপস্থাপনের পর লিখেছেন : আয়াতগুলোর আলোকে এ ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ থাকে না যে, কুরআনের আলোকে তালাকদাতা স্বামীর দায়িত্ব তালাকপ্রাপ্তাকে ভরণপোষণ এবং তার

জীবনযাপনের বন্দোবস্ত করে দেয়া। এর বিপরীত বক্তব্য কুরআনী শিক্ষার প্রতি ন্যায়ভ্রষ্ট হবে।

এটাও পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের আইনের ৪৪ (সম্মিলিত সিভিল কোড-সম্পর্কিত) ধারা এ ক্ষেত্রে অনর্থক বক্তব্যের শামিল। কাজেই অভিন্ন সিভিল কোডের সাংঘর্ষিক বক্তব্যপূর্ণ আইনের অকারণ লেজুড়বৃত্তির জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে।

বিভিন্ন আইনজ্ঞের ব্যক্তিগতভাবে প্রণীত আইনের আলাদা আলাদা ফাঁক-ফোঁকর ও আদালতের বিচ্ছিন্ন চেষ্টাগুলো অভিন্ন সিভিল কোডের এর বিকল্প হতে পারে না। আদালতকে সমাজ সংস্কারমূলক নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে। কেননা, অনুভূতিসম্পন্ন কেউ কোনোভাবে এরূপ প্রকাশ্য অন্যায় মেনে নিতে পারে না।

সুপ্রিমকোর্টের রায় ইসলামি আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক

সুপ্রিমকোর্টের ১২৫ নং রায়ের মধ্যদিয়ে যে বাস্তবতা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলো– তালাকপ্রাপ্ত মহিলা তার স্বামীর কাছ থেকে কেবল তখনই ভরণপোষণ পাবে যদি স্বামী স্বচ্ছল এবং জীবিত থাকে; অন্যথায়, তার জন্য ভিক্ষা করা ব্যতীত কোনো পথ খোলা থাকছে না। অথচ ইসলামি শরীয়তের বিধান অনুসরণ করলে এমন আশঙ্কা তৈরি হবার কোনো সুযোগ নেই। কারণ তালাকপ্রাপ্তা মহিলা তখন নিজের বাড়িতে চলে যাবে এবং যাদের ওপর তার ভরণপোষণ দেয়া ইসলামি শরীয়তমতে ওয়াজিব, তাদের কাছ থেকে তা পাবে। এ রায় C.R.P.C -এর ২৫ ধারায় তালাকপ্রাপ্তা মুসলিম মহিলাকে তালাকদাতা স্বামীর স্ত্রী বানিয়ে দ্বিতীয় বিয়ের আগ পর্যন্ত অথবা সারাজীবন ভরণপোষণের কথা বলা হয়েছে। সুপ্রিমকোর্টের এ রায়ে হিন্দুধর্মের বিধান প্রতিফলিত হয়েছে।

হিন্দুধর্মে বিয়ের পর কনের সঙ্গে পিতৃপক্ষের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। সে নিরঙ্কুশভাবে স্বামীর হয়ে যায়। তার কোনো অবস্থাতেই বাপের বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের প্রশ্ন ওঠে না। কাজেই সে কেবল স্বামীর পক্ষ থেকেই পাবে। এর ভিত্তিতে তালাকপ্রাপ্তাকে কেবল স্বামীর (তালাক দেবার পরও) পক্ষ থেকেই ভরণপোষণ দেয়ার কথা বলা হয়। ইসলামি আইন একেবারে ভিন্ন। ইসলামে বিয়ের পরে পিতৃপক্ষের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয় না। ইসলামের দৃষ্টিতে কন্যা চিরকালই কন্যা, বোন চিরকালই বোন। মৃত্যুর

সময়ও কন্যা পিতার জন্য কন্যা থাকবে এবং ভাইয়ের জন্য বোন বোনই থাকবে।

সুপ্রিমকোর্টের রায়ে কোনো কোনো ইংরেজি তাফসীরের সাহায্য নিয়ে মাতা' (متاع) এর অনুবাদ করা হয়েছে স্থায়ী ভরণপোষণ। যে কারণে কুরআনের কোনো কোনো ইংরেজি তরজমায় (Maintenance) শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। অথচ তাফসীর, হাদিস ও ফিকহের আলোকে এখানে অস্থায়ী ভরণপোষণের জন্য অর্থ, কাপড়চোপড় বা উপঢৌকন হবে।[১] এটাও আদালতের জন্য সীমালঙ্ঘন ছিল যে, আদালত যে ধর্মের জন্য রায় তৈরি করছেন, সেই ধর্মের প্রকৃত ধর্মতত্ত্ববিদ, মুফাসসিরগণের পরিবর্তে এমন কিছু লোকের তরজমা ও সিদ্ধান্তকে ভিত্তি হিসেবে ধরে নিয়েছেন, যারা কুরআন বোঝার কথা তো অনেক পরে, ভালো মতো আরবি জানার ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় আছে।

একটি মারাত্মক পদক্ষেপ

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞ বিচারক متاع بالمعروف এর তরজমা করেছে Maintenance (ভরণপোষণ)। অথচ কুরআনের ইংরেজি অনুবাদকদের মধ্যে যারা বিজ্ঞ এবং সতর্ক তারা ভরণপোষণের নয় লিখেছেন সৌজন্য এবং ভদ্রজনোচিত প্রয়োজনীয় জিনিস।[২] আসলে আরবি ব্যতীত অন্যভাষায় কৃত কয়েকজনের তরজমা দেখেই শরীয়তের বিধানসম্পৃক্ত একটি শব্দের উদ্দেশ্য নির্ণয় বা এতদসংশ্লিষ্ট রায় তৈরি করা একটি মারাত্মক পদক্ষেপ, যার

---

১. যে নারীর দেন-মোহর ধার্য করা ছাড়াই বিয়ে হয়ে গেছে এবং স্বামী তাকে সহবাসের আগেই তালাক দিয়েছে; সেই নারীকে মাতা' (متاع) দেয়ার কথা বলা হয়েছে। যার মর্ম হলো, বেচারি দেন মোহরও পাচ্ছে না অথচ তাকে ইদ্দতও পালন করতে হচ্ছে; কাজেই তাকে ইদ্দত পালনকালীন খরচ দিতে হবে। তাই তাকে মনে মনে একটি পরিমাণ নির্ধারণ করে কাপড়-চোপড় ইত্যাদি উপঢৌকনস্বরূপ কিছু জিনিস দেয়া বিধান রয়েছে। এটি সাময়িক এবং তাৎক্ষণিক জিনিস। সুপ্রিমকোর্ট তার সাম্প্রতিক রায়ে এটাকে স্থায়ী ভরণপোষণ সাব্যস্ত করে সকল প্রকার তালাকপ্রাপ্ত মহিলার জন্য এ সিদ্ধান্ত টেনে দিয়েছে। (বিস্তারিত জানতে দেখুন, তালাকপ্রাপ্ত মহিলার বিষয়ে সুপ্রিমকোর্টের সাম্প্রতিক রায়, পৃ.১৩-১৪, মাওলানা বোরহানুদ্দিন, শিক্ষক, তাফসীর বিভাগ; নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ)

২. দেখুন, কুরআনের অনুবাদ, মারডিউক পিকথল, জর্জ সিউল, রিচার্ড বেল, আর্থার জে. আরবারি, মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী ও সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদুদী (ইংরেজি অনুবাদ)

পরিণতি খুবই দূরপ্রসারী। এর ফলে একটি জাতীয় ধর্মীয় বিধানগত ব্যবস্থাপনা ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ আমলের আইনবিদ, আদালতের বিজ্ঞ বিচারকগণ অনেক বেশি দূরদর্শী, সূক্ষ্ম চিন্তা এবং দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। ১৮৯৭ সালে প্রিভিউ কাউন্সিল লন্ডনের একটি সিদ্ধান্তে কুলসুম কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার রায়ে বেঞ্চের সকল বিচারকের অভিন্নমত ছিল এরকম :

"আদালতের জন্য উচিত হবে, তারা প্রাচীনযুগের উচ্চস্তরের মুফাসসিরদের কৃত তাফসীরের পরিবর্তে আয়াতের মর্ম নিজেরা অনুসন্ধান চালিয়ে অনুধাবনের চেষ্টা করবে।"[১]

একইভাবে ১০৯৩ খ্রিস্টাব্দে সেসময়কার প্রিভিউ কাউন্সিল এর জজ অন্য এক মামলার রায় ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন,

"এটা মেনে নেয়ার মূলনীতি বিবেচনা খুবই মারাত্মক হবে যে, বর্তমান যুগের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পুরনো কোনো উদ্ধৃতির মূল পাঠের আলোকে নতুন আইন রচনা করতে পারবে; যদি এমন হয় যে, প্রাচীন আইনবিদগণ এরূপ রায় প্রকাশ করেননি।"[২] ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিমকোর্টও এই নীতিমালার অনুযায়ী পদক্ষেপ নিয়েছে। এর রায়গুলোতে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন লক্ষণীয়। এখানে স্রেফ একটি উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে :

১৯৮০ সালের একটি মামলার আপিলে রায় দিতে গিয়ে সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞ বিচারক তার পর্যবেক্ষণে বলেন : "আমাদের রায় মতে মামলাটির (আপিলপূর্ব) রায়ে বিজ্ঞ বিচারক একটি জিনিস লক্ষ্য করেননি, সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায় উভয়পক্ষের পারিবারিক আইনের সংগে সম্পৃক্ত নয়। বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের বিরোধ নিষ্পত্তিতে পারিবারিক আইনের প্রয়োগের বেলায় সমসাময়িক ধারণা ও ভাবনাকে যুক্ত করা সমীচীন হবে না। বরং ভারতের প্রামাণ্য ও প্রসিদ্ধ সূত্র (সামুরাতী ?) ও এর ব্যাখ্যাসমৃদ্ধ গ্রন্থসমূহের সাহায্য নিতে হবে।"[৩] এ রায়ে অভিন্ন সিভিল কোডের পক্ষে জোরালো মত ব্যক্ত করে বলা হয়েছে, "এটিও খুবই পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের

---

১. এল. আর. খণ্ড নং ২৬, ১৮৯৭ খ্রি. পৃ. ২০৩-২০৪

২. বাকের আলী খান বনাম আনজুমান আরা বেগম ও সাদেক আলী খান বনাম আনজুমান আরা বেগম, এল, আর. খণ্ড ১৯০৩ খ্রি. নং ৩০ ১১১-১১২ পৃ.

৩. কৃষ্ণ সিংহ, মথুরা....আই.এ.আর ১৯৮০ খ্রি. পৃ. ৭১২

আইনের ৪৪ ধারা (অভিন্ন সিভিল কোডের দিকনির্দেশ ধারা) এখনও পর্যন্ত কাগুজে আইন হয়েই পড়ে আছে। অভিন্ন সিভিল কোড পরস্পরের দ্বান্দ্বিক আইনের প্রতি আনুগত্যের বিপরীতে জাতীয় ঐক্যকে সুদৃঢ় করবে।"

সুপ্রিমকোর্টের বিতর্কিত রায়ের বিরুদ্ধে ভারতজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ ও অব্যাহত সমাবেশ

এ বিতর্কিত রায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশের পাশাপাশি মুসলিম পারিবারিক আইনের আলোকে নিজেদের সর্বসম্মত ধর্মীয় বিধান কার্যকরের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার দাবি আদায়ে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভারতে জোরালো অথচ নিয়মতান্ত্রিক কার্যক্রম ছিল দেশজুড়ে বড় বড় সমাবেশের আয়োজন, যার প্রভাব প্রশাসন, সরকার, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী ও পার্লামেন্ট সবকিছুর ওপর পড়বে। এর তৎপরতার মাধ্যমে পার্লামেন্টে নতুন বিল পাস করিয়ে সুপ্রিমকোর্টের এ রায়ের আলোকে এ ধরনের আইনকে বাতিল করা যাবে। এরই ধারাবাহিকতায় অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল'বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী বরাবরে বিপুলসংখ্যক তারবার্তা প্রেরণ, মসজিদে-মসজিদে মুসলমানদেরকে বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করা এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সভা-সমিতির আয়োজন করে গণসচেতনতা সৃষ্টির আহ্বান জানানো হয়েছে। ভারতের সর্বস্তরের মুসলমান এ ডাকে এমন অভূতপূর্ব সাড়া দিয়েছে যে, খেলাফত আন্দোলনের পর জাতীয় ইস্যুত এমন গণজাগরণের নজীর দ্বিতীয়টি দেখা যায়নি। দেশের শহর-নগর, গ্রাম-গঞ্জের আনাচ-কানাচ থেকে লাখ লাখ মানুষ বিপুল সংখ্যায় তারবার্তা পাঠিয়েছে। মসজিদগুলোতে এ বিষয়ে বয়ান ও দোয়া হয়েছে। দেশের পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্র বড় বড় সমাবেশ হয়েছে। একেকটি সমাবেশে লক্ষাধিক লোকের জমায়েত ঘটে যাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়।

খোদ আমার শহর রায়বেরেলী যা আদৌ কোনো বড় শহর নয়, এখানে ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬-তে নিখিল ভারত তাহাফফুজে শরীয়ত কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় এবং যাতে কওমী আজাদ পত্রিকার রিপোর্টমতে জেলার এক লক্ষাধিক মুসলমান একত্র হয়। রায়বেরেলীর মুসলমানেরা ৯ ফেব্রুয়ারি নিজেদের সমস্ত কাজ-কারবার বন্ধ রেখেছে। এটি একটি ঐতিহাসিক দিন ছিল। এ দিনের সমাবেশ ছিল রায়বেরেলীর জন্য স্মরণাতীতকালের বৃহত্তর সমাবেশ।[১]

---

১. স্মর্তব্য যে, রায়বেরেলীর মোট জনসংখ্যা এক লাখের কিছু বেশি।

সবগুলো সড়কপথ বন্ধ হয়ে যায়। ঘরে ঘরে পর্দানশীন মহিলাদের ভিড়। প্রতিটি কক্ষে আর বাড়ির ছাদে হাজার হাজার মহিলা।[১] এভাবে উত্তর প্রদেশ ও বিহারের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো ছাড়াও নগর-মফস্বল সবখানে বড় বড় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বোর্ডের কোনো কোনো এলাকার দায়িত্বশীল ব্যক্তি গণস্বাক্ষরের কর্মসূচিও পালন করেছেন, যেখানে হাজার হাজার মুসলমান স্বাক্ষর করেছেন।

নভেম্বর ১৯৮৬ সালে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল'বোর্ডের একটি প্রতিনিধিদল দক্ষিণ ভারত সফর করেন, যেখানে মাওলানা মুজাহিদুল ইসলামও ছিলেন। এটি মাদ্রাজ থেকে শুরু হয়ে কোচিয়ান, কালিঘাট পর্যন্ত যায় এবং ব্যাঙ্গালুরে (কর্নাটক) একটি বড় সমাবেশের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। এ সফরে মুসলিম লীগের প্রধান জনাব ইবরাহিম সুলাইমান শেঠ এমপি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অংশ নেন। তামিলনাড়ু ও কেরালার জামাআতে ইসলামীর আমীর সদলবলে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়েছেন। তা'মীরে মিল্লাতসহ বিভিন্ন ইসলামি সংগঠনের দায়িত্বশীলগণ পুরোদমে অংশগ্রহণ করেছেন। মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় জাগরণ ও ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকারের স্বতঃস্ফূর্ত চেতনা উদ্বেলিত হতে দেখা গেছে। আমার মনে আছে, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সফরকালে মধ্যরাতে ট্রেনের প্লাটফরমগুলোতে দলে দলে মুসলমানদের ভিড়, যারা ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের সংগে একটু সাক্ষাতের জন্য উপচে পড়তো। তাদের অধিকাংশের প্রত্যয়দীপ্ত উচ্চারণ শুনতাম– "শরীয়তের হেফাযতের জন্য জানমাল কুরবানির জন্য সার্বক্ষণিকভাবে তৈরি আছি।" ঝটিকা সফরটি ১৭ নভেম্বর জৌনপুর সমাবেশের মধ্যদিয়ে শেষ হয়।

অন্যদিকে, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মিন্নাতুল্লাহ রাহমানী নিজের শারীরিক দুর্বলতা, অসুস্থতা ও বহু ব্যস্ততার মাঝেও অনেক প্রদেশে ঝটিকা সফর করেন। বিহার ও উড়িষ্যার সমাবেশগুলো গুণে শেষ করা যাবে না। এসব সমাবেশের বিপুল জনসমাগম ছাড়াও যেটি লক্ষণীয় তা হলো, মুসলমানদের মধ্যকার ভিন্ন মহল, ঘরানা, দল-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সবাইকে এক কাতারে দেখা গেছে। মুসলিম লীগ, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ, জামাআতে ইসলামী ভারত, তা'মীরে মিল্লাত, ইত্তেহাদুল মুসলিমীন ও মুসলিম মজলিস ছাড়াও ফেরকায়ে ইসনা

---

১. কওমী আওয়ায, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬

আশরিয়ার মাওলানা সাইয়িদ কালবে আবেদ মুজতাহিদ বোর্ডের সহ-সভাপতি, জনাব শাব্বির ভাই নুরুদ্দিন (বোহরা জামাআত), জনাব ইউসুফ হাতেম মুচালা এডভোকেট (বোহরা জামাআত)। আরও ছিলেন অল ইন্ডিয়া শিয়া কনফারেন্সের প্রধান প্রিন্স আনজুম কদর, জনাব মাওলানা আসআদ মাদানী, চেয়ারম্যান জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ, মাওলানা সাইয়িদ মুজাফফর হোসাইন আমেলার সভাগুলোতে শরিক হয়েছেন এবং সাধারণ সমাবেশগুলোতেও বক্তৃতা করেছেন।

এ আন্দোলনের আরেকটি সুফল ছিল এরকম যে, নিজের অজ্ঞতাসারে সাধারণত সুপ্রিমকোর্টের রায়কে ন্যায়সংগত শিরোনাম দেয়া হচ্ছিল ; এমনকি এটাকে আদালতের প্রগতিশীলতা ও বাস্তববাদিতার ঐতিহাসিক নিদর্শন বলে অভিহিত করার প্রবণতাও লক্ষ্য করা গেছে। অমুসলিম ছাড়াও মুসলমানদের মধ্যেও অনেক 'প্রগতিশীল' লোক (দানিয়েল লতিফী ও দিলওয়ায়ী সম্প্রদায়ের আজাদ মুসলমান) এর পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। অথচ মুসলমান নারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এ রায়ের বিরুদ্ধে ইসলামি শরীয়তের সমর্থনে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করছিলেন, যাদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত বহু অভিজাত মহিলাও রয়েছেন। এ প্রসঙ্গে জনাব নাজমা হিবাতুল্লাহ, সহ-সভাপতি, রাজিয়া সাবা ও জমহুরিয়া হিন্দের সহ-সভাপতি ফখরুদ্দিন আলী আহমদের সহধর্মিনীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পার্সোনাল ল'বোর্ডের তৎপরতায় উদ্বুদ্ধ ও নিজেদের ঈমানী উপলব্ধি থেকে বিভিন্ন জায়গায় আধুনিক শিক্ষিতা মুসলিম মহিলাদের পৃথক পৃথক নারী সমাবেশ হয়েছে। তাদের অনেক চিঠি, অভিমত ও প্রবন্ধ উর্দু-ইংরেজি গণমাধ্যমে প্রেরিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এখানে ১০ এপ্রিল ১৯৮৬ নয়াদিল্লীর বোটকালবে অনুষ্ঠিত একটি মহিলা সমাবেশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার কয়েক ছত্র তুলে ধরা হলো।

দিল্লী বোটকালব হাউস ময়দানে ১০ এপ্রিল ১৯৮৬ এক গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম মহিলা সমাবেশ বেগম আবেদা আহমদ এমপির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে শাহবানু মামলার নিষ্পত্তিতে সুপ্রিমকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করা হয়েছে। সমাবেশে মহিলারা সর্বসম্মতভাবে ভারত সরকারের কাছে ইসলামি শরীয়তপরিপন্থী সুপ্রিমকোর্টের রায়টি বাতিল করার জন্য জোরালো দাবি জানায়।

সমাবেশটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল, এখানে সাধারণ মহিলাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আধুনিক শিক্ষিত মুসলিম মহিলারাও কেবল যোগদানই

করেনি বরং সক্রিয়ভাবে এ সমাবেশের আয়োজন সফল করার কাজেও অংশ নিয়েছে। সমাবেশের বিশাল প্যান্ডেল মহিলাদের উপস্থিতিতে কানায় কানায় ভরে যায়। গরমের মৌসুমে তীব্র তাপদাহের কষ্ট উপেক্ষা করে ধর্মীয় চেতনায় তারা উজ্জীবিত হয়েছিল। 'নারায়ে তাকবীর' ধ্বনিতে সেদিন সমাবেশস্থলের আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়।

বক্তাদের মধ্যে বেগম আবেদা আহমদ ছাড়াও বেগম জিয়াউর রহমান আনসারী, বেগম খুরশিদ আলম, বেগম সাগের নিযামীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দিল্লীর আশ-পাশ ছাড়াও মুরাদাবাদ, আলীগড়, মিরাঠ প্রভৃতি এলাকার বহুসংখ্যক মহিলা এ সমাবেশে যোগ দেন। লক্ষ্ণৌ থেকে বেগম ইশতিয়াক হোসাইন কুরাইশী, বেগম নাছিম ইকতেদার আলী অংশগ্রহণ করেন। সমাবেশের শেষে ঘোষণা করা হয়, এ সভার একটি মেমোরেন্ডাম বা স্মারকলিপি প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রেরিত হবে।[১]

ইংরেজি ও হিন্দি ভাষার কতিপয় সংবাদমাধ্যমে অগ্রহণযোগ্য বিরোধিতার ঝড়

এরূপ বিপুল জনসমর্থন ও গণদাবির বিপরীতে হিন্দি ও ইংরেজি ভাষার কিছু সংবাদমাধ্যম ইস্যুটিতে শক্ত বিরোধিতার প্রশ্নে একেবারে কাতারবদ্ধ (Opposed Tooh And Nall) হয়ে নামে। এর নজীর হয়তো ভারতবিভক্তি ও দ্বিজাতিতত্ত্বের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়নি। মিডিয়া ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর নেতৃত্বস্থানীয় অংশ এ ইস্যুতে মুসলমানদের অনুভূতিতে আঘাত করে বিলটি বাতিল করার অপচেষ্টা ইসলামি শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধানকে বিচ্ছিন্ন এবং স্বল্পসংখ্যক মানুষের (তালাকপ্রাপ্তা মুসলিম মহিলা) ক্ষেত্রে উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখেছিল। বিরোধিতার তোড়জোড় দেখে মনে হচ্ছিল যেন দেশে কোনো বহিঃশক্তির আক্রমণ আসন্ন অথবা শীঘ্রই কোনো কোনো ভূমিকম্পের আভাস পাওয়া গেছে কিংবা কোনো অগ্নিগিরি যেন বিস্ফোরিত হবে নতুবা দেশজুড়ে কোনো ব্যাপক মহামারীর সংকেত পাওয়া গেছে। এ প্রসঙ্গে দিল্লী ডায়লগ এবং ৪ মে ১৯৮৬'র সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছি, তারা এ ইস্যুতে সংবাদপত্রের বস্তুনিষ্ঠতার (Sense of Proportion) নীতিকেও শিকেয় তুলে রেখেছিল। ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারের সেই দিল্লী

---

১. এক প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা ও বেগম ইকতেদার আলীর লেখা থেকে (সাবেক চিফ ইঞ্জিনিয়র, উত্তর প্রদেশ)

সংলাপে এরূপ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আমি বলেছি, মনে হচ্ছিল সমগ্র ভারতে যেন ভয়াবহ বিপদের 'সতর্ক সংকেত' বেজে উঠেছে, যেমনটি দেশে বহিঃআক্রমণ, ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড অথবা দেশের অভ্যন্তরে মহামারী কিংবা অন্য কোনো বড় রকমের বিপদ ঘটে গেলে বাজার কথা। এটি ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তা ও মাত্রাজ্ঞান (Sense Of Proportion) যার ওপর ভর করে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনপ্রণালী বহমান তারও বরখেলাপ। সমস্যাটির ধরণ ও প্রকৃতি যেরূপ, তার সমাধানেও সেরূপ চিন্তা-ভাবনা, শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত করা এবং সে ধরনের পদক্ষেপ নেয়া জরুরি। তার পরিবর্তে একটি রায়ের 'দৈত্য' তৈরি করা সুস্থ চিন্তার ও কার্যকর ভাবনার (Practcial Wisdom) পরিচায়ক নয়।

গান্ধীজি তার উচ্চ নৈতিকতাপুষ্ট ও বুদ্ধিদীপ্ত নেতৃত্বগণকে সামনে রেখে এমন একটি ইস্যুতে (খেলাফত ইস্যু)– যা সরাসরি মুসলমানদের অভ্যন্তরীন অবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় বরং সাত-সমুদ্র তেরনদীর ওপারের বিষয় ছিল– যার কেন্দ্র ছিল দিল্লী নয় তুরস্ক– মুসলমানদের পক্ষে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে গেছেন। আমাদের দেশের নাগরিক, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মধ্যে যারা শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, বিভিন্ন দলের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ মুসলমানদের সমর্থন করতে না পারলেও কমপক্ষে নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে তাদের নীরব ভূমিকা পালন করা উচিত ছিল যাতে মুসলমানদে পারিবারিক আইন, তাদের পারিবারিক জীবন, তাদের মেয়েদের অধিকার সংরক্ষণে কোনো প্রভাব না পড়ে। এতে পুরোদেশে একটি সৌহার্দপূর্ণ ও ইতিবাচক পরিবেশ বিরাজ করতো।

মুসলমানদের পারিবারিক বিষয়ে নিস্পত্তি ও মুসলিম সমাজের নারীদের দিকে অতি উৎসাহী মনোযোগের চাইতে তাদের নিজেদের নারীসমাজের দুর্দশা-দুর্গতি বিশেষত, হাজার হাজার নতুন বিবাহিত নারীর স্বামী মারা যাবার পর সতীদাহের নামে নৃসংশতা ও সদ্যবিধবা নারীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে ধর্মের দোহাই দিয়ে তাদের হত্যাকাণ্ড, যা বিশাল ভারতে প্রতিনিয়ত কোথাও না কোথাও সংঘটিত হচ্ছে, সেদিকে অধিকতর মনোযোগ দেয়া জরুরি ছিল। ন্যাশনাল প্রেসের দেয়া তথ্যমতে, রাজধানী দিল্লীতেই প্রতি ১২ ঘণ্টায় ১ জন বিধবাকে সতীদাহের নামে জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়।[১]

---

১. অবাক বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, যেসব ইংরেজি ও হিন্দিভাষার সংবাদমাধ্যম ৬ মে ১৯৮৬ খ্রি. মুসলিম পার্সোনাল ল'-এর পক্ষে লোকসভায় পাসকৃত বিলের=

৬ এপ্রিল ১৯৮৬'র টাইমস অব ইন্ডিয়া লক্ষ্ণৌ সংস্করণে একটি মেয়েকে উদ্ধৃত করে উল্লেখ করা হয়েছে, ভারতে প্রতিবছর বেআইনিভাবে ৬৬ লাখ গর্ভপাতের ঘটনা ঘটে।[১]

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও বোঝাপড়ার চেষ্টা

ভারত-বিভাগের পর দেশজুড়ে এসব নজীরবিহীন সভা-সমাবেশ, চিঠি-স্মারকলিপি, দাবি-প্রস্তাবনা ও একটি গণতান্ত্রিক দেশের সবচেয়ে মার্জিত উপায় বিপুল গণস্বাক্ষর কর্মসূচির পর অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল'বোর্ডের সভাপতি ও সেক্রেটারী জেনারেল ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করা এবং এব্যাপারে তাকে নিশ্চিন্ত করার তাগিদ অনুভব করেন। এরই ধারাহিকতায় ২০ জুলাই ১৯৮৫ খ্রি. একটি প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করে। ওই দিন একটি স্মারকলিপিও প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে প্রতিনিধিদল সশরীরে সাক্ষাৎ করতে সক্ষম হয়। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা পরে উল্লেখ করা হবে।

=প্রতিক্রিয়ায় আকাশ মাথায় তুলেছে এবং এটাকে নারীদের ওপর বড় জুলুম হিসেবে আখ্যায়িত করেছে, তারাই সতীদাহের সেই প্রথাগত অথচ চরম অমানবিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে টু শব্দটি করার সৎ সাহস দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। সেটাই কি অধিকতর ন্যায্য ছিল না ? রাজস্থানের ১৮ বছর বয়সী সদ্যবিধবা দিলাওয়ার শেখর রূপকনৌর নামক জায়গায় প্রায় ৬ লাখ মানুষ সতীদাহের জন্যে হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্লোগান তুলেছিল– । সভ্যতার প্রবল স্রোতে কয়েকটি সংগঠনের রিট দায়ের করা সত্ত্বেও চন্দ্রিপ্রথা বাস্তবায়িত হয়েছে। রূপকনৌর বংশের লোকেরা মিছিল করে নির্ধারিত জায়গায় হাজির হয়ে গেছে। রাজপুত বংশের তরুণেরা নাঙ্গা তরবারি হাতে নিয়ে সতীর চারপাশে কুচকাওয়াজের মতো প্রদক্ষিণ করছিল। এর আগে তের দিন যাবৎ লাখ লাখ টাকার নারিকেল বেচাবিক্রি হয়েছে। যে সতীকে দাহ করা হবে তার ছবি ১০ টাকা দামে সর্বত্র ধুমছে বিক্রি হচ্ছিল। অব্যাহত ছিল দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার লোকের ঘটনাস্থল অভিমুখী জনস্রোত। খুবই পরিতাপের বিষয় হলো, দেশজুড়ে এমন ভয়াবহ অমানবিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে যেভাবে গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজ প্রভৃতির প্রতিবাদ করার কথা, তা শেষ পর্যন্ত দেখা যায়নি (সূত্র, কওমী আওয়ায, ১৮ ডিসেম্বর, লক্ষ্ণৌ)।

উল্লেখ্য, এধরনের ঘটনা এটাই কিন্তু প্রথম নয়। এর আগে এরূপ ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে এবং ইতোপূর্বেও এতে ব্যাপক অসন্তোষ ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি; যেমনটি মুসলিম নারীদের একটি ইস্যুতে (যা ইসলামি শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত একটি যৌক্তিক ব্যবস্থা) লক্ষ্য করা গেছে। এক যাত্রায় দুই ফল আর কাকে বলে !

১. কওমী আওয়ায দিল্লি, ১০ জুন, ১৯৮৪।

২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬ দিল্লীতে কর্মপরিষদ এবং অ্যাকশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৩রা ফেব্রুয়ারি অকস্মাৎ প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে আমার কাছে সাক্ষাতের একটি আমন্ত্রণ আসে। ফোনে জানানো হলো, বেশ কয়েকদিন থেকে প্রধানমন্ত্রী আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের অপেক্ষায় রয়েছেন। আপনি শীঘ্রই চলে আসুন। ইস্যুটির স্পর্শকাতরতা ভেবে আমি তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিলাম এবং এ বাস্তবতাও মাথা রেখেছি, মাওলানা মিন্নাতুল্লাহ রাহমানী বিস্তৃত অভিজ্ঞতার আলোকে বিষয়টির আদ্যোপান্ত জানেন। সেই সঙ্গে এ বিষয়ে ইসলামি আইনতত্ত্বের খুঁটিনাটি সম্পর্কেও গভীর জ্ঞান রাখেন। আমি এ সুযোগে তার সান্নিধ্য, সাহচর্য, সহযোগিতা ও পথনির্দেশনা ছাড়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোনো সাক্ষাতে মিলিত হবো না। টেলিফোনে আমার সঙ্গে মাওলানাকেও নিয়ে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করে এ ব্যাপারে আমি অনুমতি চাইলাম। তিনি জবাব দিলেন, 'এবার আপনি একা আসুন।' আমি হাজির হলাম। তখন আইনমন্ত্রী অশোক সিংহও উপস্থিত ছিলেন।

প্রাদেশিক মন্ত্রী মুহতারাম জিয়াউর রহমান আনসারী সচরাচর বাইরে আসন গ্রহণ করতেন। তাকে দেখে আমার কিছুটা স্বস্তিবোধ হলো। আমি নিজের ব্যক্তিত্বের ক্ষুদ্রতা এবং এমন জায়গায় তদবিরের ক্ষেত্রে স্বীয় অযোগ্যতার বিষয়টি ভালোভাবে অবগত ছিলাম। তাই আল্লাহর ওপর নির্ভরতা ও তার সাহায্যের আশা ব্যতীত আর কিছুই আমার ছিল না। আলহামদুলিল্লাহ! এসব চেষ্টার পেছনে আমার রাজনৈতিক ফায়দা, পদ-পদবি লাভ ইত্যাদি ছিল না। ফলে, প্রতিটি সাক্ষাতে আমি এর প্রভাব লক্ষ করেছি। আমি রাজীব গান্ধীকে বললাম, "রাজীবজী! লিপিকর্মের Script-এ যেমন একটি শর্টহ্যান্ড থাকে, তেমনি রাজনীতিরও একটি শর্টহ্যান্ড বা শর্টকাট থাকে। আর তা হলো, সমস্যাটি বড় রাজনীতিকদের হাতে যাবার আগে যাতে ইস্যুটিকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে দীর্ঘসূত্রতার দিকে ঠেলে দেওয়া না হয়– সেজন্যে যাদের সমস্যা তারা নিজেদের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে তা বুঝে নেবে। এভাবে সমস্যাটির সমাধান হয়ে যাওয়া ভালো।"

আমার মনে হলো, রাজীবগান্ধী হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন, এই লোক কোনো রাজনৈতিক কিংবা কায়েমী স্বার্থের নেতাগোছের কেউ নয়। জাতীয় বিধানসভার অধিবেশনে যখন সুপ্রিমকোর্টের (ভারতের সর্বোচ্চ আদালত) রায়টি অকার্যকর করার বিল উঠল, তখন রাজীব গান্ধী কৈফিয়তের সুরে বললেন, বিভিন্ন আইনি সীমাবদ্ধতার কারণে অর্ডিন্যান্স দেয়া যায়নি এখন বিলটি পার্লামেন্টে উত্থাপিত হবে।

৭ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আবারও সাক্ষাৎ হলো। তখন মাওলানা সাইয়িদ মিন্নাতুল্লাহও উপস্থিত ছিলেন, ওয়েটিং রুমে আগে থেকেই আইনমন্ত্রী অশোক সিংহ উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাকে দেখে বললেন, "মাওলানা! কোনে কোনো মুসলমান জজ ও আইনবিদের এরকম চিঠিও এসেছে যাতে সুপ্রিমকোর্টের রায়ের সমর্থন মেলে, তবে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আপনার সঙ্গেই আছে।" আমি নিজের সঙ্গে আমার লেখা 'মানবসভ্যতায় ইসলামের প্রভাব' বইটি নিয়ে গিয়েছিলাম। এতে নারী অধিকার বিষয়ে বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক পর্যালোচনা ও ইতিহাসের আলোকে বিশ্লেষণ রয়েছে। মি. অশোক সিংহ বইটিতে একবার নজর বুলিয়ে নিলেন। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং এসে আমাদেরকে সাক্ষাৎ কক্ষে নিয়ে গেলেন। তার নির্দেশে আইনমন্ত্রী তিন পাতার একটি খসড়া বের করে দফাভিত্তিক পড়তে শুরু করেন। সোয়া ঘণ্টার মধ্যে তা পাঠ করা শেষ হলো। এটি দেখে আমার মনে বেশ স্বস্তি একইসঙ্গে আনন্দ জাগলো যে, প্রত্যেকবার প্রধানমন্ত্রী কিছু না কিছু প্রশ্ন করেন এবং বলেন, এটা পরিবর্তন করেন ওটা পরিবর্তন করেন। এই বিলের কথাগুলো তার খুবই পছন্দ হয়েছে বলে আমার মনে হলো। এটাও মনে হলো যে, এ বিষয়ে তিনি কিছু প্রস্তুতিও নিয়ে এসেছেন। প্রত্যেক দফায় এসে তিনি আমার কাছ থেকে কিছু জিজ্ঞেস করতেন এবং আমাদের জবাব লিপিবদ্ধ করাতেন।[১]

হঠাৎ করে একদিন প্রধানমন্ত্রী ১৭-১৮ জন ব্যক্তিকে বিধানসভার একটি কক্ষে ডাকলেন, যাদের মধ্যে কয়েকজন বিজ্ঞ ও শীর্ষস্থানীয় মুসলিম নেতা এবং পার্লামেন্ট মেম্বারও ছিলেন। জনাব ইবরাহিম সুলাইমান শেঠ আমাকে বলেছিলেন যে, রাজীব গান্ধীকে বলা হচ্ছিল, এ বিল উত্থাপন ও পাস হওয়ার আগে বিভিন্ন মুসলিম দেশের অনুসৃত নীতিমালা সম্পর্কে অবগত হওয়া দরকার– তারা নিজেদের দেশে মুসলিম পারিবারিক আইনে কোনো পরিবর্তন এনেছেন কিনা? যদি তারা পরিবর্তন করে থাকেন, তাহলে একটি সেক্যুলার দেশে এটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন নেই। আমি ভাবলাম, যদি তিনি এ পরামর্শ গ্রহণ করে, তাহলে সমস্যা বেশ জটিল আকার ধারণ করবে। আল্লাহ আমার অন্তরে একটি কথা ঢেলে দিলেন এবং সে অনুযায়ী গৃহীত পদক্ষেপ ঠিক লক্ষ্যবস্তু ভেদ করলো। আমরা যখন একত্র হলাম, তিনি ঠিক আমাদের সামনেই বসেছিলেন।

---

১. তথ্যসূত্র ও উদ্ধৃতি : মাওলানা মিন্নাতুল্লাহ রাহমানী (রহ.)

আমি বললাম, জনাব রাজীব গান্ধী! আপনাকে যদি কেউ বলেন যে, পৃথিবীতে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রতো আছে; সেখান থেকে জানা দরকার তারা নিজেদের দেশে মুসলিম পারিবারিক আইনে (Personal Law) কোনো পরিবর্তন এনেছেন কিনা? তখন আপনি সেটি অনুসরণ করতে পারেন। এ ধরনের পরামর্শ আপনার একেবারেই গ্রহণ করা উচিত হবে না। আমরা যদি একবার তার নাকচ করি, আপনার তা চারবার নাকচ করা উচিত। কারণ, আপনি তৃতীয় প্রজন্মের শাসক, ভারতের রাষ্ট্রীয় নির্দেশনার যে ঐতিহ্য (ভারতীয় মুসলমানদের জন্য যা প্রযোজ্য) রয়েছে, তা অনেক মুসলিম কিংবা আরব দেশের চাইতে কোনো অংশে কম নয়। ভারতের মুসলমানদের একটি স্বাতন্ত্র্য আছে। আমার না বলা উচিত ছিলো তবুও বলছি, মুসলিম বিশ্বের সর্বোচ্চ ইসলামি আইনবিদদের যে সংস্থা, সেটি হলো– মক্কার রাবেতা আলমে ইসলামীর ফিক্‌হ অ্যাকাডেমি, ভারতের সে সংস্থার আমিই একমাত্র সদস্য। সেখানে বিভিন্ন সময়ে কোনো ইস্যুর আলোচনায় এরকম পরিস্থিতি হয়েছে যে, সকল পণ্ডিত একদিকে আর আমি অন্যদিকে। শেষে সিদ্ধান্ত আমার মতানুসারেই হয়েছে। মিসরের পৃথিবীবিখ্যাত জামিউল আযহারে এমনসব ইসলামি আইনবিদ ও আলিম উপস্থিত আছেন, যাদের নাম উচ্চারণ করা হলে মানুষ সম্মানার্থে মাথা ঝুঁকিয়ে দেবে।

এ বক্তব্যের স্বাভাবিক প্রভাব যা হবার তাই হয়েছে; রাজীব গান্ধী অন্যকোনো মুসলিম দেশের উদাহরণ টানতে যাননি। রাজীব গান্ধীর ইশারায় একদিন মিসেস নাজমা হেবাতুল্লাহ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে লক্ষ্ণৌ এলেন যাতে এ ইস্যুসম্পৃক্ত বিভিন্ন প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিতে পারেন। সেদিনের আলোচনায় মাওলানা মিন্নাতুল্লাহও অংশ নিয়েছিলেন। তখন আলোচনায় এটাও উঠে এসেছিল যে, আইনমন্ত্রী সংশোধিত আইনের খসড়া তৈরি করবেন এবং আমরা আরও একবার সাক্ষাৎ করবো। আমি আগ্রহ দেখালাম, পরবর্তী সাক্ষাতে আমরা নিজেদের সঙ্গে একজন আইনবিশেষজ্ঞ আনতে চাই। বিষয়টি বিবেচিত হলো।

১৮ অক্টোবর সন্ধ্যা সোয়া সাতটায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আমাদের পরবর্তী সাক্ষাৎ হলো। ওয়াকফ বোর্ড সেক্রেটারী রহিম কুরাইশিও সঙ্গে ছিলেন। আমরা বিলের খসড়া দ্বিতীয়বার শুনলাম এবং একমত পোষণ করলাম। প্রধানমন্ত্রীর ইঙ্গিতে মিসেস নাজমা হেবাতুল্লাহর সিনিয়র সহকারী মিসেস রাজিয়া সাবার বাসভবনে বিধানসভার মুসলিম সদস্যদের বিশেষ কয়েকজন, আইনমন্ত্রী মি. অশোক সিংহ, প্রাদেশিক আইন প্রতিমন্ত্রী বরদোভাজসহ আমরা একত্র হই এবং প্রস্তাবিত বিলের বাস্তবায়নে সম্ভাব্য

সমস্যাবলি নিয়ে পর্যালোচনা হলো। তন্মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিলো, যদি তালাকপ্রাপ্তা নারীর রক্তসম্পর্কীয় কেউ বেঁচে না থাকে– যে তার খোঁজখবর নিতে পারে– তাহলে তার দেখভালের ব্যবস্থাপনা কীভাবে হবে? আমরা বললাম, সে ক্ষেত্রে তার দেখভালের দায়িত্ব প্রাদেশিক মুসলিম ওয়াক্ফ বোর্ড পালন করতে পারে। তিনি এতে সন্তুষ্ট হলেন।

একটি নাজুক পর্যায়!

বিলটি বিধানসভায় উত্থাপিত হওয়ার পর তার উপর আলোচনা হবে– এমন সময়ের মাঝামাঝি একটি ঘটনা ঘটে যায়। বিল পার্লামেন্টে উত্থাপিত হবার পর বিরোধীরা একটি আইনি সমস্যা সামনে নিয়ে এলেন। আর বিচারপতি আইআর পরিষ্কার বললেন, "এ বিল সুপ্রিমকোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হবে এবং যেহেতু বিলটি সংবিধানের ১৪ ও ১৫ ধারার সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং সংবিধানে প্রদত্ত ব্যক্তিস্বাধীনতা (নাগরিকদের যে কেউ যেকোনো ধর্ম ও সংস্কৃতি অনুসরণের অধিকার রাখে)-এর সঙ্গে বৈপরীত্যপূর্ণ, সেহেতু সুপ্রিমকোর্ট এ বলে বিলটি যেকোনো অবস্থাতেই খারিজ করে দেবে যে, ভারতের সংবিধানের বিপরীত প্রণীত যেকোনো আইন বাতিল করে দেয়া সুপ্রিমকোর্টের দায়িত্ব।"

এমতাবস্থায় বিলটিতে আরেকটি দফা সংযোজন করা হলো। সংযোজিত দফাটি ছিলো এরকম– কোনো হতভাগ্য তালাকপ্রাপ্তা যদি এ আইনে সন্তুষ্ট না থাকতে পারে এবং ইসলামি আইন-মোতাবেক ভরণপোষণ নিতে সম্মত না হয় এবং সে ১২৫ নং ধারামতে ভরণপোষণ নিতে আগ্রহী হয়, তাহলে সে নিজের ইচ্ছে বা পছন্দ অনুযায়ী আপিল করতে পারবে এবং ম্যাজিস্ট্রেট ১২৫ ধারামতেই তার রায় দেবেন। সংশোধনীতে এও বলা হয়েছে যে, কেবল তালাকপ্রাপ্তার আপিল আর ১২৫ ধারা অনুযায়ী নিষ্পত্তি চাওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং তালাকপ্রাপ্তা ও তার সাবেক স্বামী উভয়কে এ বিষয়ে একমত হতে হবে এবং উভয়ের সম্মিলিত আবেদনের পরই এ প্রক্রিয়া চলতে পারে। অধিকন্তু, উভয়ের এ দাবি হলফনামার মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। যদি কেবল তালাকপ্রাপ্ত এককভাবে আপিল করে, তাহলে আলোচ্য আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হবে; ১২৫ ধারামতে নয়। এ-শর্তও যুক্ত করা হয় যে, এরূপ আপিল সম্মতির আবেদনটি মামলার শুনানীর আগের দিনই হতে হবে নইলে তা গ্রাহ্য হবে না।

এসব কথা হচ্ছিল ১৫ এপ্রিল। আমাদের অনুমান ছিল, কোনো সূক্ষ্ম বুদ্ধির চৌকস প্রতিপক্ষ আইনমন্ত্রী অথবা রাজীব গান্ধীর কোনো উপদেষ্টা

বুঝিয়েছেন, আমরা যদি এটাকে এ কৌশলে বাতিল করে দিতে পারি, তাহলে এ প্রক্রিয়া যেখান থেকে শুরু হয়েছিল আবারও সে পর্যন্ত পিছিয়ে যেতে পারে। আর আসন্ন উত্থাপনের অপেক্ষায় থাকা বিলটি হয়তো হিমাগারে নয়তো কমপক্ষে মুলতবি হয়ে যাবে। রাজীব গান্ধীর উপদেষ্টা এটাও ইশারা করলেন, আপনারা যদি উক্ত সংশোধনী অনুমোদন করেন, তাহলে খোদ সরকার আইনটির সুরক্ষার ব্যাপারে পদক্ষেপ নেবে। আমরা ভেবেচিন্তে দুটি শর্ত জুড়ে দিলাম যাতে ১২৫ নম্বর ধারার পায়ে শেঁকল পরানো যায় এবং বাস্তব অর্থে ধারাটিকে অকার্যকর করে দেয়া যায়। ১২৫ নম্বর ধারামতে স্বামীর ওপর তালাকপ্রাপ্তার দ্বিতীয় বিয়ে পর্যন্ত অথবা আমৃত্যু ভরণপোষণ দেবার বাধ্যবাধকতা আছে। এমন কোনো বোকা স্বামী তো পাওয়া যাবে না যে ১২৫ ধারামতে নিষ্পত্তি চাইবে এবং তালাকপ্রাপ্তার আপিলে সম্মতি প্রদান করবে।

অন্যদিকে, যার মধ্যে আল্লাহভীতির লেশমাত্র নেই, কেবল তেমন লোকের পক্ষেই ইসলামি শরীয়ত ভরণপোষণের এরূপ বিধানকে অগ্রাধিকার দেয়া সম্ভব, যে আইনে তালাকপ্রাপ্ত মহিলার খোরপোষ কেবল স্বামীর আর্থিক সচ্ছলতা ও জীবিত থাকার ওপর নির্ভর করে। যদি তালাকদাতা স্বামী অসচ্ছল হয় কিংবা বেঁচে না থাকে, তাহলে সে মহিলার দুর্ভোগ ও আর দুর্গতি ছাড়া উপায়ান্তর থাকবে না।

আমি মাওলানা মিন্নাতুল্লাহকে বললাম, যেহেতু এ সংশোধনী মেনে নেয়ার বিষয়টি এতই স্পর্শকাতর যে, বিরুদ্ধবাদীরা তো বটেই আমাদের সমমনা বা সমর্থকরাও দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যাবে। তাই এটি গ্রহণ কিংবা নাকচের বিষয়টি সকলের উপস্থিতি ও সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমে হওয়া সমীচীন হবে। তিনি আমার সঙ্গে সহমত পোষণ করলেন এবং কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে যোগাযোগ করে তাদেরকে আমাদের বিশ্রামের বর্তমান অবস্থানের কাছে মাওলানা কারামতুল্লাহ সাহেবের ৩ ওয়েস্ট নিজামুদ্দিন-এ উপস্থিত হতে আমন্ত্রণ জানালেন। এটি আল্লাহর বিশেষ রহমত যে, এতো সংক্ষিপ্ত নোটিশে দুয়েকজন ছাড়া প্রায় সকল সদস্য উপস্থিত হয়ে ছিলেন। তারিখটি ছিলো ২১ এপ্রিল ১৯৮৬।

এ সভায় লক্ষ্ণৌ, হায়দারাবাদ, মুম্বাই, নাগপুর অঞ্চলের সদস্যরাও ছিলেন। মাওলানা সাইয়িদ কালব আবেদ লক্ষ্ণৌ থেকে, শাব্বির ভাই, নুরুদ্দিন, ইউসুফ হাতেম মুচালা মুম্বাই থেকে, রহিম কুরাইশি হায়দারাবাদ থেকে, মাওলানা আবদুল করিম পারেক নাগপুর থেকে আর সদস্যগণ তো

দিল্লীতেই ছিলেন। বিষয়টি তাদের সামনে উত্থাপনের পর সবার আগে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের সেক্রেটারী জনাব মাহমুদ নাবাতওয়ালা (যিনি সুপ্রিমকোর্টের সেই রায়ের বিরুদ্ধে সর্বাধিক সোচ্চার ছিলেন এবং (তিনি এ বিষয়ের খুঁটিনাটি সম্পর্কে অনেক মুসলিম পণ্ডিত ও আইনজীবীর চাইতেও তিনি বেশি জানতেন)। সংশোধনীর বর্ণনা শুনে বললেন, "এটা অনুমোদন করা আমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আর যে ধারাটি কোনো না কোনো সময় তারা ব্যবহার করবেনই– এটি অনুমোদন করা ভালো হবে।" এরপর কিছুক্ষণ আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে সকল সদস্য একমত হয়ে গেলেন। সকলে মত দিলেন যে, এ সংশোধনী অনুমোদন করলে কোনো অসুবিধা নেই। পরে সরকারি সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের জানিয়ে দেয়া হলো, আমাদের পক্ষ থেকে আপত্তি নেই। এ রাতেই বোর্ডের কয়েকজন বিজ্ঞ আইনবিদ, সদস্য ও সংসদ সদস্য মিলে কিছু ভাষাগত সংশোধনী পেশ করেন। আমি এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ ড্রাফট ও টাইপ করিয়ে পরের দিন রাজীব গান্ধীর কাছে নিজেই পেশ করি এবং অনুরোধ করি, যাতে ড্রাফট-এর আলোকে বিলটি আরো সুসংহত ও সুবিন্যস্তভাবে উত্থাপন করা হোক। পরে বুঝতে পারলাম, তাড়াহুড়োর কারণে এটি সম্ভব হয়নি।

বাবরি মসজিদ

এখানে এ কথাটির আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, এসময়েই বাবরি মসজিদের ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল। আমি আমাদের আলোচ্য বিষয়টির শেষ পর্যায়ে বাবরি মসজিদ ইস্যুর দিকে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। প্রধানমন্ত্রী শ্রী এন.ডি তেওয়ারীকে বললেন– যিনি তখন ওই বৈঠকেই উপস্থিত ছিলেন– "আপনারা দু'জন ফোতাদার সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করুন।" আমরা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম; তিনি সরকারি প্রজ্ঞাপনের বরাত দিয়ে বললেন, সরকারি তরফে সহসা একটি নির্দেশনা জারি করা হবে যে, সত্য কোনটি সে সিদ্ধান্ত আদালতের মাধ্যমেই চূড়ান্ত হবে। এই মর্মে ঘোষণা খুব শীঘ্রই প্রচারিত হবে যে, ধর্মীয় স্থানগুলো যে অবস্থায় আছে সে অবস্থাতেই থাকবে; কোনো ধর্মীয় জনগোষ্ঠী এসব স্থাপনায় জবরদস্তিমূলক কোনো পরিবর্তন করতে পারবে না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, এ ঘোষণা– যা অনৈক্য নৈরাজ্যের উৎসমুখ বন্ধ করতে পারতো– তা আর বাস্তবতার আলো দেখেনি।

সংসদীয় বিলের পক্ষে রাজীব গান্ধীর ভাষণ

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী সংসদে কংগ্রেসের সভায় বললেন, "সাধারণভাবে মুসলিম নারীদের অধিকার সংরক্ষণ ইস্যুতে আহুত হলেও আজ লোকসভায় যে বিলটি উত্থাপিত হতে যাচ্ছে, এর পরিধি অনেক বিস্তৃত। এতে মুসলিম নারীদের জন্য সাধারণভাবে অধিকতর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা এবং বিশেষ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে।"

প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে একই ধরনের সিভিল কোডের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন কিন্তু এটাও বলেছেন, সকল নাগরিকের জন্য একই ধরনের সিভিল কোড অনেক সময় বিশেষত এমন দেশ (ভারত)– যেদেশে বহু ধর্মাবলম্বী লোকজনের অধিবাস সর্বজনীনভাবে কল্যাণকর ও সহনীয় নাও হতে পারে। সংবাদমাধ্যমকে সভার বিফ্রিং দিতে গিয়ে কংগ্রেসের (আই) সংসদীয় দলের সেক্রেটারী তেওয়ারী বলেন, "প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ফৌজদারী আইনের ২৫-২৭ ধারার বিপরীতে নতুন বিলের আলোকে মুসলিম নারীদের তালাক সম্পর্কিত মামলার নিষ্পত্তি কেবল ৩০ দিনের মধ্যে হয়ে যাবে। এখন একজন মুসলিম মহিলা তার প্রাপ্য সুবিধা আদায়ে যথেষ্ট আইনি সহায়তা পাবে। অথচ এর আগে উক্ত দুটি ধারামতে যে সহায়তা প্রদান করা হতো, সেটি ছিল অস্থায়ীভাবে। যে পর্যন্ত মুসলিম পারিবারিক আইনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সিদ্ধান্ত প্রদান না করতো, সে পর্যন্ত বিষয়টি ঝুলেই থাকতো। এখন সেই দীর্ঘসূত্রতারও অবসান ঘটবে।"

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "আগের বিধানের বিপরীতে বর্তমান বিলে বিধান সকল মুসলিম তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য প্রযোজ্য হবে এবং এ বিলের আলোকে পাস হওয়া আইন কোনোক্রমেই তাদের অধিকারকে খর্ব করবে না। গৃহীত নতুন পদক্ষেপটি তাদেরকে আগের চেয়ে বেশি সুরক্ষা এবং বিশেষভাবে স্বস্তি দেবে।"[১]

মাদ্রাজের পাক্ষিক গবেষণামূলক পত্রিকা 'তুঘলক'-এর সম্পাদক চুরান স্বামীকে ১৯৮৬ সালের জানুয়ারিতে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "নারীর রক্ষাকবচ হিসেবে ইসলামের আইন আমাদের আইনের চাইতে সুনিশ্চিতভাবেই বেশি সহায়ক।" তিনি বলেন, "মুসলিম বিশেষজ্ঞ, আইনবিদ, শিক্ষাবিদ, আলিম ও আধুনিক শিক্ষিতদের মতবিনিময়ের পর আমার উপলব্ধি হয়েছে, মুসলিম পারিবারিক আইনের আওতায় (মুসলিম পার্সোনাল ল') নারী অধিকারের পর্যাপ্ত নিশ্চয়তা দেয়া সম্ভব।" তিনি আরও

---

১. কওমী আওয়াজ (সংবাদপত্র) লক্ষ্ণৌ, মার্চ ১৯৮৬

বলেন, "মুসলমানরা মনে করেন, বিচারিক আদালতগুলো মুসলিম পারিবারিক আইনের ভুল ব্যাখ্যা করছে। আদালত যদি ইসলামি আইনের সঠিক ব্যাখ্যা দেয়, তবে তাদের কোনো আপত্তি থাকবে না।"[১]

পার্লামেন্টে বিল পাস

বিলটি সংসদে পাস হবার সময় যতই ঘনিয়ে আসছিল, ইংরেজি ও হিন্দিভাষার সংবাদমাধ্যম আর হিন্দুত্ববাদী বিভিন্ন সংগঠনগুলোর বিরোধিতা ততই তীব্র হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, ভারতে যেন একটি ভূমিকম্প চলছে। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী স্থির করে রেখেছিলেন যে, এ বিল লোকসভায় পাস হতেই হবে। ২৭ ফেব্রুয়ারি তিনি ঘোষণা দিলেন, "এ বিল পার্লামেন্টে উত্থাপিত হবেই এবং পাসও করা হবে।" ইংরেজি সংবাদপত্রগুলোর ২৮ ফেব্রুয়ারির মন্তব্যধর্মী রিপোর্টটি ছিল এরকম :

Govt. Determind To Pass Muslim Women Bill. P.M.

প্রধানমন্ত্রী দলের সকল স্তরে নির্দেশ জারি করেছেন যে, প্রত্যেক নেতাকর্মীকে এর পক্ষে তৎপর হতে হবে। এমনকি এ বিলের বিরোধিতা করলে দল থেকে বহিষ্কার করবেন মর্মেও হুমকি দিয়েছেন। ৫ মে ১৯৮৬ বিলটি লোকসভায় উত্থাপিত হয়। ৫ ও ৬ মে'র মধ্যবর্তী রাতটি মুসলমানদের জন্য এক অন্যরকম উত্তেজনাকর রাত ছিল। ঘরে ঘরে দোয়া ও পবিত্র কুরআনের খতম চলছিল।

কারণ, এটি ছিল পুরো জাতির মর্যাদার প্রশ্ন। মুসলমানরা এদেশে পারিবারিক জীবনে নিজেদের ধর্মীয় বিধান (যা স্বতন্ত্র একটি ইবাদত এবং অসংখ্য ইবাদতের মূল) স্বাধীনভাবে পালন করতে পারবে কি পারবে না সে প্রশ্নের মীমাংসা হবার ইস্যু। তারা নিজেদের বিয়ে, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পত্তি ইসলামি শরীয়ত মোতাবেক বণ্টন ইত্যাদি সমাধা করতে পারকে কি পারবে না সে জিজ্ঞাসার নিষ্পত্তি হবার বিষয়। আমি এবং মাওলানা মিন্নাতুল্লাহ সেদিন দিল্লীতেই অবস্থান করছিলাম। দিল্লীর একটি সংবাদপত্র অধিবেশনের প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য উপস্থাপন করেছে। এখানে প্রতিবেদনটির সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হলো যাতে এ ইস্যুতে সাধারণ মানুষের মনোভাব প্রতিফলিত হয়।

কংগ্রেস এ বিলের সমর্থনে কাজ করার জন্য দলের সকল কর্মীকে নির্দেশ দেয়। তাই আজ সংসদে অন্য যেকোনো সময়ের চাইতে কংগ্রেস সদস্যদের

---

১. ত্রি-দৈনিক দাওয়াত, দিল্লি, ২৫ জানুয়ারি ১৯৮৬

ব্যাপক ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিরোধীদলগুলোর সদস্যদের তুলনামূলক বেশি সংখ্যায় উপস্থিতি নজরে পড়ছে; কারণ, বিলটির বিরোধিতা করার যেন তাদের 'ঈমানী দায়িত্ব' হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষভাবে তৈরি প্রায় দশটি জায়গায় নিরাপত্তাকর্মীদের দেখিয়ে এমন এক বিশাল জমায়েতের জন্য লোকজন এসেছে যেখানে ভারতের ভাগ্যনির্মাণ ও উন্নয়নের সিদ্ধান্ত হয়।

১২.৩৫ মিনিট। আইনমন্ত্রী মি. অশোক সিংহ যেইমাত্র এ ঐতিহাসিক বিলটি উত্থাপনের জন্য দাঁড়ালেন, সঙ্গে সঙ্গে বিরোধীদলীয় সংদস্যরা এক তুমুল হাঙ্গামা শুরু করে দিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা যে উত্তপ্ত বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন, লোকসভার স্পিকার জনাব বলরাম জাকড়া বিরোধীদলের ও তাদের পারস্পরিক প্রশ্নোত্তর-লড়াইয়ের প্রতিটি তীর খুবই বলিষ্ঠতা ও মুনশিয়ানার সঙ্গে তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। বিরোধীদল উপর্যুপরি পয়েন্ট অব অর্ডার (সংসদীয় প্রশ্ন উত্থাপনের ফ্লোর) তুলছিল আর স্পিকার তা বরাবরই বাতিল করে দিচ্ছিলেন। মোটকথা, বিরোধীদল বিলটি নাকচ করার জন্য সাধ্যমত সব রকম চেষ্টা চালিয়েও স্পিকারের জোরালো অবস্থানের কাছে শেষমেষ হার মানতে বাধ্য হয়েছে। বিরোধীদের 'শরম শরম' স্লোগান উপেক্ষা করে আইনমন্ত্রী বিলটি লোকসভায় উত্থাপন করলেন। তিনি নিজের বক্তৃতায় বিলটির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করলেন। বিলটি উত্থাপনের প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরলেন। তিনি বলেছেন, সরকার দেশের সবচেয়ে বৃহৎ সংখ্যালঘু ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর চেতনা, ধর্মীয় অনুভূতিকে অবজ্ঞা করতে পারে না। কয়েকটি মুসলিম দেশ ছাড়া অধিকাংশ মুসলিম দেশে এ ধরনের আইন প্রচলিত আছে। বর্তমান বিলটি সেই রূপরেখার আলোকে তৈরি করা হয়েছে। মি. সিংহ এ বিলের জন্য প্রতিরক্ষামূলক যে ভূমিকা পেশ করেছেন, তা বেশ চমৎকার। তবে আমার কাছে যেটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে, তা হলো, তিনি ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা ১৪ কোটি উল্লেখ করে বলেন, এত বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় চেতনাকে উপেক্ষা করা কোনো বিবেচনায় সমীচীন নয়। আমার জানামতে, ইতোপূর্বে প্রত্যেকবার সরকারিভাবে মুসলমানদের সংখ্যা ১০/১১ কোটি উল্লেখ করা হয়।

ঠিক এক ঘণ্টা পরে লোকসভার অধিবেশন পুনরায় শুরু হয়। তেলেগু দেশম পার্টির সংসদীয় দলের নেতা এইচ এ দোভরার বক্তৃতার মধ্য দিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম আরম্ভ হলো। তিনি বিলের বিরোধিতা করতে গিয়ে বলেন, "এটি বিল নয় বরং এটি একটি ষাঁড় (Bull), যা মুসলমানদের নারী-

শিশুদের দুমড়ে মুচড়ে ফেলবে।" তিনি বলেন, "পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ায় ভরণপোষণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আইনে বিস্তারিত সংশোধনী আনা হয়েছে।" তার মতে বিলটি শুধু মুসলমান তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের অধিকারেই নয় বরং তাদের পারিবারিক আইনেও অসংগত হস্তক্ষেপ করবে। বিলের পক্ষে বক্তব্য রাখার জন্য দাঁড়িয়ে কংগ্রেসের এডওয়ার্ড ফেলরু বলেন, "বিরোধীদল এ বিলের ব্যাপারে ভুল ধারণা এবং বিভ্রান্তির শিকার। এ বিষয়ে তাদের অজ্ঞতাই এ জন্য দায়ী।" তিনি প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, "এত অল্প সময়ের এ ধরনের একটি জনগুরুত্বপূর্ণ বিল সংসদে উত্থাপনের জন্য তিনি বিপুল অভিনন্দিত হবার যোগ্য।" সেই সঙ্গে তিনি আরও বলেন, "আশা করছি, আজকের আলোচনা শেষ হবার আগেই বিরোধীদলের বিবেকের বদ্ধ দুয়ার খুলে যাবে এবং তারাও বিলটির পক্ষে সমর্থন জানাবেন।" এ পরিপ্রেক্ষিতে আসাম গণপরিষদের দিনেশ গোস্বামী তাকে একহাত নিলেন। তিনি পাল্টা বক্তব্যে বললেন, "বিরোধীদলের বিবেকের দরোজা আগে থেকেই খোলা আছে। কাজেই কংগ্রেসীদের উচিৎ নিজেদের বিবেকের রুদ্ধদ্বার খোলার ব্যবস্থা করা।" এরপর কংগ্রেসের পার্টি সদস্য প্রফেসর তেওয়ারী ও বিরোধীদলের মাঝে তুমুল বিতর্ক হয়।

পরে আবারও প্রফেসর তেওয়ারী তার অসমাপ্ত বক্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি বিলটির পক্ষে বক্তৃতার এক পর্যায়ে বলেন, "বিরোধীদলের কথিত জ্ঞানী ও মিডিয়া এ বিলের বিরোধিতার জন্য এক অলিখিত সমঝোতায় উপনীত হয়েছে। ইতোপূর্বে দেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ভিন্ন সাম্প্রদায়িক অবস্থান থেকে এমন একাট্টা হতে দেখা যায়নি। বস্তুত এটি (জাতীয় সংহতি নয়) রাষ্ট্রের অখণ্ডতাকে বিনষ্টের অভিসন্ধি।" এরপর যার বক্তব্য পুরো লোকসভা পিনপতন নীরবতা ও গভীর অভিনিবেশে শুনেছে, তিনি হলেন মিস্টার পান্থ। তিনি বলেন, "আসল সমস্যা এটি নয় যে, আমরা বিলটিকে সঠিক না ভুল বলে মনে করি; বরং মুখ্য বিষয় হলো, মুসলিম সম্প্রদায় বিলটিকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখছে। আমাদের বুঝেশুনে চলা উচিত। মুসলিম পার্সোনাল ল' এর সম্পর্ক তো মুসলমানদের ধর্মের সঙ্গে। আমাদের উচিৎ বিষয়টি তাদের দৃষ্টিকোণে দেখা। আমরা এদেশে সেক্যুলারিজম ও গণতন্ত্র চর্চা করছি; কাজেই প্রত্যেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে এটা আশ্বস্ত করা যে, এদেশে তারা নির্বিঘ্নে তাদের নিজেদের জীবনব্যবস্থা অনুসারে ধর্মীয় বিধান ও আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে পারবে– "এটা আমাদের জন্য জরুরি এবং নৈতিক দায়িত্ব। যেকোনো ধর্মের সংস্কারের

আওয়াজটি তাদের ভেতর থেকে উঠতে হবে। হিন্দুসমাজ নিজেদের মধ্যে অনেক কিছুই সংস্কার করেছে। আমরা অন্যান্য সমাজের কাছেও এটি আশা করি তবে এটি অবশ্যই তাদের ব্যাপক সম্মতিতেই হতে হবে, বাইরে থেকে চাপিয়ে দেবার সুযোগ নেই।"

১১ ঘন্টা উত্তপ্ত বিতর্কের পর বিলটি ভোটাভুটির জন্য পেশ করা হয় এবং বিপুল ভোটে পাস হয়। দলের পক্ষ থেকে নির্দেশ জারির ফলে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে তো বিরোধিতার অবকাশই ছিল না তবে ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর সাইফুদ্দিন সুজা যখন আরিফ মুহাম্মদ খাঁনের[১] নাম উল্লেখ করে এ বিল সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ করেন, তখন আরিফ মুহাম্মদ খাঁন তা বরদাশত করতে পারেননি। তিনি বক্তৃতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন যে, তিনি এখনও এ বিলের বিপক্ষে এবং বিলটিকে তিনি ইসলাম-পরিপন্থী মনে করেন। কিন্তু যেহেতু দলের নির্দেশ আছে তাই তিনি নিজের ভোট বিলের পক্ষেই দেবেন।

রাত ১২টায় প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী লোকসভায় তার আসন গ্রহণ করেন। এর আগেই লোকসভা পুরোপুরি ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। তার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যেন পার্লামেন্ট কক্ষে যেন বিদ্যুৎ চমকালো। সবাইকে বেশ উৎসাহী ও কৌতুহলী মনে হলো। আইনমন্ত্রী আরো একবার দাঁড়ালেন এবং তিনি এ বিষয়ে আলোচনার উপসংহার টেনে দেয়ার জন্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরলেন, যার পরে কেবল ভোটাভুটির পর্যায়টি বাকি থাকে। মি. সিংহ উপসংহার হিসেবে বলেন, "বিলটি উত্থাপিত হওয়া ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে খুবই জরুরি। কারণ, ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যাই তো হলো বিভিন্ন ধর্ম ও নানা সংস্কৃতির অস্তিত্বকে মেনে নেয়া।"

রাত অতিবাহিত হচ্ছিল আর বিরোধীদের আক্রমণ ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছিল। রাত ১/২ টার দিকে বিলটির বিষয়ে সংশোধনী আসতে শুরু করলো। ভোটাভুটিতে সেই সংশোধনী বাতিল হচ্ছিল। কেবল সরকারি তরফে উত্থাপিত একটি সংশোধনী গৃহীত হলো এবং তা হলো, যদি উভয় পক্ষ চায় যে, তাদের নিষ্পত্তি সিভিল কোডের ধারা ২৫ মোতাবেক হোক তখন উভয়কে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে। এমতাবস্থায়, তাদেরকে এ বিলের আলোকে পাসকৃত আইনের আওতামুক্ত

---

১. তিনি এ বিলের পক্ষ অবস্থান নেবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর ইঙ্গিতে ধর্মনিরপেক্ষ মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দেন।

রাখা যাবে। বিরোধীদল নতুন নতুন সংশোধনী পেশ করে যাচ্ছিল, যার উদ্দেশ্য হলো হয়তো বিলটিকে পার্লামেন্টে যাচাই-বাছাইয়ের জন্য যে ওয়েটিং কমিটি রয়েছে তাদের কাছে ছেড়ে দেয়া হবে, নতুন জনমত যাচাইয়ের জন্য গণভোট ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হবে। মোদ্দাকথা, বিলটি পাস হওয়াকে বাধাগ্রস্ত করা। রাত পৌনে ৩টায় বিলটির ওপর ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হলো। বিলের বিপক্ষে দেয়া ৫৪ ভোটের বিপরীতে বিলের পক্ষে ভোট পড়ে ৩৭২টি। বিল হয়ে যাওয়া কংগ্রেস সদস্যরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। অন্যদিকে, বিলটির পাস হওয়া ঠেকাতে না পেরে বিরোধীরা অধিবেশন কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়।[১]

এ প্রসঙ্গে কিছু ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে ধন্যবাদ না জানানো হলে অসৌজন্য হবে। যারা পার্লামেন্টের ভেতরে-বাইরে মুসলমানদের দাবি ও চেতনাকে যথাযথভাবে তুলে ধরার জন্য বিলটির পক্ষে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন, তাদের মধ্যে সরকারের অন্যতম দায়িত্বশীল ব্যক্তি জিয়াউর রহমান আনসারী ও সংসদ সদস্যদের মধ্যে মাহমুদ বানাতওয়ালা জাতির পক্ষ থেকে সবিশেষ কৃতজ্ঞতা পাওয়ার দাবি রাখে। বানাতওয়ালা সাহেব বিলটিকে নিয়ে সংসদীয় কমিটি টানাহেঁচড়া ঠেকানো এবং পার্লামেন্টারী বোর্ডের সঙ্গে সময়ের দেয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর ও ইতিবাচক অবদান রেখেছেন। মহিলাদের মধ্যে মুহতারামা নাজমা হেবাতুল্লাহ, বেগম ফখরুদ্দিন আলী আহমদসহ আরও কতিপয় উচ্চশিক্ষিত মহিলা দ্বীনি ইস্যুতে নিজেদের দায়িত্ববোধ ও ধর্মীয় অনুরাগের স্বাক্ষর রেখেছেন। এর দ্বারা পাশাপাশি এটিও প্রমাণিত হয়েছে যে, বিলটি পাস হওয়ার মধ্যদিয়ে কেবল পুরুষ শ্রেণী নয়, উচ্চশিক্ষিতা মহিলারাও ইসলামি আইনে পুরোপুরি স্বস্তিবোধ করেন এবং এ বিধানের পূর্ণাঙ্গতা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রবক্তা। এ প্রসঙ্গে দিল্লীতে আমি যার আতিথেয়তা গ্রহণ করেছি, সেই মাওলানা কারামাতুল্লাহ ও তার ছেলে সালামতুল্লাহর কথা উল্লেখ না করলেই নয়। সরকারি দায়িত্বশীলবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে তিনি মূল্যবান সহযোগিতা দিয়েছেন। তাদের সহযোগিতায় ওখানে অবস্থা ও যোগাযোগ দুটোই সহজ হয়েছে।

বিলটি পাস হওয়ায় ভারতজুড়ে তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ মুসলমানরা ব্যাপক আনন্দ উদযাপন করেছে। এর ফলে মুসলমানদের ঐক্য-সংহতি, স্বীয় নেতৃত্বের প্রতি আস্থা, গঠনমূলক ও ইতিবাচক কর্মপদ্ধতির প্রতি আগ্রহ

---

১. সাপ্তাহিক আখবারে নও, ১৬-২২ মে, ১৯৮৬

সৃষ্টির পাশাপাশি পারস্পরিক বোঝাপড়া ও নিয়মতান্ত্রিক তৎপরতার সফলতার একটি দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। 'আজ আল্লাহর সহায়তায় মুমিনগণ আনন্দিত'- এর প্রকাশ ঘটে।

রাজীব গান্ধীর নামে লেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি

আমি চিন্তা করলাম, মুসলিম পারিবারিক আইনটি বিলটি পাসের কর্মতৎপরতার সুবাদে রাজীব গান্ধীর সঙ্গে যেভাবে একাধিকবার খোলামেলা সাক্ষাৎ হয়েছে। ইস্যুটিতে তিনি যেরূপ আগ্রহ, আন্তরিকতা, প্রত্যয় ও নৈতিক সাহসিকতা দেখিয়েছেন, এমনকি বিলটি পাস হওয়া পর্যন্ত এর পক্ষে অবিচল থেকে তা পার্লামেন্ট থেকে পাস করিয়েছেন, এর সুফলভোগী একজন কৃতজ্ঞ ও সৌজন্যবোধসম্পন্ন মুসলমান হিসেবে কৃতজ্ঞতা ও সৌজন্যবোধের প্রকাশরূপে একটি চিঠি লেখা প্রয়োজন রয়েছে। এ চিঠিতে একজন বাস্তবাদী, নিঃস্বার্থ, সত্যপরায়ণ, একজন দেশপ্রেমিক ভারতীয়, একজন ইসলামের দাঈ ও আলিম হিসেবে রাষ্ট্রে নেতৃত্বদান ও ব্যবস্থাপনা-সম্পর্কিত কিছু বস্তুনিষ্ঠ পরামর্শ দিতে চাই, যার ওপর এদেশের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা নির্ভর করে এবং যাতে তার চারপাশের 'রাজনৈতিক বাজিকর', পোড়খাওয়া নেতৃত্ব ও ক্ষমতার মধুলোভী নেতৃবর্গের উপস্থিতি সত্ত্বেও নিজের সফলতার দুর্ভেদ্য রহস্য এবং একক শ্রেষ্ঠত্বের পথ নিষ্কণ্টক থাকে। খুব সম্ভবত আমি পত্রটি জুন/জুলাই ১৯৮৬'র দিকে লিখেছিলাম। চিঠি তার কাছে পৌঁছে গেছে এবং তিনি পড়েছেন। ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে পত্রটি এখানে উদ্ধৃত করতে চাই :

প্রিয় রাজীব গান্ধীজী।

আদাব ও সালাম...।

মুসলিম পারিবারিক আইন বিলটি পাশের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অনুভূতি, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাশাপাশি (এর সুবাদে আপনার সঙ্গে একাধিকবার সাক্ষাতের ফলে গড়ে ওঠা প্রীতিময় সম্পর্কের কল্যাণে) আপনার সঙ্গে আমাদের এ বিশ্বাস, পর্যবেক্ষণ ও আস্থা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলতে চাই যে, এ মুহূর্তে দেশের নেতৃত্ব বরং দেশের অস্তিত্ব সুরক্ষা যে বিষয়গুলোর নির্ভর করে তা হলো, যথাক্রমে– বাস্তববাদিতা, মৌলিকতার উপলব্ধি, নৈতিক সাহস, উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং অন্তরের প্রশস্ততা। এটি ভারতের স্বাধীনতা

সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী প্রথম সারির জাতীয় নেতৃবর্গের প্রদর্শিত পথ। এ-পথ ধরেই তারা দেশের স্বাধীনতা এনেছিলেন। এদেশের জন্মলগ্ন থেকেই বহুধর্ম, বহু সংস্কৃতি ও জাতিগোষ্ঠীর অধিবাস যেন এর ভাগ্যলিপিতেই খুদিত। প্রকৃত গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, নিজেদের এবং দেশের উন্নয়নে স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনায় অংশগ্রহণের সুযোগকে নির্বিঘ্ন ও অবারিত রাখাই সঠিক কর্মপন্থা। একগুয়েমী, হঠকারিতা, সংকীর্ণতা ও আবেগপ্রবণতায় ঘুমন্ত ইতিহাসকে জাগানো একটা ঘুমন্ত বাঘ জাগিয়ে নিজেদের নিরাপত্তাকেই ঝুঁকিতে ঠেলে দেবার শামিল, এতে বাঘ শেষ পর্যন্ত কাউকে রেহাই দেবে না।

এদেশের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হলো, কয়েক বছর ধরে (বিশেষত, কয়েক মাস আগে থেকে) মাথাচাড়া দিয়ে উঠা উগ্রবাদী তৎপরতা, গান্ধীজি যার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন এবং এর মারাত্মক ঝুঁকি সবসময় অনুভব করতেন। কারণ, আগুন যখন জ্বালানোর জন্য বাইর থেকে কিছু পায় না, তখন সে নিজের অভ্যন্তরে থাকা সবকিছু গ্রাস করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, জাতিগত বিদ্বেষ ও হিংসাত্মক তৎপরতা ভিন্নধর্মাবলম্বীদের ছাড়িয়ে নিজেদের সমাজ, শ্রেণী এমনকি ব্যক্তি পর্যন্ত এসে গড়াবে। তখন দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। আমি আপনার বেশি সময় নেব না; সেটাও জাতির মূল্যবান মালিকানা। তবে আপনাকে একেবারে সরল অভিব্যক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে বলবো, এ মুহূর্তে আপনাকে রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য মনে করি। তাই আন্তরিকভাবে আপনার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। সেই সঙ্গে অবলীলায় পরামর্শ দিতে চাই, নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা ও রাজনীতির পিচ্ছিল ময়দানে যে গুণটি আপনাকে অন্যদের ওপর বিজয়ী করবে, দেশের মানুষের মন জয় করার সুযোগ এনে দেবে তা হলো– আপনার নিষ্ঠা, সত্যপরায়ণতা, নৈতিক সাহস, সরলতা ও কর্মোদ্যম, যা রাজনীতিকদের মাঝে ঘাটতি আছে বললে কম বলা হবে বরং একেবারেই নেই। বিভিন্ন

জাতি, ধর্মগ্রন্থ ও ইতিহাসের সাক্ষ্য হলো, শেষে সত্যেরই জয় হয়ে থাকে আর চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, বিপথগামী মেধা, চটুল অথচ অসার বুলি, উসকানি সত্যের সামনে ব্যর্থ হয়। আমার আন্তরিক পরামর্শ ও নিষ্ঠ দাবি, আপনি যেন এ পথেই চলেন। এদেশ বর্তমানে এক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, ইতিহাসের যার নজীর দেখা যায়নি। বর্তমানে দেশের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি জুলুম, চরমপন্থা, সাম্প্রদায়িক ভেদচিন্তা, গোষ্ঠীপ্রীতি, বৈষম্য, নৈতিকতায় ধস, প্রশাসনিক দুর্নীতি এবং সাম্প্রদায়িক আধিপত্যের উত্থান। এসব প্রতিরোধে কাতারবদ্ধ হওয়া এবং জীবনবাজি রেখে দাঁড়ানো খুবই জরুরি। আমার অভিজ্ঞান এবং সৃষ্টি-প্রকৃতির সাধারণ ইঙ্গিত বলে, এ বলিষ্ঠ পদক্ষেপটির জন্য আপনিই সবচেয়ে উপযুক্ত মানুষ। কোনো দল বা গোষ্ঠীর মাঝে আমি এমন আরেকজনকে দেখছি না। আল্লাহ আপনাকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ও বৃহৎ পরিসরের অনেক বড় জায়গায় অধিষ্ঠিত হবার সুযোগ এবং জনগণের ভালোবাসা কুড়ানোর সুযোগ দিয়েছেন। আমি আন্তরিকভাবে আশা করতে চাই, এ সুযোগকে আপনি উত্তমভাবে কাজে লাগাবেন, ইতিহাসে নিজের জন্য একটি উচ্চাসন এবং অসংখ্য মানুষের অন্তরের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করবেন। আল্লাহ আপনার সহায় হোন।

আবুল হাসান আলী নদভী

সম্মিলিত ও অভিন্ন পারিবারিক আইনের সংকট

তালাকপ্রাপ্তা নারীর ভরণপোষণের ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পরিচালিত লড়াইয়ে জনগণের বিজয় হয়েছে। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিলটি বিধানসভায় পাস হয়েছে, যা সে রায়ের কার্যকারিতাকে শেষ করে দিয়েছে। এভাবে অল ইন্ডিয়া পার্সোনাল ল' বোর্ডের সফলতায় একটি বড় মাইলফলক যুক্ত হলো।

কিন্তু এটি ছিল আংশিক ও একক সফলতা। তখনও মুসলমানদের মাথার ওপর ইউনিফরম সিভিল কোডের তলোয়ার তো ঝুলছেই। সেটি চূড়ান্তভাবে বাস্তবায়িত হলে এ বিল অকার্যকর হয়ে যেতে পারে, যার ফলে, 'মুসলিম

পার্সোনাল ল'-তে হস্তক্ষেপের বহু পথ খুলে যাবে। ভারতীয় সংবিধানের ৪৪ ধারারূপে একই ধরনের নাগরিক আইন (Uniforom Civil Code) এর দফা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটাকে ভারতীয় সংবিধানের পথপ্রদর্শকের (Directive Principles) মর্যাদা দেয়া হয়েছে। সংবিধানের ভাষ্য এরকম :

"ভারতীয় সংবিধান তার প্রতিটি সারণী-ছত্রে নাগরিকদের জন্য অভিন্ন আইন প্রণয়নের চেষ্টা করবে। যখন সংবিধান প্রস্তুত করা হয়েছে, তখন মুসলমান নেতৃবৃন্দকে এ বলে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, সংবিধানের মৌলিক অধিকার ধারায় মুসলমানদের জন্য 'মুসলিম পার্সোনাল ল' আইনের অধিকার সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। আর মৌলিক অধিকার ধারাটি সূচনাধারার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্র তার দূরদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছিলো যে, মুসলমানদের পারিবারিক আইনের সম্পর্ক, যা তাদের ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ (Inseparable Part) –ভারতীয় সংবিধানের ধারাগত মার-প্যাঁচের ভেতর একটি চাপা বিস্ফোরক দ্রব্যের মতো (Explosive Matter) রেখে দেয়া হয়েছে যাতে সাধারণ কোনো ঘষা কিংবা বাইরে সামান্য তাপে দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠতে পারে আর এসব ধর্মীয় ও আইনি সুরক্ষাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিতে পারে। ঘটনাপ্রবাহের কুদরতি গতিধারা, যা মুসলমানদের পারিবারিক আইনের প্রকৃত চরিত্র, যার সম্পর্ক ধর্মের সঙ্গে, আকিদা-বিশ্বাস, আবেগ-অনুভূতির সঙ্গে তা অন্তর্নিহিত শক্তিমত্তা সম্পর্কে উদাসীনতা, চিন্তা-চেতনার মাত্রা ও স্তর নির্ধারণেও ক্রিয়াশীল। অন্যদিকে, একাজটি হিন্দুত্ববাদী জাগরণ, রাজনৈতিক ও নির্বাচনী ইস্যু ও সংখ্যাগরিষ্ঠকে খুশি করার ইচ্ছে থেকেও হতে পারে। সমস্যাটি এখন সামনে হাজির হয়ে গেছে। দীর্ঘদিনের নীরবতা ভেঙে ১৯৭২ সালে নানাবিধ কারণ ও তাগিদে ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর পারিবারিক আইনের অভিন্নতা ও 'মুসলিম পার্সোনাল ল' সংস্কারের আওয়াজ উচ্চকিত হয়। আইনপ্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান লোকসভার ভেতরে-বাইরে এ আওয়াজ ক্রমাগত উচ্চারিত হতে থাকে। কিন্তু নানারকম রাজনৈতিক বিবেচনা ও মুসলমান জনগোষ্ঠীর ব্যাপক অসন্তোষের ভয়ে (নির্বাচনেও যার প্রভাব প্রতিফলিত হবার আশঙ্কা রয়েছে) তা চাপা পড়ে থাকে। ভারতের সরকার তাদের শীর্ষস্থানীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মুখে একাধিকবার ঘোষণা করিয়েছে যে, এরূপ কোনো পদক্ষেপের ইচ্ছে তাদের নেই। যে পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগণের পক্ষ থেকে দাবি না উঠছে, সে পর্যন্ত এটা নিয়ে তাদের বিশেষ কোনো আগ্রহ নেই।

তবে এক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিগণ লোকসভার ভেতরে-বাইরে দাবিটিতে নিয়ে সোচ্চার হন। কোনো কোনো সময় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পর্যবেক্ষকগণ লক্ষ্য করেছেন যে, এটি কেবল তাদের অন্তরের চাওয়াই নয় বরং সহস্র মুখের স্বতঃস্ফূর্ত ধ্বনি। এক কথাশিল্পীর ভাষ্যে :

'টিয়ার আড়ালে তো কথা আমি-ই বলি। সৃষ্টির সেই উষালগ্নে ওস্তাদ যা বলেছিলেন আজও তা-ই আমি বলবো।'

এটি এক স্থূল ভাবনা

দেশের সকল ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর জন্য অভিন্ন আইন তাদের মাঝে ঐক্য, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধন তৈরি করবে– এমন ধারণা একেবারেই অবাস্তব একটি স্থূল ভাবনা বৈকি! ইউরোপে অভিন্ন পারিবারিক আইন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও বড় ধরনের দু'টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে, যার লেলিহান শিখা থেকে পূর্বএশিয়াও নিরাপদ ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধটি হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে বৃটেনের সঙ্গে জার্মানীর; জার্মান ও বৃটিশ উভয় জাতি ধর্মীয়ভাবে কেবল খ্রিস্টানই নয়; বরং প্রোটেস্টেন্ট খ্রিস্টানও। তাদের পারিবারিক আইন এবং সমাজও খুব সম্ভবত অভিন্ন। তাহলে তারা কীভাবে পরস্পরের ঘোরতর শত্রুর মতো নিজেদের মধ্যে এরূপ লড়াই করলো? এখন যদি ভাবা হয় যে, ইউনিফরম সিভিল কোড বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝে সংঘাত ঠেকাতে পারবে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পথ রুদ্ধ করতে পারবে– তাহলে সেটা ইউরোপেও পারার কথা ছিল!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চিত্রও একই রকম। সেখানেও দুইপক্ষ যেন পরস্পরের রক্তপিয়াসী ছিল। আপনি যেকোনো সময় আদালতে গিয়ে দেখুন, বাদী-বিবাদী উভয়ে মুসলমান। এক মুসলমান আরেক মুসলমানের সম্মানকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চাইছে। পরস্পরকে বাড়িভিটে থেকে উচ্ছেদ করতে উদ্যত। অথচ তাদের উভয়ের পারিবারিক আইন অভিন্ন। কখনও বা উভয়ে একই রক্তধারার সন্তানও বটে। অনুরূপ অবস্থা হিন্দুদের ক্ষেত্রেও। তাদের মাঝেও অভিন্ন পারিবারিক আইন সত্ত্বেও মামলা-মোকদ্দমা, লড়াই-সংঘাত, ঝগড়া-বিবাদ নৈমিত্তিক দৃশ্য। প্রকৃতপক্ষে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের উৎস ও কারণ হলো, অপরিসীম লোভ-লালসা ও সীমালঙ্ঘণের ব্যক্তিগত প্রবণতা। আমাদের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা ও ভঙ্গুর নৈতিকতাচর্চায় চরিত্র গঠনের দিকটি উপেক্ষিত থাকার কুফল হিসেবে এটি পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। এ অবস্থার সঙ্গে

পারিবারিক আইন ভিন্নতার আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই।[১] বাস্তবতা যাই হোক, এটি পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, দেশের আইনপ্রণেতা ও হর্তাকর্তাদের মনোভাব এ ব্যাপারে স্বচ্ছ নয় এবং যে কোনো সময় ছাইচাপা আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠে চারদিক ছারখার করে দিতে পারে।

গণতান্ত্রিক দেশে গণমানুষের অধিকার রীতি ও পদ্ধতি

আমাদের এটি কখনও ভুলে যাওয়া উচিত নয়, যে দেশে আমাদের অধিবাস, এর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ অমুসলিম। এটি একটি গণতান্ত্রিক দেশ। এখানে আইন প্রণয়নকারী পরিষদ আইন তৈরি করে থাকে। এদেশ যখন গণতান্ত্রিক, পার্লামেন্টই তো আইন তৈরি করবে। আর গণতন্ত্রের নিয়ম হলো অধিকাংশের মতানুসারে আইন প্রণীত হবে। ফলে, আমাদের ঈমান-আকিদা, চেতনা-মূল্যবোধ ও বাস্তব প্রয়োজনের বিপরীত আইন তৈরি হয়েছে (অল্প কিছু অসৎ উদ্দেশ্যে আর অধিকাংশ অজ্ঞতাবশত)। একইসঙ্গে এটাও বিস্মৃত হবার সুযোগ নেই যে, এখানে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত আগ্রাসী পুনর্জাগরণ (Aggresive Revivalism) ও স্বৈরতান্ত্রিক আন্দোলনও (Totalitarianism) এখন তুঙ্গে। এখন আমাদের জন্য সঠিক যথার্থ কৌশল হবে এই সেক্যুলার ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নিজেদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য আইনি প্রক্রিয়া অবলম্বন করা। আমরা ভারতের বিশ্বস্ত, কল্যাণকামী, যোগ্য নাগরিক ও জাতি-রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে নিজেদের গুরুত্ব প্রমাণ করাও আমাদের দায়িত্ব। আমি নিয়মতান্ত্রিকভাবে বলবো যে, দেশে যেন এমন কোনো আইন পাস না হয়, যা আমাদের আকিদা-বিশ্বাসের সঙ্গে বৈপরীত্যপূর্ণ। এটাও প্রমাণ করা জরুরি যে, শরীয়তপরিপন্থী আইন আমাদের চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং আমাদের জাতীয় অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলবে। একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে খাওয়া-পরার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের এখতিয়ারভুক্ত বিষয় নয় সে যতই শক্তিশালী কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠই হোক। চাইলেই অমুক সম্প্রদায়কে খেতে দেয়া যাবে না, অমুক সম্প্রদায়ের লোকজনকে বাজারে দোকান খুলতে দেয়া হবে না, অমুক ধর্মাবলম্বী সন্তানদেরকে বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার দেয়া যাবে না– এমন আইন প্রণয়নের কোনোরূপ বৈধতা থাকতে পারে না, এমনটি

১. মুম্বাই সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ থেকে সংকলিত; তারিখ– ১৫-১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৬ খ্রি.

হওয়া মানে নিজেরা কিয়ামত সংঘটিত করার শামিল। আমাদেরকে কার্যকরভাবে প্রমাণ করতে হবে, মাছ যেমন পানি ছাড়া থাকতে পারে না, তেমনি আমাদের ধর্মীয় বিধান ও নিজস্ব আইনের প্রয়োগকে বাধাগ্রস্ত করা হলে এর সর্বব্যাপী নেতিবাচক প্রভাব-প্রতিক্রিয়া পুরো মুসলিম জাতির চেহারায় ভেসে উঠবে, আমাদের সুস্থতা, শক্তি-সামর্থ্য সবকিছুকে তা প্রভাবিত করবে। এটাও তাদেরকে মনে রাখতে হবে, এ জাতিকে যদি সংক্ষুব্ধ করে তোলা হয়, তবে তা হবে জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে হত্যার শামিল।

প্রকৃতপক্ষে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ (যাদের আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য ক্রমপরিবর্তনশীল) আইন প্রণয়নের স্থায়ী ও পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করে। কোনো ঘরানা ও সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর (যারা নিজেদের নিজস্ব জীবনব্যবস্থা, পারিবারিক আইন ও জাতীয় স্বকীয়তা রাখে এবং যা তাদের কাছে নিজের জীবনের চাইতেও মূল্যবান) এমত পরিস্থিতিতে নিশ্চিন্ত ও চোখ বন্ধ করে নির্বিকারভাবে বসে থাকার সুযোগ নেই। এ জাতির জন্য মিসরবিজয়ী আমর ইবনুল আস-এর ঐতিহাসিক উক্তিটি যথাযথ ও সময়োচিত। তিনি নতুন বিজিত অঞ্চলের নবনিযুক্ত প্রশাসকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন– أنتم في رباط دائم 'তোমরা সর্বদা যুদ্ধক্ষেত্রে আছো। তোমাদেরকে সর্বক্ষণ চৌকস ও সজাগ থাকতে হবে।'

বাবরি মসজিদ

সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং তালাকপ্রাপ্ত মহিলার ভরণপোষণ (যা 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড'-এর প্রধান ইস্যু) প্রসঙ্গের পাশাপাশি যখনই প্রধানমন্ত্রী এবং তার উপদেষ্টাদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে, বাবরি মসজিদ ইস্যুর দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছি। আমার দু'বার বাবরি মসজিদ সম্পর্কে আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর কাছে ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়। বিভিন্ন সময়ের সাক্ষাতে এ বিষয় নিয়ে পৃথক আলোচনার জন্য সময় চাওয়া হয়। তবে কোনো কোনো অন্তরায় সামনে এসে গেছে। আমার এ উদ্বেগ বরাবরই ছিল যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী বিশেষত বিশ্ব হিন্দুপরিষদ-এর সৃষ্ট উত্তেজনা রাষ্ট্রের একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত বিষয়। কাজেই তিনি এ সম্পর্কে (মুসলিম পার্সোনাল ল') গঠনমূলক সিদ্ধান্ত, সাহসী উদ্যোগ ও বাস্তবোচিত পদক্ষেপ নিতে পারবেন কিনা। কিন্তু দেখা গেল, তিনি ভারতের বৃহৎ সংখ্যালঘু

জনগোষ্ঠীর আস্থাকে (একটি পর্যায় পর্যন্ত) রক্ষা করেছেন। ফলে, বিষয়টি এক প্রকার জটিল রূপ ধারণ করে। দেশজুড়ে ব্যাপক অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতায় যেন তিনিও জড়িয়ে গেলেন। এ প্রসঙ্গে গণমাধ্যমে প্রেরিত আমার বক্তব্যটি উদ্ধৃত করতে চাই। এটি ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়, যখন তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ভরণপোষণ ইস্যুতে আন্দোলন-তৎপরতা চলছিল। আমি এখনও সেই বক্তব্যের সারবত্তা এবং মূল আবেদনের প্রবক্তা।

অযোধ্যার বাবরি মসজিদের বিষয়ে একতরফা রায় সমগ্র ভারতের মুসলমানদের যারপরনাই ব্যথিত ও সংক্ষুব্ধ করেছে। এটি এমন সময়ে হলো, যখন মুসলিম পার্সোনাল ল' ইস্যুতে তারা মর্মাহত, যখন এদেশের মুসলিম জাতি তাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা এবং ধর্মীয় প্রতীকসমূহ নিয়েই বাঁচতে একাট্টা ও সোচ্চার ভূমিকা পালন করে চলেছে। বাবরি মসজিদের তালা খুলে দিয়ে আরেকদলকে সেখানে পূজা-অর্চনার প্রকাশ্য অনুমতি প্রদান এবং মসজিদটিকে ঘিরে (মুসলমানদের জন্য একতরফা) নিষেধাজ্ঞাকে কোনো বিচারেই দূরদর্শিতাপূর্ণ পদক্ষেপ বলা যায় না। কারণ, এতে মুসলমানরা ব্যাপক উত্তেজনায় ফেটে পড়ার পুরোদমে আশঙ্কা রয়েছে। তারা এরূপ ধারণা করতে পারে যে, এদেশ কেবল একটি ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠী নিজেদের মালিকানা বানিয়ে নিচ্ছে, এখানে শক্তির জোরে একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অন্যদের অধিকার উপেক্ষা করা যায়।

বাবরি মসজিদের ব্যাপারে ঐতিহাসিক সত্য এবং প্রমাণিত বাস্তবতা হলো, এটা মুসলমানদের সম্পত্তি এবং মসজিদ, যেখানে তারা সাড়ে চারশ' বছরের বেশি সময় ধরে নিয়মিত নামায আদায় করেছে। এ ধরনের পদক্ষেপের ফলে মুসলমানদের মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়া একেবারেই স্বাভাবিক এবং এটা তাদের ধর্মীয় সম্ভ্রমবোধের পরিচায়ক। তবে মুসলমানদের উচিৎ হবে সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসামূলক আচরণের উসকানিতে প্রভাবিত না হওয়া। এতে করে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটবে। তাদের উচিৎ নিজেদের ঐক্য ধরে রাখা, 'মুসলিম পার্সোনাল ল' আন্দোলনে তারা যে ধরনের ইস্পাতদৃঢ় সংহতির দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, একইভাবে বাবরি মসজিদ ইস্যুতে দাতের সীসাঢালা ঐক্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সরকারকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, সংখ্যালঘুদের উপর কোনো জুলুম, বিশেষ করে তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (মসজিদ ইত্যাদি ইবাদতের জায়গা) দখলের মতো পদক্ষেপ একেবারে বরদাশত করা হবে না।

এখানে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে হবে যে, সরকার যদি মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনাকে সম্মান না করে এবং বাবরি মসজিদের ব্যাপারে গৃহীত ন্যাক্কারজনক পদক্ষেপ থেকে ফিরে না আসে, তাহলে এ পরিণাম ভয়ানক এবং কঠিন হতে পারে। এ ইস্যুতে 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড' সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সভায় একটি প্রস্তাব পাস করেছে; যা গণমাধ্যমে প্রকাশের জন্য প্রেরণ করা হয়।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সভা

এ-বছরের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সভা ও কর্মব্যস্ততার মধ্যে দ্বীনি তা'লীমী কাউন্সিল-এর ষষ্ঠ প্রাদেশিক সম্মেলনের বিষয়টি উল্লেখ করার মতো। সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২২-২৩ নভেম্বর ১৯৮৬, বেনারসে– যেখানে পাঁচটি প্রদেশের প্রতিনিধি ছাড়াও রাজধানী ও উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ওলামা, শিক্ষাবিদ, সামাজিক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ মহিলা-পুরুষ মিলিয়ে প্রায় তিন হাজার লোক অংশগ্রহণ করে।

উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় সভাটি হলো, 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড'-এর ৮ম সভা– যা ১৯৮৬ সালের ১৫ ডিসেম্বর মুম্বাইতে অনুষ্ঠিত হয়। এতে পুরো ভারতের বোর্ড-সদস্য, নেতৃবৃন্দ, দায়িত্বশীল এবং ধর্মীয় ও জাতীয় নেতৃবর্গ উপস্থিত ছিলেন। আমি সভাপতির ভাষণে (যা উর্দু ও ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছে) পার্লামেন্টে পাস হওয়া বিলের ওপর পর্যালোচনা করেছি। এতে অভিন্ন পারিবারিক আইন, ইউনিফর্ম সিভিল কোড এর ওপর বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে; পরে জাতিকে একটি নতুন ও দীর্ঘমেয়াদী গণতান্ত্রিক ও আইনি লড়াইয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, যার সামগ্রিকতার তুলনায় 'মুসলিম পার্সোনাল ল' ইস্যুর আন্দোলনটি একটি সীমিত মাত্রা হিসেবে বিবেচিত হয়। উক্ত তৎপরতার প্রতিপাদ্যব্যঞ্জক একটি হাদিস উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক মনে করছি :

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ

অর্থাৎ– 'আমরা ছোট জিহাদ শেষ করে বড় জিহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করছি।' বক্তব্যটি বিভিন্ন দিক থেকে বিদ্যমান পরিস্থিতির গ্রহণযোগ্য বিশ্লেষণ এবং জাতির জন্য চিন্তার দ্বার-উন্মোচক বার্তা বহন করছিল[১]।

---

১. বক্তৃতাটি ছাপা হয়েছে। উত্তর প্রদেশের দ্বীনি তা'লিমী কাউন্সিল থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

এরই সঙ্গে মুসলিম তালাকপ্রাপ্ত মহিলাবিষয়ক বিলটিতে তিনটি আইনি ও শাব্দিক ত্রুটি সংশোধন করে সংশোধিত প্রস্তাবের লিখিত কপি আমি সরাসরি প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর কাছে প্রেরণ করি। সেখানে উল্লেখ করেছি, বিলটিকে আদালতের আইনে পরিণত করার এবং সে অনুযায়ী রায় প্রদানের সর্বাত্মক প্রয়াস যেন গ্রহণ করা হয় যাতে বিপক্ষের কারও দ্বারা কিংবা আদালত কর্তৃক কোনো তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিয়ে পর্যন্ত অথবা জীবৎকাল অবধি ভরণপোষণ আদায়ের বৈধতার রায় না হয়। এমনও দেখা যাচ্ছে যে, এখনও অনেক আদালত পার্লামেন্টে পাস হওয়া বিল সম্পর্কে অবগত না হওয়ার ভান করে রায় প্রদান করে যাচ্ছে এবং সুপ্রিম কোর্টের সেই রায় অনুসারে তালাকপ্রাপ্ত মুসলিম মহিলার ভরণপোষণ-সংক্রান্ত রায় দিয়ে যাচ্ছে। 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড' বিজ্ঞ ও শীর্ষ আইনবিদদের সহযোগিতায় বিলটির আইনি রূপরেখা তৈরি করেছে। এটি বোর্ডের প্রধান অগ্রাধিকার ও কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

পঞ্চম অধ্যায়

ইস্তাম্বুলে (তুরস্ক) 'রাবেতায়ে আদবে ইসলামী' (ইসলামী সাহিত্য সংস্থা)-এর সভা

করাচীতে কয়েকদিন অবস্থান ও প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষণসমূহ

'ইসলামী সাহিত্য সংস্থা'র কার্যকরী পরিষদের প্রথম পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয় 'নাদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌ'তে। ঐ সভায় পরবর্তী সভার স্থান নির্ধারিত হয় ইস্তাম্বুল (তুরস্ক) এবং তারিখও নির্ধারিত হয়। ইস্তাম্বুলের নির্বাচনে দুটি স্বার্থ ক্রিয়াশীল ছিলো।

১. তুরস্কের ইসলামী ঐতিহ্যের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য এবং তুরস্কে ইসলামী নবজাগরণের লক্ষণীয় পূর্বাভাস।

২. সৌদি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অধ্যাপকমণ্ডলি, আরবের সাহিত্যিক ও পণ্ডিতগণ গ্রীষ্ম যাপনের জন্য পূর্বে সাধারণত, বৈরুতে পাড়ি জমাতেন। কিন্তু নতুন গোলযোগপূর্ণ ও প্রতিকূল পরিস্থিতি ছুটি উদ্‌যাপন ও ইলমী কাজের অযোগ্য করে তোলে বৈরুতকে।

তুরস্কের ছিলো দুটি বৈশিষ্ট্য। শান্ত পরিস্থিতি ও ইসলামী পরিবেশ, তুর্কীদের আরবপ্রীতি ও সুলভ দ্রব্যমূল্য। ইসলামী সাহিত্য সংস্থার অধিকাংশ আরব সদস্য গ্রীষ্মে তুরস্ক সফর করতেন। আর কিছু তো সেখানে পূর্ব থেকেই অবস্থান করছেন।

ইস্তাম্বুলের জন্য সেই ফ্লাইট আমাদের ভাগ্যে জোটে, যা করাচী হয়ে ইস্তাম্বুলে যায় এবং পুরো রাত ও দিনের কয়েক ঘণ্টা করাচীতে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কাটানোর সুযোগ হয়। ১৯ জুন, ১৯৮৬ ইং তারিখে স্নেহাস্পদ মুহাম্মদ রাবে' সাল্লামাহুকে সঙ্গে করে দিল্লী থেকে রওয়ানা হয়ে ২০ জুন ইস্তাম্বুল পৌঁছি। দিনটি ছিলো জুমাবার। ঠিক জুমার নামাযের সময় সেখানে অবতরণ করি। তা সত্ত্বেও (জুমার নামায শেষ করে) এয়ারপোর্টে থাকতেই আরব ও তুরস্কের বেশ কয়েকজন বন্ধু এসে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও একজন আমার পুরনো বন্ধু তুরস্কের প্রখ্যাত আলিম শাইখ আমীন সিরাজ (খতীব : মসজিদে ফাতিহ)। ১৯৫১

সালে মিসরে অবস্থানকালে তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো। তখন তিনি জামি'আতুল আযহারে অধ্যয়নরত। অবস্থান করার জন্য তুরস্ক ও আরবের মেজবানরা একটি প্রাসাদের প্রশস্ত ফ্লাট নির্বাচন করেন, যেখানে রয়েছে প্রয়োজনীয় কক্ষের সাথে সেমিনার আয়োজনের সুবিধাও। এই ফ্লাট ছিলো শহরের উপকণ্ঠ 'ফিন্দিযাদা'র 'গুলিস্তান' নামক প্রাসাদে। আতিথেয়তার জন্য নিয়োজিত হন ইস্তাম্বুলের মেডিকেল কলেজে এমডি-এর দায়িত্বরত আরব আলিম ড. মুস্তফা।

শনিবার সকাল দশটা থেকে ইসলামী সাহিত্যসংস্থার উদ্বোধনী অধিবেশন ও সভাপতির ভাষণের পর লক্ষ্ণৌর সদর দপ্তর ও আরব বিশ্বের দপ্তরের পক্ষ থেকে ইসলামী সাহিত্যের বিষয়ে কর্মপ্রতিবেদন পেশ করা হয়, বিভিন্ন প্রস্তাব সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়। দুপর পর্যন্ত অধিবেশন চলতে থাকে। এরপর কার্যক্রম দ্বিতীয় দিনের জন্য স্থগিত হয়ে যায়।

সন্ধ্যায় শাইখ আমীন সিরাজ ইস্তাম্বুলের এক ইসলামী ভাবধারার বিদ্বান ব্যবসায়ী উছমান নূরী আফিন্দির বাড়িতে নিয়ে যান। এখানে ইসলামী সাহিত্যিকদের এক সেমিনার হচ্ছিলো। উক্ত সেমিনারে আরবের প্রখ্যাত লেখক ও চিন্তাবিদ মুহাম্মদ কুতুবও (সাইয়িদ কুতুব শহীদের সহোদর) উপস্থিত ছিলেন। তিনিসহ আরবের কয়েকজন পণ্ডিত প্রবন্ধ পাঠ করেন।

আমি আমার ভাষণে ইসলামী সাহিত্যে বৈপ্লবিক ও অগ্রণী ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে তুরস্কের অবদানের বর্ণনায় মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রহ.-এর আলোচনা করে বলি, তাঁর মছনবী'র প্রভাব শুধু সাহিত্য ও কাব্যে নয়, বরং ইসলামী চিন্তাধারা ও কালাম শাস্ত্রে সুদীর্ঘ কাল বিরাজমান ছিলো, যার দৃষ্টান্ত অন্য কোনো কবি-সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। কত পথহারা দার্শনিক, নাস্তিক ও স্বাধীনমনস্ক সাহিত্যিক ও কবি তাঁর কারণে পুনরায় ইসলামের প্রতি বিশ্বাসী হয়েছেন এবং ইসলামের দাঈ ও মুখপাত্রে পরিণত হয়েছেন, তার হিসাব নেই। আধুনিক যুগে ইসলামী বিশ্বের সবচেয়ে বড় কবি ড. স্যার মুহাম্মদ ইকবাল নিজেকে তাঁর শিষ্য ও গুণগ্রাহী মনে করতেন। তিনি বলেন,

پیر رومی مرشد روشن ضمیر
کاروان عشق و مستی را امیر

রোমের আলোকিত হৃদয় মুরশিদ ও পীর
ইশক ও প্রেম কাফেলার যিনি আমীর।

তিনি বিভিন্ন স্থানে তাঁর বরাত পেশ করেন। এক উর্দূ কবিতায় তিনি বলেন,

اسی کے فیض سے میری نگاہ ہے روشن
اسی کے فیض سے میرے سبو میں ہے جیحون

তাঁরই দয়ায় আমার নয়নে আলোর ফোয়ারা,
তাঁরই দানে আমার পাত্রে ঊর্মিধারা।

তুরস্ক এখনো সেই লোক সৃষ্টি করতে পারে। তুর্কীরা যতদিন ইসলামী বিশ্বের হিফাযত ও প্রতিনিধিত্ব করেছে, তা আর কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। এখনো তুরস্ককে নেতৃত্বের জন্য সামনে এগিয়ে আসতে হবে।

কতিপয় তুর্কী সাহিত্যিক অনুযোগ করে বলেন, "আমরা তুর্কীরা অন্য ভাষার সাহিত্য আমাদের ভাষায় তরজমা করার চেষ্টা করি, কিন্তু অন্য ভাষার লোকেরা তুর্কী লেখকদের সাহিত্য স্ব স্ব ভাষায় তরজমা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না।" কথাটার বাস্তবতা স্বীকার করা হয় এবং সর্বসম্মতভাবে সেদিকে মনোযোগ দানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়। সেই সেমিনারে জানতে পারলাম, সম্প্রতি তুরস্কে ইসলামকে জানার ও মানার জযবা দিনদিন শক্তিশালী হচ্ছে। ইসলামী চিন্তাধারার লেখকদের গ্রন্থাবলি তুর্কী ভাষায় ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে ক্ষিপ্রগতিতে। আনন্দের ব্যাপার হলো, গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদের হাতে হাতে চলে যায়। (আমার অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের কয়েক সংস্করণ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।)

আমার গ্রন্থ 'দস্তুরে হায়াত'– যার আরবী নাম 'العقيدة والعبادة والسلوك' -এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিলো পাঁচ হাজার কপি। এক মাসেই তা শেষ হয়ে যায়। কোনো কোনো গ্রন্থ দুই অনুবাদকের হাতে অনূদিত হয়েছে। তাদের একে অন্যের কথা জানেন না। সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগেই অনুবাদ করেছেন। ওস্তাদ মুহাম্মদ কুতুব বলেন, "এমনও হয়েছে যে, আমার মূল আরবীতে রচিত গ্রন্থ আরবীতে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই তুর্কী ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রচারিত হয়েছে!"

আরো জানতে পারি, সেনাবাহিনী ও আধুনিক শিক্ষিতদের মাঝেও ইসলামী চিন্তাধারার প্রচুর লোক তৈরি হয়েছে। ফলে বর্তমান সরকার এ বিষয়ে মনোযোগ দিতে বাধ্য।

তুর্কী আত্মমর্যাদা, হিন্দুস্তানী প্রতিভা ও আরবী বাকশক্তি

রবিবার দশটায় একটি বিশাল সভাকক্ষে তুর্কী আদীব ও আহলে ইলমের এক ব্যাপক ও উন্মুক্ত অধিবেশনের আয়োজন করা হয়। এই অধিবেশনে যেসব সাহিত্যিক ও পণ্ডিত অংশগ্রহণ করেন, তাঁদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ থেকে ছয়শ'। এতে সাংবাদিকসহ রেডিও-টেলিভিশনের প্রতিনিধিরাও অংশগ্রহণ করেন। মনে হলো, সরকারও এই সেমিনারের গুরুত্ব অনুধাবন করেছে এবং সরকারি পরিমণ্ডলে তাতে সহযোগিতা করেছে। ইসলামপ্রিয় ব্যক্তিবর্গ সরকারের এই ইতিবাচক সহযোগিতাকে ইসলামী সাহিত্য ও চিন্তাধারার একটি জয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আমি উক্ত সেমিনারে روائع إقبال -এর ঐ অংশটি পাঠের জন্য নির্বাচন করি, যাতে তাঁর বহুল-আলোচিত জাগরণ সৃষ্টিকারী কবিতা طلوع اسلام -এর আরবী অনুবাদ পেশ করা হয়েছে, যার প্রাণশক্তি ও মূল ভাষ্য ছিলো– তুরস্কের বিরুদ্ধে পশ্চিমা শক্তিসমূহের জোটগঠন এবং সেই জোটের বিরুদ্ধে তুরস্কের বীরত্ব, অবিচলতা, আত্মবিসর্জনের বিরল স্পৃহা ও ইসলামের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রকাশের নিপুণ বর্ণনা। আমার একপাশে উপবিষ্ট ছিলেন শ্রেষ্ঠ এক তুর্কী সাহিত্যিক ও কলমসৈনিক, অন্যপাশে ছিলেন আরবের প্রখ্যাত লেখক ও ইসলামী চিন্তাবিদ মুহাম্মদ কুতুব। আমি যখন এই কবিতার অনুবাদে পৌঁছি,

عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے

شکوہ ترکمانی، ذہن ہندی، نطق اعرابی

মুমিন আবার পেতে যাচ্ছে আল্লাহর দরবার হতে,
তুর্কী মর্যাদা, হিন্দি প্রতিভা ও আরবী বাকশক্তি।

তখন আমি তুর্কী মর্যাদা বলে তুর্কী সাহিত্যিকের প্রতি, আরবী বাকশক্তি বলে মুহাম্মদ কুতুবের প্রতি ইঙ্গিত করি এবং হিন্দি প্রতিভা বলে এই আবেদন করি যে, যদিও আমি তার মিছদাক নই কিন্তু আমি এমন জাতির প্রতিনিধি, যাকে আল্লাহ বিশেষ প্রতিভা দান করেছেন এবং ইসলামের খিদমতে নিয়োজিত করেছেন। এই আরবী বক্তব্যের তুর্কী অনুবাদ প্রস্তুত ছিলো, তা পড়ে শোনানো হলো।

এই সেমিনারে সংস্থার এক দায়িত্বশীল ও ব্যবস্থাপনা সদস্য শাইখ মুহাম্মদ হাসান বেগিশ সাহিত্য সংস্থার প্রতিষ্ঠা ও লক্ষ্য সম্পর্কে আলোকপাত

করেন। তাঁর বক্তব্যের অনুবাদের পর উস্তাদ মুহাম্মদ কুতুব বক্তব্য রাখেন। সভায় দুই তুর্কী আলিমও তুর্কী ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তাঁদের একজন তুর্কী পণ্ডিত ইজ্জত আযূদ স্বীয় বক্তব্য এই মর্মস্পর্শী কথা দিয়ে শুরু করেন, "আজ থেকে কিছুদিন পূর্বে আমি بسم الله الرحمن الرحيم দিয়ে আমার বক্তব্য আরম্ভ করেছিলাম। তখন এক হাঙ্গামা শুরু হয়েছিলো। কিন্তু আজকের পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি এখন পূর্ণ প্রশান্তিতে হৃদয়ের মাধুরি মিশিয়ে বিসমিল্লাহ দ্বারা বক্তব্য আরম্ভ করছি।" সেমিনারের বিষয়বস্তু গুরুত্ব সহকারে প্রচার করে দেশের প্রচার মাধ্যম। কয়েকজন তুর্কী বন্ধু বললেন, এই প্রথমবার সরকার একটি নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী প্রোগ্রাম ও সেমিনার রেডিও-টিভির মাধ্যমে প্রচারের অনুমতি দিয়েছে। এভাবে সেমিনারটি হয়ে ওঠে দেশ ও ইসলামী জাগরণের জন্য একটি শুভ লক্ষণ।

মৃত্যুপরবর্তী জীবনের বিশালতা

মঙ্গলবার থেকে জুমা পর্যন্ত সময়ে একটি বিনোদন ও তথ্যানুসন্ধানমূলক সফরের সুযোগ ছিলো। সেজন্য তুরস্কের এক গুরুত্বপূর্ণ কাছের শহর 'বোর্শা' নির্বাচন করা হয়। এটি উছমানী শাসকবর্গের প্রথম রাজধানী। ঐ শহরে তাদের স্থাপত্যের নিদর্শন এখনো বিদ্যমান। সেখানের মানুষ বিশেষভাবে ধর্মপ্রিয়। এই বিনোদনের পূর্বে মঙ্গলবারেই বাসফোর্স প্রণালীর এশীয় প্রান্তে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এর উদ্দেশ্যে আমরা দশটায় রওয়ানা হই। উপকূলের এক সংক্ষিপ্ত সফরের পর সুলতান আব্দুল আজীজের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক প্রাসাদ 'দোলমা বাগিচা' দেখতে যাই। এটি উছমানী শাসকদের শেষ আবাসস্থল। এখন তা একটি মূল্যবান উন্নত জাদুঘর ও পর্যটনকেন্দ্র। সেখানে অনুষ্ঠিত 'ইসলামী সম্মেলন সংস্থা কুদ্‌স্-করাচী'-এর আলোচনা সভায় উপস্থিত হই। এরপর যাই সর্বশেষ উছমানী খলীফা সুলতান আব্দুল হামীদ খানের রাজপ্রাসাদ দেখতে।

সেখানে কিছু সময় কাটিয়ে আমরা বসফরাস প্রণালীর এশীয় প্রান্তে পৌঁছে যাই। এক বিশাল উঁচু ব্রীজের সাহায্যে বসফরাস প্রণালী পাড়ি দেই। সমুদ্রের এশীয় প্রান্তে একস্থানে থেমে যাই। সেখানে একদল তুর্কী ভদ্রলোক ছিলেন, যাদের মধ্যে রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও আরবীয় কিছু শিক্ষিত লোক। উপস্থিত লোকজন আমি ও ওস্তাদ মুহাম্মদ কুতুব আমার কাছে আলোচনার আবেদন জানান। উস্তাদ

মুহাম্মদ কুতুব বলেন, "আজ কেবল শাইখই আলোচনা রাখবেন, আমি শুধু শুনবো।" আমি বক্তব্যের সূচনা করি এভাবে–

"আমি যখন এখানে আসার জন্য রওয়ানা হয়েছিলাম, সহসা অন্তরে এই আয়াত ভেসে উঠে–

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'তুমি কি সে লোককে দেখনি যে, এমন জনপদ দিয়ে যাচ্ছিলো, যার বাড়িঘরগুলো ভেঙ্গে ছাদের উপর পড়েছিলো? সে বলেছিলো, কিভাবে আল্লাহ মরণের পর একে জীবিত করবেন। অতঃপর আল্লাহ তাকে একশত বছর মৃত অবস্থায় রাখলেন। তারপর তাকে উঠালেন। বললেন, কত কাল তুমি এখানে ছিলে? সে বললো, আমি একদিন কিংবা তার কিছু কম সময় ছিলাম। আল্লাহ বললেন, না, তুমি তো একশত বছর ছিলে। এবার চেয়ে দেখো নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে, সেগুলো নষ্ট হয়নি এবং দেখো নিজের গাধাটির দিকে। আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি। হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখো, কীভাবে আমি এগুলোকে উঠিয়ে জুড়ে দিই এবং সেগুলোর উপর মাংসের আবরণ পরিয়ে দিই। যখন তার উপর এ অবস্থা প্রকাশিত হলো, সে বলে উঠলো, আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল।'[১]

বললাম, "আমি একজন কুরআন করীমের ছাত্র। এর অর্থ ও তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করি। কুরআন করীমের আয়াতসমূহের অর্থ ও তাৎপর্য– যা তাফসীরের কিতাবসমূহে পাওয়া যায়, কিংবা সাধারণ অধ্যয়ন ও গবেষণায় বুঝে আসে, বাস্তবে এর চেয়ে অনেক বেশি গভীর ও ব্যাপক।

---

১. সূরা বাকারা : ২৫৯

উল্লেখিত আয়াতে যদিও একটি নির্দিষ্ট ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে– যেখানে এক ব্যক্তিকে একশত বছর মৃত রাখার পর পূর্বের ন্যায় জীবিত ও সতেজ করে উঠানোর কুদরত প্রদর্শিত হয়েছে এবং যে খাবার খোলা আকাশে কয়েক ঘণ্টা থাকলেই নষ্ট হয়ে যায়, তাকে একশত বছর অক্ষত রাখার কুদরাতী কারিশমা দেখানো হয়েছে। কিন্তু আমার ধারণায় এই ঘটনায় একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত এও রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় দ্বীন ও পয়গামকেও একশত বছরের নির্জীবতার পর এবং তার সাথে জাতি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক ও সহযোগিতা সুদীর্ঘ কাল স্থবির থাকার পরও পুনরায় উভয়টিকে নতুন প্রাণ ও সজীবতা দান করতে পারেন ও বাস্তবে তা দান করে থাকেন।[১]

যিনি খাদ্যের মত সাধারণ বস্তুকে শত বছর অক্ষত ও অবিকৃত রাখতে সক্ষম, তিনি অবশ্যই শত শত বছরের প্রতিকূল সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও স্বীয় দ্বীনকে সজীব ও অবিকৃত রাখতে সক্ষম। আমার মতে এ আয়াত সুসংবাদ শোনাচ্ছে– যে জাতি ও দেশ পাশ্চাত্যের বুকে শত-শত বছর ইসলামের পতাকা উঁচু রেখেছে, সে জাতি আবার নতুন জীবন লাভ করবে।

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ

"তুমি তো রাতকে দিনে প্রবিষ্ট করো এবং দিনকে প্রবিষ্ট করো রাতে। আর জীবিতকে মৃত থেকে বের করো এবং মৃতকে বের করো জীবিত থেকে।"[২]

মনে হয়, তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহপ্রদত্ত এই বক্তব্য শ্রোতারা পূর্ণ মনোযোগ ও ধ্যানের সাথে শুনেছেন এবং ইকবালের এই ভবিষ্যদ্বাণী কানে কানে গুঞ্জরিত হয়েছে-

نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے
ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی

ইকবাল নিরাশ নয় বিরান ভূমির ক্ষেত থেকে,
একটু সিক্ত হলে দেখবে সাকী! এই মাটি বড়ই উর্বর।

---

১. কোনো কোনো তুর্কী বন্ধু বলেছেন, তুরস্কে ইসলামের পরীক্ষার সময়ও এক শতাব্দী ছুঁইছুঁই হয়েছে।

২. সূরা আলে ইমরান : ২৭

বোরছায়

১৫ তারিখ বুধবার আমরা বোরছার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। এই শহরের অবস্থান ইস্তাম্বুলের দক্ষিণে। কিন্তু উভয় শহরের মধ্যখানে মরমরা সাগরের পূর্ব কোণ আড়াল থাকায় স্থলপথ অনেক ঘোরানো। তাই বোরছার সফর গাড়িতে প্রায় তিন থেকে চার ঘণ্টা। বলা হলো, স্টীমারের পথ অনেক সংক্ষিপ্ত। উছমান নূরী আফিন্দীর মত ছিলো, স্থলপথে যাওয়া হোক যাতে পথের পর্বতশ্রেণী ও উপকূলের শোভা উপভোগ করা যায়। হ্যাঁ, ফেরার সময় স্টীমারে আসা হবে। তার মত অনুযায়ী সফর শুরু হলো।

বোরছা যখন কাছে আসলো, বড়ই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য চোখে পড়লো। বহুদূর বিস্তৃত শহর। স্থানে স্থানে মসজিদের মিনারা যেন সূচালো পেন্সিল। এটি একটি প্রাচীন রোমান শহর, যা জয় করেছিলেন উছমানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান উছমান খান প্রথম। এটি ছিলো এক মহাবিজয়। সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ যখন ইস্তাম্বুল জয় করেন, তখন বোরছার পরিবর্তে রাজধানী হয় ইস্তাম্বুল। আমরা সাড়ে বারোটায় বোরছা পৌঁছি। আছরের পর শহর ও পাহাড়ে ভ্রমণ করি, এরপর শহরের উপকণ্ঠ প্রদক্ষিণ করি। বোরছায় 'মাদরাসাতুল উওয়ায ওয়াল খুতাবা' প্রতিষ্ঠিত। হিফযে কুরআনের জন্য মাদরাসা-মক্তবের সংখ্যাও প্রচুর। জানা গেলো, সেই মাদরাসা-মক্তবগুলোতে (কেবল বোরছায়) এক হাজার ছাত্র হিফযে কুরআন করছে। এই শহরে বুলগেরীয় মুজাহিদদের একটি বড় অংশ বাস করেন, যারা বুলগেরিয়ার ইসলামবিদ্বেষ ও অঘোষিত মুসলিম গণহত্যা থেকে বেঁচে এখানে আশ্রয় নিয়েছেন। আমাদের অবস্থানও ছিলো এক বুলগেরীয় বন্ধুর গৃহে। বুলগেরীয় মুজাহিদীন সম্পর্কে আমাদের প্রতিক্রিয়া ও সহানুভূতিজ্ঞাপক বক্তব্য বুলগেরীয় মেযবান তাঁর স্বদেশী লোকদেরকে শোনানোর জন্য রেকর্ড করে নেন।

পরের দিন সকাল নয়টায় ইস্তাম্বুল ফেরার জন্য আমরা বোরছা থেকে বের হই এবং ঘণ্টাখানেক কারযোগে সফরের পর 'এলুয়া' পৌঁছি। সেখানে সময়মতো স্টীমার পেয়ে যাই। এই সফর ছিলো বড় আনন্দদায়ক ও সুখপ্রদ। দেড় ঘণ্টা সাগরের বুকে সন্তরণ শেষে ইস্তাম্বুলের উপকূলে নোঙর করে স্টীমার। আমরা সেই স্টীমারে থাকা নিজেদের গাড়িতে চড়েই সরাসরি সড়কে চলে আসি। সন্ধ্যার অনুষ্ঠান ছিলো ইউসুফ রাজার গৃহে। তিনি কিছুদিন দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌতে অবস্থান করেছিলেন, তাই

উর্দূ ভাষায় পারদর্শী। কয়েকটি উর্দূ গ্রন্থও তিনি তুর্কী ভাষায় তরজমা করেছেন। এরপর আরব ছাত্রদের এক অধিবেশনে যোগদানের পরিকল্পনা ছিলো। যদিও অনেক দেরি হয়ে যায়, তবুও তাঁরা সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ ছিলেন। বিধায় তাঁদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখি।

করাচীর আড়াই দিন

পরদিন জুমাবার ছিলো ফেরার প্রস্তুতির দিন। পাকিস্তানের ভিসা পেতে প্রচুর সময় লেগে যায়। জুমার নামায 'মসজিদে ফাতেহ'-এ আদায় করার কথা ছিলো। খানার দাওয়াতও ছিলো এবং একটি প্রেস কন্‌ফারেন্সে যোগদানের প্রয়োজনও ছিলো। কিন্তু ভিসা পেতে এতই বিলম্ব হয় যে, দূতাবাসের কাছেই একটি মসজিদে জুমা আদায় করতে হয়। ফলে, মসজিদে ফাতেহ' এর কর্মসূচি আর রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। এশার কিছুক্ষণ পর এয়ারপোর্টে রওয়ানা হই। জাহাজ ছাড়ার সময় ছিলো রাত আড়াইটায়। কিন্তু বিলম্বিত হয়ে জাহাজ রওয়ানা হয় ভোর চারটায়। দুপুর নাগাদ করাচী পৌঁছে যাই। করাচী থেকে দিল্লীর ফ্লাইট যথাসময়ে না পাওয়ায় আড়াই দিন করাচীতে কাটাতে হয়। নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হলো।

২৮ জুন যোহরের সময় করাচী পৌঁছি। নিয়মানুসারে বিন্নূরী টাউনের জামে' মসজিদের ইমাম ও খতীব স্নেহাস্পদ কারী সৈয়দ রশীদুল হাসানের কাছে অবস্থান করি। করাচীর মত বিশাল শহর– যেখানে আমাদের পরিবারের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এবং শ্রদ্ধাভাজন ও বন্ধু-বান্ধবদের এক বৃহদংশ বাস করে, তাছাড়া রয়েছে বহুসংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনী মাদারেস, মারাকেয ও প্রতিষ্ঠান, সেখানে আড়াই-তিন দিনের অবস্থান নিজের ও আপনজনদের জন্য পিপাসা নিবারণকারী নয়, বরং পিপাসা সৃষ্টিকারী।

কিন্তু কোনো উপায় ছিলো না। এই সংক্ষিপ্ত সময়েও ইসলামাবাদ থেকে বহু দায়িত্বশীল বুযুর্গ, আন্তরিক বন্ধুজন ও স্নেহপরায়ণ ব্যক্তিবর্গ সাক্ষাতের জন্য তাশরীফ আনেন। দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বয়ানও হয়েছে– প্রথমটি ২৯ জুন সন্ধ্যায় করাচীর ফারান ক্লাবের পক্ষ হতে আহূত মধ্যাহ্নভোজের সময় হোটেল মেট্রোপুলে, জলসার সভাপতি ছিলেন করাচীর মেয়র আব্দুস সাত্তার আফগানী, আর দ্বিতীয়টি ৩০ জুন ১৯৮৬ আল্লামা বিন্নূরী টাউনের বিশাল ও সুবৃহৎ মসজিদে মাগরিবের পর।

ইসলামী সমাজের জন্য প্রকৃত সংকট ও শংকা

মেট্রোপুলের বক্তব্যের শিরোনাম ছিলো 'ইসলামী সমাজের প্রকৃত সংকট ও তার নিরসন'। এ বক্তব্য ছিলো– সে সব দৃশ্যাবলী ও তার প্রতিক্রিয়ার চিত্রায়ন, যা পাকিস্তানের বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘ সফরের সময় বারবার চোখে পড়েছে এবং এবার আরো প্রকট ও আশংকাজনকরূপে সামনে এসেছে। ঘটনাক্রমে সে সময় পাকিস্তানে বে-নজীর ভুট্টো এসেছেন এবং পাকিস্তানের শিক্ষিতমহল ও রাজনীতিবিদ এবং যারা সূচনা থেকে বর্তমান সরকারের বিরোধী কিংবা এখন তার উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে, তাদের একটি বৃহৎ অংশ বে-নজীরের আগমনকে এমনভাবে স্বাগত জানাচ্ছেন যেন আসমান থেকে কোনো ফেরেশতা নেমে এসেছেন। এবিষয়ে শরীয়ত কিংবা সভ্যতা-সংস্কৃতির আরোপিত লাজ-লজ্জাটুকুও উঠে যায়।

পাঠকের উদ্দেশ্যে একটি বিষয় বিনীতভাবে জানাতে চাই যে, আমার চিন্তা ও চেতনা, জ্ঞান ও গবেষণার মূল উৎস হলো কুরআন মজীদ এবং হৃদয়ের আকর্ষণ ও নিত্য অধ্যয়নের সবচেয়ে বড় বিষয় হলো জাতি, ধর্ম ও চরিত্র, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উত্থান-পতনের ইতিহাস এবং মানব সমাজের মন-মানসের অধ্যয়ন– কাজেই এ দৃশ্য দেখে অন্তরে বড়ই চোট লাগলো। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমি এক মর্মস্পর্শী দীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপন করি। তাতে আমি বলি, "কুরআন মজীদ ছহীহ ইসলামী সমাজের যে মানদণ্ড পেশ করেছে, তা হলো, তার অন্তর ও প্রকৃতিতে নেক চরিত্র ও মূল্যবোধের ভালবাসা মিশে থাকবে, তা তার স্বভাবে পরিণত হবে। এমন কোনো দাওয়াত, যাতে রয়েছে অবাধ্যতা ও প্রবৃত্তিপূজা, মানবাধিকারের পদদলন, মনুষ্যস্বভাবকে লাগামহীন ছেড়ে দেয়ার আহ্বান, মনের শান্তি কিংবা নফসের কামনা ও বাসনা চরিতার্থ করার জন্য বড় থেকে বড় জাতীয় ও সামাজিক স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়ার মানসিকতা, এমন দাওয়াত ও আন্দোলনকে এ সমাজ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবে।"

এক্ষেত্রে আমি কুরআন কারীমের একাধিক আয়াত তিলাওয়াত করে বর্তমানের অবস্থা ও পরিস্থিতির সঙ্গে তার সামঞ্জস্য সাধন করেছি। আমি বলেছি, "যে সমাজের এ অবস্থা হবে যে, কোনো বাঁশিওয়ালা বাঁশি বাজাবে, কোনো বাজিকর এসে যাদুর সবুজ বাগান দেখাবে, কিংবা যে কোনো ব্যক্তি নেতৃত্বের ঝাণ্ডা উঁচু করবে, অমনি দিশেহারা হয়ে তাকে এমন উষ্ণ অভ্যর্থনায় বরণ করে নেবে, যেন লোকেরা দীর্ঘদিন তারই অপেক্ষায় প্রহর গুনছিলো,

যেন এই একটি শূন্যতাই বিরাজ করছিলো, যা সে পূর্ণ করেছে। সে যখন ডাক দেয় মনে হয় যেন সিনা থেকে হৃদয় বেরিয়ে আসবে এবং সকল বাধা-প্রতিবন্ধকতা পশ্চাতে পড়ে থাকবে। সায়্যিদুনা হযরত আলী মুরতাযা (রা.) কূফাবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন :

أنتم أتباع كل ناعق

"তোমরা তো প্রত্যেক হট্টগোলকারীর পিছু নাও।"

এরপর আমি বললাম, "কুরআন মজীদে মূসা (আ.)-এর যুগের একটি বড় শিক্ষণীয় কাহিনী আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ○ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"আর আমি বনী ইসরাইলকে সমুদ্রের ওপারে পৌঁছে দিলাম। অতঃপর তারা এমন সম্প্রদায়ের কাছে এসে পৌঁছলো, যারা তাদের প্রতিমার পূজায় নিয়োজিত। তারা বললো, হে মূসা, এদের যেমন দেবতা আছে, আমাদের জন্যও কোনো দেবতা বানিয়ে দিন। (মূসা) বললেন, নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে বড় মূর্খতা রয়েছে। নিশ্চয় এ লোকগুলো যে ধান্ধায় লেগে আছে, তা সবই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তারা যা করছে সব ভ্রান্ত।"[১]

এর সারকথা ও পটভূমিকা এই যে, মূসা (আ.) নিজের সম্প্রদায়কে সাগর পার করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। বনী ইসরাইল দেখলো, এক জায়গায় মেলা বসেছে, দোকানপাট সেজে আছে, সব শ্রেণীর মানুষ রয়েছে। জানা গেলো, এসব আয়োজনের মূল কারণ, সেখানে কিছু প্রতিমা রাখা হয়েছে, সেগুলোর পূজা-অর্চনা চলছে। পূজা ও বিনোদন একসাথে। এমন জৌলুস ও বাহার দেখে বনী ইসরাইলের জিভে পানি এসে গেলো। অনিচ্ছায় তাদের মুখ দিয়ে বের হলো, "মূসা, এই লোকদের যেমন শরীরী ও চাক্ষুষ মা'বুদ রয়েছে, আমাদের জন্যও এমন এক মা'বুদের ব্যবস্থা করে দিন (যাকে আমরা চোখে দেখবো এবং তার নামে মেলা ও উৎসবের আয়োজন করবো)।"

---

১. সূরা আরাফ : ১৩৮-১৩৯

একথা শুনে হযরত মূসা (আ.)-এর নবীসুলভ আত্মমর্যাদা জেগে উঠলো। তিনি বললেন, "তোমরা চরম মূর্খ ও অকৃতজ্ঞ লোক। এরা যে ধান্ধায় মজে আছে তা ধ্বংসশীল এবং যে কাজ তারা করছে সবই বাজে ও বৃথা।"

আমাদের জন্য এ কাহিনীতে অনেক শিক্ষা রয়েছে। এরপর দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য খুবই ক্ষতিকর দু'টি বস্তুর কথা আলোচনা করেছি। ১. আদর্শগত বিক্ষিপ্ততা। ২. সমাজে অর্থ সঞ্চয়ের প্রতিযোগিতা ও তার চাকচিক্যের প্রদর্শনী। আমি বললাম, "আপনার সফলতা সমাজের সফলতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। সমাজের সফলতা ব্যতীত ব্যক্তির সফলতা সম্ভব নয়। নেতৃবৃন্দ, প্রচারকগণ, লেখকমণ্ডলি, চিন্তাবিদগণ ও প্রচারমাধ্যমগুলোকে এদিকে অবশ্যই দৃষ্টি দিতে হবে।"

নেয়ামতের শোকর ও বিচক্ষণতাপূর্ণ তুলনা

বিন্নুরী টাউনের জামে মসজিদে একটি বক্তব্যের আয়োজন হয়। বিষয়বস্তু ছিলো 'শোকর'। আমি বললাম, "শোকর কেবল মুখে কিছু হামদ-শোকরের শব্দ আওড়ানোর নাম নয়। বরং শোকর স্বতন্ত্র একটি কর্মপদ্ধতি, জীবনের একটি স্থায়ী আদর্শ ও মানসিক একটি অবস্থার নাম।" এরপর আমি পাকিস্তানের নাগরিক বিশেষ করে হিন্দুস্তান থেকে আগত ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, "দেখুন, আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে কেমন কেমন নেয়ামতে ধন্য করেছেন, শান্তি ও নিরাপত্তা দান করেছেন, নিখুঁত একটি মুসলিম সমাজ ও মুসলিম দেশে জীবন-যাপন এবং নিজের যোগ্যতাসমূহকে কাজে লাগানোর সুযোগ দিয়েছেন। 'আমরা কোন্ অবস্থায় ছিলাম, এখানে আসার পর আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কোথা থেকে কোথায় উন্নীত করেছেন, আমাদের জীবনের মান কেমন উন্নত হয়েছে, দ্বীনী শিক্ষা বাস্তবায়ন ও ইসলামী জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও পরিচয় বহন করে জীবন-যাপনের কী সুযোগ এখানে লাভ হয়েছে! কত যন্ত্রণা, নজরদারি, কুধারণা, দুর্ব্যবহার, ভিন্ন দল কিংবা সংখ্যাগুরুর ঘৃণা, বিদ্বেষ ও নিপীড়ন থেকে মুক্ত রয়েছি–' এসব কথা আপনাদের কতজনের স্মরণে থাকে।

হাদীছে নারী স্বভাবের একটি দুর্বলতার কথা বলা হয়েছে। এই দুর্বলতা থেকে সকলের বেঁচে থাকা উচিত। হাদীছে এসেছে, নারীর স্বভাবগত একটি দুর্বলতা হলো, সারা জীবন স্বামী তার প্রতি ইহসান করলো। হঠাৎ এক সময় তার কোনো চাহিদা বা দাবি পূরণে সামান্য ত্রুটি হয়ে গেলো। অমনি বলবে, আমি তো এই ঘরে এসে কখনো শান্তির মুখ দেখিনি, কখনো সুখের ছায়া

পাইনি। هل من مزيد (আরো চাই)-এর স্লোগান তো কিছুটা তাৎপর্য বহন করে। কিন্তু هل من جديد (নিত্যনতুন চাই) এর স্লোগান বড়ই বিপজ্জনক। অথচ এটিই বহু মুসলিম সমাজ ও স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতীকে পরিণত হয়েছে।"

এরপর আমি বললাম, "বহু মুসলিম ও আরব দেশে ইসলাম, ধর্মপ্রিয়তা, ইসলামী আইন বাস্তবায়নের দাবি ও ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে কি নিষ্ঠুর আচরণ করা হচ্ছে, তা আপনারা জানেন। আপনার চিন্তাধারা ও কর্মপন্থা বস্তুনিষ্ঠ, ইতিবাচক ও গঠনমূলক হওয়া উচিত। এরপর যেটুকুই অর্জিত হবে, তার উপর অটল অবিচল থাকতে হবে এবং দুআ করতে হবে যেন আল্লাহ তাআলা আরো তাওফীক দান করেন। সবকিছুর উত্তর নিরাশা ও সংঘাতের মাধ্যমে দেয়া মোটেই সমীচীন নয়। রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধে প্রথম মুহূর্তেই রণক্ষেত্র সাজানোর পরিবর্তে বোঝাপড়ার আশ্রয় নেয়া এবং উদ্ভূত বিষয়ে তাদেরকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করা উচিত।" এরপর আমি বললাম, ভারতের মতো ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক দেশে, যেখানে সংখ্যাগুরু শুধু অমুসলিমই নয়, বরং এক বিশেষ ঐতিহাসিক পর্যায় (বরং বহু পর্যায়) ও বিশেষ ঘটনাবলীর ধারা অতিক্রম করার কারণে তাদের মধ্যে এক ভিন্ন অনুভূতি জন্ম নিয়েছে– যা নিরপেক্ষভাবে বাস্তবসিদ্ধ পন্থায় সংখ্যালঘুদের কোনো সমস্যা, অনুভূতি বা ধর্মীয় প্রয়োজন অনুধাবনে কঠিনভাবে বাধা সৃষ্টি করে। তদুপরি, সমস্ত ইংরেজি ও হিন্দি প্রচারমাধ্যম মুসলমানদের বিষয়ে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে; কিন্তু দেশের সর্বপ্রধান দায়িত্বশীল তথা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বোঝাপড়ার পথ গ্রহণ ও সমস্যাকে অরাজনৈতিক রূপে পেশ করার ফলে তিনি কেবল এবিষয়ে আশ্বস্ত ও একমতই হননি, বরং এর প্রকাশ্য সমর্থক, সহযোগী ও পতাকাবাহী হয়েছেন এবং পার্লামেন্টে বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনুমোদন নিয়ে ক্ষান্ত হয়েছেন।[১] এরূপ সমাধা কি একটি নিখুঁত মুসলিম দেশে সম্ভব নয়?"

এরপর আমি বললাম, হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) আন্দোলন ও সংশোধনের যে কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলেন, সেটিই সবচেয়ে সফল কর্মপন্থা। এক ইয়েমেনী আলিমের ভাষায় তিনি ঈমানদারদের ক্ষমতার মসনদে

১. আমি এখানে তালাকপ্রাপ্তা মুসলিম নারীর ভরণপোষণের বিষয় ও ভারতীয় পার্লামেন্ট অনুমোদিত মুসলিম তালাকপ্রাপ্তা নারী আইনের প্রতি ইঙ্গিত করেছি। এর বিস্তারিত আলোচনা চতুর্থ অধ্যায়ে এসেছে।

পৌঁছতে বাড়াবাড়ি করেননি, বরং ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিতদের কাছে ঈমান পৌঁছানো, তাদেরকে ঈমানী ও দ্বীনী দাওয়াত ও প্রচেষ্ঠার ঝাণ্ডাবাহী বানানো এবং নিজে যা করতে চাচ্ছিলেন, তা তাদের হাতে করানোর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

এই দুই বক্তব্য ব্যতীত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ আরবী মাদরাসাসহ বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র ও ছোট সেমিনারে বক্তব্য রাখার সুযোগও হয়েছে। এতে আমি সুস্পষ্টভাবে বলেছি, মাদরাসা ও দ্বীনী দাওয়াত ইতিহাস দিয়ে চলে না, চলে তৎপরতা ও আন্দোলনের মাধ্যমে। সবসময় পূর্বসূরী ও আকাবিরের নাম আওড়ানো ও তাঁদের নিয়ে গর্ব করা, 'আমার বাপ এই ছিলো সেই ছিলো' বলে স্লোগান লাগানো শ্রোতাদেরকেও বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ করে তোলে। তাছাড়া আমি ভাষাগত, আঞ্চলিক ও গোত্রীয় সংকীর্ণতার আশংকার বিরুদ্ধেও সতর্ক করেছি এবং সকল অঞ্চল ও সম্প্রদায়ে দাওয়াত ও ইছলাহ, তালীম ও তারবিয়াতের প্রয়োজনীয়তার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।

৩০ জুন আমরা নিরাপদে দিল্লী পৌঁছি এবং দিল্লী থেকে আপন নিবাসে চলে আসি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইংল্যান্ড, আলজেরিয়া ও হিজাযের সফর, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক সেন্টার এবং আলজেরিয়ার 'ইসলামী চিন্তাধারার মিলনায়তন'-এর সেমিনারে অংশগ্রহণ, হিজাযে কয়েকদিনের অবস্থান ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ

অক্সফোর্ড ইসলামিক সেন্টারে

অক্সফোর্ড ইসলামিক সেন্টারে ২৭ আগস্ট ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে ব্যবস্থাপনা পরিষদের অধিবেশন এবং ১লা সেপ্টেম্বর কায়রোতে 'আন্তর্জাতিক ইসলামী গবেষণা পরিষদ'-এর জলসা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এতদুভয়ের সঙ্গে আমার দায়িত্বের সম্পর্ক ছিলো। তাই উভয় জলসায় অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। শাইখুল আযহার শাইখ জাদুল হক আলী জাদুল হক-এর পীড়াপীড়িতে ফেরার পথে মিসর হয়ে হিন্দুস্তান আসার ইচ্ছা ছিলো। যখন 'ইসলামী গবেষণা পরিষদ' (যার অধিকাংশ রুকন মিসরের) কায়রোতে অধিবেশন আহ্বান করলো, তখন আমি শাইখুল আযহারকে জানালাম, সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে লন্ডন থেকে ফেরার পথে আমরা আযহারের দাওয়াতে মিসর যেতে পারি। ২৬ আগস্ট ১৯৮৬ ইং সকালে স্নেহাস্পদ মুহাম্মদ রাবে' নদভীকে সঙ্গে করে লন্ডনে এবং দুপুর নাগাদ অক্সফোর্ডে পৌঁছে যাই।

২৭ থেকে ২৯ পর্যন্ত অক্সফোর্ডেই অবস্থান করি। সেখানের অধিবেশন শেষ করে পুনরায় লন্ডন যাই। ৩০ ও ৩১ তারিখ লন্ডনে অবস্থান করি। কায়রো থেকে শাইখুল আযহারের পক্ষ হতে প্রস্তাবিত তারিখ সম্পর্কে অপারগতা প্রকাশ করা হয়। মনে মনে তার কারণ চিন্তা করে এই ফলাফল বের হলো যে, হতে পারে সেখানের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সাধারণ নির্বাচনের প্রেক্ষিতে এসময় আমাদের মিসরের সফর উচিত মনে করা হয়নি। তাই এমন পরিস্থিতিতে কেবল (১লা সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য)

ইসলামী গবেষণা পরিষদের উদ্দেশ্যে কায়রো যাওয়া, সরকার ও আযহারের দাওয়াত ব্যতীত সেখানে অবস্থান ও সেখানের বিভিন্ন মজলিসে অংশগ্রহণ ও সাক্ষাৎকার প্রদান ভালো মনে হয়নি। তাই মিসর সফরের চিন্তা বাদ দিয়ে দেই। এর পরিবর্তে আলজেরিয়ায় সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক সেমিনার 'মুলতাকাল ফিকরিল ইসলামী' (ইসলামী ধ্যান-ধারণার মিনলায়তন)-এ অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি (যেখানে ইতিপূর্বে ১৯৮২ সালের জুলাই মাসে অংশগ্রহণ করেছিলাম[১])।

এবার কেবল আযহারের দাওয়াত ও মিসর সফরের ভিত্তিতে তাতে অংশগ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করেছিলাম। কিন্তু মিসর সফর মুলতবী হওয়ায় তাতে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বিধায় আলজেরিয়া যাওয়ার নিয়ত করি। ইসলামী বিশ্ব ও আরব দেশসমূহে বিভিন্ন সরকার ও সংস্থার পক্ষ থেকে যেসব সেমিনার আয়োজন করা হয়, তন্মধ্যে আলজেরিয়ার এই সেমিনার বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও গুরুত্বের অধিকারী।

আলজেরিয়ার সেমিনারে

এবার আলজেরিয়া (আল-জাযায়ের)-এর 'মুলতাকাল ফিকরিল ইসলামী'র শিরোনাম ছিলো الإسلام والعلوم الإنسانية 'ইসলাম ও মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান'। আমি دور الإسلام الثوري البناء في مجال العلوم الإنسانية 'মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসলামের বৈপ্লবিক ও গঠনমূলক ভূমিকা' শিরোনামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ তৈরি করেছিলাম এবং একটি কপি সেমিনারের সেক্রেটারির কাছে পূর্বেই পাঠিয়েছিলাম। এবার এই সেমিনার হচ্ছিলো আলজেরিয়ার রাজধানী থেকে ৩০০ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত এক কেন্দ্রীয় শহর 'সেটিফ'এ। শহরটি রোমান শাসনামল থেকে প্রতিষ্ঠিত এবং তার নামও রোমান সময়ের। এ শহর আলজেরিয়ার আযাদী আন্দোলন ও ইসলামী পুনর্জাগরণের মহান পথিকৃৎ শাইখ বাশীর আল-ইবরাহীমী'র জন্মভূমি হওয়ার সৌভাগ্যে ধন্য এবং অঙ্গরাজ্যের রাজধানীও বটে। প্রথম যখন এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছিলাম, তখন তা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো তেলমেসান শহরে। প্রতিবছর এই সেমিনার দেশের কোনো গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় শহরে আয়োজনের চেষ্টা করা হয় যাতে প্রত্যেক বড় শহরের লোকেরা উপকৃত হতে পারে এবং প্রতিনিধিরা দেশের বিভিন্ন শহর দেখার ও সেখানের আহলে ইলমদের সঙ্গে সহজে সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন।

---

১. বিস্তারিত দেখুন 'কারওয়ানে যিন্দেগী' ২য় খণ্ড, ৩৫২-৩৫৭ পৃষ্ঠা

আমরা ১লা সেপ্টেম্বর সোমবার যোহরের সময় লণ্ডন থেকে আলজেরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই এবং মাগরিবের সময় আলজেরিয়ার এয়ারপোর্টে অবতরণ করি।

প্রথমবার আমরা দু'দিন বিলম্বে পৌঁছেছিলাম। তাই এয়ারপোর্টে অভ্যর্থনার জন্য লোক ছিলো না; কিন্তু এবার লোকজন উপস্থিত ছিলো। তারা আমাদেরকে একটি বড় হোটেলে নিয়ে যায়। পরদিন ২ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সকালে গাড়িতে সেমিনারের স্থান সেটিফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। উদ্বোধনী অধিবেশনেই পৌঁছে যাই সভাস্থলে – ২ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সকাল ১১টায় তা আরম্ভ হচ্ছিলো। সেমিনারের প্রাথমিক কর্মসূচির একাংশে আমাকে প্রবন্ধ পাঠের সুযোগ করে দেয়া হয়। সাইক্লোস্টাইলের মাধ্যমে পূর্ব থেকেই প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রবন্ধের কপি বিতরণ করা হয়েছিলো, তার ইংরেজি তরজমাও আমাদের কাছে ছিলো। প্রবন্ধ সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর পর্বের সময়ও রাখা হয়েছিলো।

কয়েকদিন স্থায়ী সেমিনার শেষে শুক্রবার প্রাদেশিক শাসক (গভর্নর) এর সঙ্গে শহরের নবনির্মিত মসজিদে জুমার নামায আদায় করি। মসজিদটি শাইখ বাশীর আল-ইবরাহীমীর নামে ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নির্মিত। ঐ জুমা থেকেই মসজিদ উদ্বোধন করা হচ্ছিলো। উপরোক্ত সেমিনারে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক ও চিন্তাবিদকর্তৃক বড় গুরুত্বের সঙ্গে লিখিত ২৭-২৮ টি প্রবন্ধ পাঠ করা হয়।

সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ

উক্ত সেমিনারে আমার উপস্থাপিত প্রবন্ধে প্রমাণ করা হয়েছে যে, ইসলাম মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক, মৌলিক ও গঠনমূলক কৃতিত্ব ও ভূমিকা পালন করেছে। এক্ষেত্রে প্রথমে (সমসাময়িক যুগের জ্ঞান, আদর্শ ও বুদ্ধিবৃত্তির নেতৃত্বদানকারী) প্রাচীন গ্রীস, ইরান ও হিন্দুস্তানের উত্থান-পতনের বাস্তবসম্মত ও নিরপেক্ষ পর্যালোচনা পেশ করা হয়। ঐ সব দেশে স্ব স্ব যুগে যুক্তিশাস্ত্র (দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা), গণিতশাস্ত্র, সাহিত্য ও কাব্যচর্চা উন্নতির কেমন স্বর্ণশিখরে উন্নীত হয়েছিলো, সেসব দেশের মেধাবী ও প্রতিভাধর ব্যক্তিরা কীভাবে আকাশ থেকে তারা ছিনিয়ে এনেছিলো, কীভাবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের গভীরে পৌঁছেছিলো এবং জ্ঞান, সভ্যতা ও সংস্কৃতিবিষয়ক মতবিনিময়, পঠন ও পাঠনের কেমন জৌলুস সৃষ্টি হয়েছিলো, তা পাশ্চাত্য লেখক ও ঐতিহাসিকদের বর্ণনা ও ব্যাখ্যার আলোকে উপস্থাপন করা হয়।

এরপর নির্ভরযোগ্য পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের গ্রন্থাবলির বরাত দিয়ে আমি বলেছি, "জ্ঞান, মেধা, প্রতিভা, গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব (আধুনিক ও প্রাচীন ইতিহাসে যার দৃষ্টান্ত মেলা ভার) সত্ত্বেও এই তিন দেশ (গ্রীস, ইরান ও হিন্দুস্তান)-এর জীবনে কেমন বৈপরীত্ব, স্ববিরোধিতা ও অদ্ভুত দৃশ্যাবলী বিরাজিত ছিলো, সেখানের প্রতিমাবিদ্যা ও পুরাণতত্ত্ব (Mythology) জ্ঞান ও যুক্তির দৃষ্টিতে কেমন হাস্যকর, হীন, বীভৎস ও অন্তঃসারশূন্য স্তরে পৌঁছেছিলো, তা এক অদ্ভুত কাহিনী। তাদের সভ্যতার প্রগতি, জ্ঞানের উন্নতি ও বুদ্ধির অগ্রযাত্রা এপথে মোটেও বাধা সৃষ্টি করতো না। আর এক্ষেত্রে এক দেশ অন্য দেশ থেকে পিছিয়ে ছিলো না। আবার এর সাথে নৈতিক স্খলন, সামাজিক নৈরাজ্য ও যৌন অরাজকতা এমন স্তরে পৌঁছে গিয়েছিলো, যার কল্পনা করাও বর্তমান সময়ে দুষ্কর।"

এবিষয়ে গ্রীস সম্পর্কে পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের এমন সাক্ষ্য-প্রমাণ, হিন্দুস্তান ও ইরান সম্পর্কে সেখানকার ইতিহাসবিদদের এমন অকাট্য বর্ণনা পেশ করেছি, যা পড়ে লজ্জার চোখ অবনত ও সভ্যতার ললাট ঘর্মাক্ত হয়ে উঠে। তাছাড়া, সেই পরিস্থিতির মোকাবেলায় যেসব প্রতিক্রিয়ামূলক আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিলো, সেগুলোর চরমপন্থা, দিশাহীনতা ও ব্যর্থতার ফিরিস্তিও দেয়া হয়েছে। এরপর এই জটিলতার প্রতিকারপদ্ধতি ও তার আসল কারণ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। যুক্তি ও বাস্তবতার আলোকে প্রমাণ করা হয়েছে যে, এর আসল কারণ হলো, জাগতিক উন্নতি ও অগ্রগতির স্বর্ণযুগে আসমানী পথনির্দেশ ও নুবুওয়তের ধারা থেকে ঐ দেশগুলোর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো এবং গ্রীসসহ আরো কিছু উন্নত দেশ তখন তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির উপর গর্ব করতো এবং আম্বিয়ায়ে কেরামকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও ঘৃণার চোখে দেখতো। তারা গর্বভরে বলতো, "ওরা আমাদেরকে কী শিক্ষা দিবে, কীইবা বুদ্ধি করবে আমাদের জ্ঞানসাগরে?" কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ
وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

"যখন রাসূলগণ তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আসলেন, তখন তারা সেই জ্ঞানের উপর (বড়ই) গর্ববোধ করলো, যা তাদের কাছে ছিলো। আর তাদের উপর সেই শাস্তি আপতিত হলো, যা নিয়ে তারা বিদ্রূপ করতো।"[১]

১. সূরা মু'মিন : ৮৩

এরপর, নুবুওয়তের কী প্রয়োজন, আম্বিয়ায়ে কেরাম কী দান করেন, বিশ্বাস ও কর্ম এবং সভ্যতা ও চরিত্রের বিষয়ে তাঁরা কী মূলনীতির যোগান দেন সে-সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। তারপর বলা হলো, সেসব দেশে দর্শন-যুক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান মূলতঃ সমাজ ও সাধারণ জীবনে কোনো ভালো প্রভাব বিস্তার করেনি, বরং জ্ঞান ও চরিত্রের মধ্যে পরস্পরবিরোধ, জ্ঞানী ও সাধারণ জনগণের মধ্যে দূরত্ব ও সম্পর্কহীনতার জন্মই দিচ্ছিলো। জ্ঞানের বিভাগগুলোতে কেবল গোলযোগই বিদ্যমান ছিলো না, বরং প্রায়ক্ষেত্রে বিরাজিত ছিলো পরস্পর বিরোধ ও সংঘাতের পরিস্থিতি। ইলম ও আমলের মধ্যে বন্ধন ছিলো না, জ্ঞানী ও দার্শনিকদের মধ্যে সমাজ সংস্কারের স্পৃহা ও দায়িত্বের কোনো অনুভূতি ছিলো না। প্রত্যেকে যার যার অবস্থায় মগ্ন ও কল্পনার জগতে তন্ময় ও অচেতন হয়ে রয়েছিলো।

ইসলাম এসে এই পরিবেশ ও পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে, মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে সঞ্চার করেছে এক নতুন প্রাণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের গতি ও দিক সংশোধন করেছে, তাতে মহৎ লক্ষ্য সৃষ্টি করেছে, বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে এবং সৃষ্টি ও মানবজীবনের সঙ্গে সেগুলোর সম্পর্ক দৃঢ় করেছে, জ্ঞানের বিক্ষিপ্ত ও অগোছালো বিভাগগুলোর মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয়, সংহতি ও সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি করেছে। ইসলাম জ্ঞানী ও সচেতন মহলকে সমাজের রক্ষক ও পর্যবেক্ষক এবং অজ্ঞ ও অশিক্ষিত লোকদের শিক্ষক ও মুরব্বী বানিয়ে দিয়েছে, যাদের মধ্যে আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার অনুভূতি নেই, তাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় ও বিশ্বাস সৃষ্টি করেছে। পাঠগ্রহণ ও পাঠদানের ধারা, বিভিন্ন বস্তুর তত্ত্ব উদ্ঘাটন, ইলমী তৎপরতা ও শিক্ষাগত যাত্রাকে আল্লাহর নামে শুরু করা ও আল্লাহরই নির্দেশনায় এই সফর পরিচালিত করার উপদেশ দিয়েছে। কেননা, ইলমের উপত্যকা এমন কণ্টকময়, অমসৃণ ও সংকটপূর্ণ যে, এখানে দিনদুপুরে কাফেলা লুট হয় এবং পথিক পথ হারায়। ইসলাম তো প্রথম ওহীর সূচনাই করেছে এভাবে-

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

"পড় নিজের প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।"[১]

এরপর এ বিষয়ে ইসলামের বিশ্বব্যাপী জ্ঞান-বিপ্লব এবং ইসলামের অগ্রদূত ও প্রতিনিধিগণের বৈশিষ্ট্যাবলী ও বিশেষ কয়েকজনের নমুনাও পেশ

১. সূরা আলাক : ১

করা হয়েছে। শেষে (কানের রুচি পরিবর্তন ও দীর্ঘ বুদ্ধিবৃত্তিক প্রবন্ধ শোনার ক্লান্তি কাটানোর জন্য) যুবকদেরকে সেই যাত্রীদলের কাহিনী শোনানো হয়েছে, যারা একটি নৌকায় আরোহণ করে ভ্রমণে বের হয়েছিলো এবং অশিক্ষিত মাঝিকে বিনোদনের উপকরণ বানিয়ে একেকটি বিষয় ও শাস্ত্রের নাম নিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলো, "তুমি এ বিষয় পড়েছো? ঐ বিষয় পড়েছো? এ শাস্ত্র সম্পর্কে তোমার জ্ঞানের পরিসর কতটুকু?" সে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে বলছিলো, "আমি কিছুই জানি না। কোনো পড়ালেখাই আমি করিনি।" তারা তার বয়স জিজ্ঞাসা করে বললো, "তুমি তো অর্ধজীবন নষ্ট করে ফেলেছো।" আল্লাহর ইচ্ছায় একটু পর সাগরে ঝড় উঠলো। তখন সেই অশিক্ষিত মাঝি সুন্দর কৌশল হাতে পেলো। বললো, "বাবারা, তোমরা কি সাঁতারও শিখেছো?" তারা বললো, "না।" মাঝি বললো, "আমি তো অর্ধজীবন নষ্ট করেছি, কিন্তু তোমরা সাঁতার না শিখে তো পুরো জীবনই সাগরে নিমজ্জিত করতে যাচ্ছো।" সফলতার সঙ্গে জীবনসমুদ্র পাড়ি দিয়ে মুক্তির মোহনায় পৌঁছার জন্য ঐ জ্ঞানই একমাত্র অবলম্বন, যা কেবল আম্বিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমেই হাছিল হয়।[১]

২ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ সেপ্টেম্বর আছরের সময় সেমিনার সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত সেটিফে অবস্থান করি। বিভিন্ন আরব দেশ থেকে জ্ঞানীগুণী ও পণ্ডিতদের এক বৃহৎ দল উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন পুরনো বন্ধুও ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে থাকে। মিসরের বহুলপ্রচারিত দৈনিক 'আল-আহরাম'-এর প্রতিনিধি একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকারও গ্রহণ করেন, যেখানে সময়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে মতামত পেশ করেছি।

জুমাবার আছরের সময় গাড়িতে আরোহণ করে এশার সময় রাজধানী আল-জাযায়ের ফিরে আসি। 'মুলতাকা'র দায়িত্বশীলগণ আলজিয়ার্স এয়ারলাইন্স থেকে কায়রোর জন্য এবং কায়রো থেকে সউদী এয়ারলাইন্সের মাধ্যমে জিদ্দার জন্য ফার্স্ট ক্লাস দু'টি আসন সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। সেদিন আল-জাযায়েরে জেদ্দাগামী কোনো বিমান ছিলো না। তাই তাঁরা এই ব্যবস্থা করলেন। রাত হোটেলে কাটিয়ে আমরা কায়রোর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। আল-জাযায়েরের বিমানে 'বিমানের সকল খাবার হালাল ও গোশত যবাইকৃত, এতে সন্দেহজনক কোনো বস্তু নেই-- এই ছাপানো বিজ্ঞাপন দেখে

১. এই প্রবন্ধ স্বতন্ত্র পুস্তিকারূপে প্রকাশিত হয়েছে

আনন্দিত হলাম। সকালে আল-জাযায়ের থেকে রওনা হয়ে সকাল এগারোটায় কায়রো পৌঁছি। ১৯৫১ সালের পর প্রায় ৩৫-৩৬ বছরের ব্যবধানে আমরা আবার মিসরের মাটিতে পা রাখি। বিমানবন্দরের বহির্ভাগে বোর্ড ঝুলছে, যাতে শোভা পাচ্ছে কুরআন মজীদের আয়াত [ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ] {يوسف:}। হয়তো অন্য কোনো দেশের পক্ষে তার প্রবেশদ্বারে কুরআন মজীদের এমন অর্থ ও তাৎপর্যপূর্ণ আয়াত লেখার সুযোগ নেই। কিন্তু কায়রোর বিমানবন্দরে কর্মচারীরা এমন আচরণ ও ব্যবহার দেখায়নি, যা উক্ত আয়াতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের কাছে ছিলো দু'টি ফার্স্ট ক্লাস টিকেট। জেদ্দার আসনও সংরক্ষিত ছিলো। কিন্তু মুসাফিরদের খোঁজখবর নেয়ার কেউ ছিলো না। দায়িত্বরত লোকগুলো আরবীর পরিবর্তে ইংরেজিতে কথা বলতে বেশি পছন্দ করছিলো এবং নিয়মিত রুক্ষ ভাষায় পাচ্ছিলাম তাদের উত্তরগুলো। না কোথাও বিশ্রামের ব্যবস্থা, না ওযু-নামাযের সুবিধা। যখন কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করতাম, বলতো, "বিমানের যাত্রার অপেক্ষা করো।"

এগারোটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত সেখানে কাটাতে হলো। এটি ছিলো ১লা মুহাররম ও ৬ সেপ্টেম্বর। মাগরিবের সময় রওয়ানা হয়ে এশা নাগাদ জেদ্দা পৌঁছি। সেখানে গিয়ে মনে হলো, আমরা আমাদের আসল ঠিকানায় এসে পৌঁছেছি। দু'রাত একদিন জেদ্দায় কাটাই। ৮ সেপ্টেম্বর মদীনা মুনাওয়ারার উদ্দেশ্যে রওনা হই, সেখানে জুমাবার পর্যন্ত অবস্থান করি। ১৩ সেপ্টেম্বর শনিবার মক্কা মুকাররামার উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। ওমরা আদায় করে ১৩ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করি। ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দ ২০ সেপ্টেম্বর জুমার দিন সকালে কুয়েতের পথে দিল্লী রওয়ানা হই এবং দিল্লী থেকে আপন নিবাস লক্ষ্ণৌ এসে পৌঁছি।

পুরনো বন্ধু মাওলানা হাফেয মুহাম্মদ এমরান খান সাহেব নদভীর পরলোকগমন

১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দে ১৮ অক্টোবর হঠাৎ হাফেয কারামত সাহেব দেহলভীর টেলিফোনে পুরনো সাথী বন্ধুবর মাওলানা হাফেয মুহাম্মদ এমরান খান সাহেব নদভীর পরলোকগমনের কথা জানতে পারি। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। কিন্তু (আল্লাহর অপার কৃপা ও দানে) তিনি স্বীয় অস্বাভাবিক ইচ্ছাশক্তি, সহ্যক্ষমতা ও উন্নত মনোবলের

সাহায্যে কাজ অব্যাহত রেখেছিলেন। ১৯৮৫ খ্রীস্টাব্দ ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি সাইয়িদ সুলাইমান নদভী রহ.-এর স্মরণে তাজুল মাসাজিদ ভূপালে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারের আয়োজন করেছিলেন, যা ছিলো আপন মহিমায় অনন্য ও অবিস্মরণীয়। সম্ভবতঃ উপমহাদেশে সাইয়িদ সাহেবের স্মরণে এমন শানদার, তাৎপর্যবহ ও জাঁকালো সেমিনার আর অনুষ্ঠিত হয়নি।[১] তাঁর মৃত্যুর আকস্মিক খবর বিনামেঘে বজ্রপাত হয়ে আঘাত হানে মন ও মস্তিষ্কে। তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃবন্ধন ও কর্মক্ষেত্রে সহযাত্রার বয়স অর্ধ শতাব্দীর কম নয়। তিনি আমার সহপাঠীও। তাঁর দারুল উলূমে অবস্থানকালে (যেখানে তিনি বহু বছর মুহতামিম ছিলেন) আমি তাঁর সহকর্মী ছিলাম। তিনি সেই বন্ধুত্বের হক এভাবে আদায় করেছেন যে, اليد العليا خير من اليد السفلى -এর মর্যাদা ও কৃতিত্ব তাঁরই ভাগে ছিলো। আমি তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ, মার্জিতভাব, বিশ্বস্ততা, সুউচ্চ মনোবল ও মহানুভতার এমনসব দৃষ্টান্ত দেখেছি, যা এযুগে একেবারে অসম্ভব না হলেও খুবই দুর্লভ বটে।

এই গভীর সম্পর্কের মধ্যে উক্ত বজ্রতুল্য সংবাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া তো এই হওয়াই স্বাভাবিক ছিলো যে, আমি ও দারুল উলূমের বিশেষ ব্যক্তিরা খবর শুনেই ভূপাল রওয়ানা হয়ে তাঁর দাফনকার্যে শরীক হবো; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে লক্ষ্ণৌ থেকে ভূপালের সরাসরি কোনো সার্ভিস ছিলো না, কোনোভাবেই ঐ সময় পৌঁছার সুযোগ ছিলো না। দ্বিতীয় সমস্যা এই দাঁড়ায় যে, পরদিন অর্থাৎ ১৯ অক্টোবর সীতাপুরে দ্বীনি শিক্ষা কাউন্সিলের এক গুরুত্বপূর্ণ কনফারেন্স। তাতে আমাকে সভাপতিত্বও করতে হবে, বক্তব্যও রাখতে হবে। তাই আমি ১৮ বা ১৯ অক্টোবরের পরিবর্তে স্নেহাস্পদ মওলভী মুঈনুল্লাহ সাহেব নদভী, মওলভী আবুল ইরফান সাহেব নদভী, মাওলানা মাহবুবুর রহমান সাহেব আযহারী এবং স্নেহের আব্দুর রাজ্জাককে সঙ্গে নিয়ে ২০ অক্টোবর ভূপাল পৌঁছি।

মরহুমের পরিবারের সদস্যগণ, 'দারুল উলূম তাজুল মাসাজিদ'-এর কর্মকর্তাবৃন্দ এবং তাবলীগী জামাতের বিশিষ্ট বন্ধুমহল ও সাথী-সঙ্গীরা শুধু নয়, বরং পুরো শহরই ছিলো শোকসন্তপ্ত ও সান্ত্বনা পাওয়ার যোগ্য। তাজুল

---

১. উক্ত সেমিনারের বিস্তারিত বিবরণ ও তাতে উপস্থাপিত প্রবন্ধমালার বিশ্লেষণের জন্য দেখুন ড. মাসউদুর রহমান খান নদভী ও ড. মুহাম্মদ হাসসান নদভী 'মুতালাআয়ে সুলাইমানী'।

মাসাজিদের নির্মাণ ও সজ্জা তাঁর জীবনের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি এবং তাঁর দৃঢ় সংকল্প, হিম্মত ও কর্মশক্তির উজ্জ্বল নমুনা। এর প্রতিটি ইট-কণা তাঁর জীবন্ত স্মারক। এখানেই সমগ্র হিন্দুস্তানে তাবলীগী জামাতের সর্ববৃহৎ ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়। এটি তাঁরই রেখে যাওয়া অবদান ও মেহনতের ফসল। সেই মসজিদে অনুষ্ঠিত তাঁর শোকসভায় আমি নিজের প্রতিক্রিয়া ও আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করি। আলোচনা করি তাঁর আল্লাহপ্রদত্ত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির কথা। আমি বলি, "তাঁর বিদায়ের পর তাঁর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণ-যুবক, তাঁর সহকর্মীগণ, শুভাকাঙ্ক্ষী ও শহরবাসীদের উপর কী দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তা ভেবে দেখতে হবে। এই প্রতিক্রিয়া শুধু এই জলসা ও ভূপালে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তার পরিসর আরো অনেক বিস্তৃত ও সুদূরপ্রসারী। আল্লাহ তাআলা তাঁর দরজা বুলন্দ করুন, তাঁর রেখে যাওয়া নিদর্শনসমূহকে অক্ষয় কীর্তি ও ছদকায়ে জারিয়ায় রূপান্তরিত করুন।"

হারাম শরীফের ইমাম ও 'রাবেতা আলমে ইসলামী'র মহাসচিবের লক্ষ্ণৌ ও দারুল উলূমে আগমন

১৯৮৬ সালের ১লা নভেম্বর হারাম শরীফের ইমাম শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ সুবাইল, রাবেতা আলমে ইসলামীর মহাসচিব ড. আব্দুল্লাহ উমর নাছীফ, হিন্দুস্তানে নিযুক্ত সউদী রাষ্ট্রদূত ছাদেক ফুয়াদ মুফতী এবং তাঁদের সফরসঙ্গীগণ দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার দাওয়াতে লক্ষ্ণৌ তাশরীফ আনেন। হারামের সুবাদে লক্ষ্ণৌর বিমানবন্দর ও শহরে তাঁদেরকে এমন উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়, বাইরের মেহমানদের ক্ষেত্রে লক্ষ্ণৌর ইতিহাসে তার কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। ভাগ্যক্রমে দিনটি ছিলো জুমাবার। দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে তাঁদের সম্মানে সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। কয়েক লাখ লোকের সমাগম। ইংরেজি সংবাদপত্রগুলোতে বলা হয়, 'উত্তাল জনসমুদ্র'। সভায় উপস্থিত হন উত্তরপ্রদেশের গভর্নর জনাব উছমান আরিফ নকশবন্দী সাহেব, ইউপি পার্লামেন্টের স্পীকার নিয়াজ হাসান খান সাহেবসহ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীবর্গ, সরকারী কর্মকর্তা, বুদ্ধিজীবী, ওলামায়ে কেরাম, প্রফেসর ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের এক বৃহৎ অংশ। আমি আমার বক্তব্যে

[جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ] {المائدة:} -এর তাফসীরের উপর আলোকপাত করে বলি, অদৃশ্যভাবে বিশ্বব্যবস্থা বাইতুল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং আকীদা-বিশ্বাস, আমল ও নীতিনৈতিকতার ব্যবস্থাপনা

সেই দাওয়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত এই বাইতুল্লাহ। আমি বলি, "আমি অবশ্যই স্বীকার করছি যে, قياما للناس এর সঠিক ও নিখুঁত তরজমা সম্ভব নয়। উর্দু ভাষায় যত অনুবাদ দেখেছি, তাতেও قياما للناس -এর যথাযথ তরজমা হয়েছে বলে আমি আশ্বস্ত হতে পারিনি। হ্যাঁ, এর ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি।"

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কা'বা শরীফকে মানুষদের জীবনের মূলভিত্তি বানিয়েছেন। এই বিশ্বব্যবস্থা প্রকৃতভাবে না কোনো শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত, না কোনো সংস্থার সঙ্গে; আর না কোনো সামরিক শক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত, না কোনো নৈতিক দর্শন, সভ্যতা ও জ্ঞানের কেন্দ্রের সঙ্গে। বিশ্বব্যবস্থা, যতদূর পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টি পৌঁছতে পারে না, সবই বায়তুল্লাহ শরীফ এবং সেই দাওয়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যার জন্য বায়তুল্লাহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশুদ্ধ আকীদা, উত্তম আদর্শ ও চরিত্র, মানবতার বন্ধন, ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা, মানবতার মর্যাদা, সর্ববিষয়ে আল্লাহকে হাজির-নাজির বিশ্বাস করার উপরই প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্বব্যবস্থা। আর এসব কিছুর মূলকেন্দ্র হলো সেই দাওয়াত, সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সেই শিক্ষা ও সংস্কৃতি– যার প্রথম দাঈ সায়্যিদুনা হযরত ইবরাহীম (আ.), যার মুজাদ্দিদ ও সংস্কারক, পরিপূরক ও রক্ষক সায়্যিদুনা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং যার প্রতিনিধিত্ব করে বাইতুল্লাহ শরীফ ও মসজিদে নববী।

এই আয়াতের আলোকে আমাদের হিন্দুস্তানী মুসলমানদের উপরও দায়িত্ব আরোপিত হয়। এখানে দ্বীনি দৃষ্টিকোণ থেকে এই ইসলামী মিল্লাতই বাইতুল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করছে। আল্লাহ না করুন, যদি এই দেশ ক্রমবর্ধমান সম্পদলিপ্সা, জুলুম ও নির্যাতন, নিত্যদিনের নৈরাজ্য ও অরাজকতা, স্বার্থপরতা ও বিবেকহীনতা এবং মানবতার অবমূল্যায়নের কারণে ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে লজ্জা পেতে হবে। তিনি অবশ্যই আমাদের বিরুদ্ধে নালিশ দিবেন। কেননা, আমরা এমন নবীর উম্মত, যাঁর উপাধি 'রহমতুল লিল আলামীন' (সমগ্র জগতের দয়া),

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ}(الأنبياء:١٠٧)

"আমি আপনাকে একমাত্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমতরূপে প্রেরণ করেছি।"

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

'আল্লাহর শান এমন নয় যে, যতদিন আপনি তাদের মাঝে উপস্থিত থাকেন তাদেরকে শাস্তি দেবেন। আর এমনও নয় যে, তারা ক্ষমা চাইতে থাকবে, আর তিনি তাদেরকে আযাব দিবেন।'[১]

অতএব, যে উম্মত সেই রহমতের নবীর সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাঁর শিক্ষা ও দীক্ষার ধারক-বাহক এবং তাঁরই ছাঁচে গড়া, সে উম্মতের উপস্থিতিতেও কোনো দেশ ধ্বংস হওয়া কাম্য নয়। তাকে অবশ্যই এই সত্যগুলো সজীব রাখার, দেশের সুরক্ষা ও হিফাযতের এবং দেশকে সংঘবদ্ধ আত্মহত্যা ও ধ্বংস থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব নিতে হবে।"

আমার পরে সম্মানিত মেহমানদ্বয় বক্তব্য রাখেন, উপস্থিত-অনুপস্থিত ভারতীয় মুসলিম জনসাধারণের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ নছীহত পেশ করেন এবং খাঁটি তাওহীদ, তাকওয়া, সঠিক ধার্মিকতা, বিশুদ্ধ দেশপ্রেম ও সময়ের দাবি পূরণের উপদেশ দান করেন।

---

১. সূরা আনফাল : ৩৩

সপ্তম অধ্যায়

দিল্লী, নাগপুর ও পুনার সংলাপ

যে ডালে নীড়

বহু শতাব্দী পূর্বে কোনো দগ্ধহৃদয় কবি তার শহর ও জন্মভূমি সম্পর্কে– যেখানে সে শিকার হয়েছিলো স্বদেশীদের অন্যায় ও অনাচারের– এই কবিতা পাঠ করেছিলো,

لا أذود الطير عن شجر

قد بلوت المر من ثمره

আমি এমন বৃক্ষ থেকে তার ক্ষতিকারী পাখি তাড়াতে প্রস্তুত নই, যার তিতা ফলই আমার ভাগ্যে জুটেছে।

কোনো উর্দূ কবিও বলেছিলেন,

بلبل نے آشیانہ چمن سے اٹھالیا

اس کی بلا سے بوم رہے یا ہما رہے

বুলবুলি বাগান থেকে তার নীড় তুলে নিয়েছে, এর ফলে তাতে পেঁচক থাকুক বা হুমো, কোনো পরোয়া নেই।

কিন্তু একজন সত্যিকার হিন্দুস্তানী মুসলমানের দৃষ্টিকোণ থেকে ভারত ও ভারতীয় মুসলমানদের প্রকৃত অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রথমত, তার মেধা ও মনন বৈশ্বিক ও সুদূরপ্রসারী এবং সে নিজের দ্বীনি শিক্ষার আলোকে মানবপ্রেম সৃষ্টির সেবার জন্য কেবল আদিষ্ট নয় বরং প্রতিটি এলাকার মানুষদেরকে আল্লাহর আমানত, তাদের হেফাজত, খিদমত, সহানুভূতি ও সঠিক পথে পরিচালিত করা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করে। এ কারণে তারা ফসলের ক্ষেতকে বিনষ্টকারী পশুদের হাতে যেমন তুলে দিতে পারে না, তেমনি ফলে ফুলে সুশোভিত বৃক্ষরাজিকে জালিম পাখিদের দখলে ছেড়ে দিতেও পারে না।

উর্দু ভাষার বিখ্যাত কবির উক্তিটির ব্যতিক্রম বাস্তবতা হলো, এ বাগানে বুলবুলি তার অভিসার উপভোগ করেনি। এর একটি ডালে সে বাসা বেঁধেছে, বাগানটিকে বাঁচিয়ে রাখতে রক্ত সিঞ্চন করেছে। এ উদ্যানের প্রতিটি উদ্ভিদ আর লতায়-পাতায় তার যত্ন ও পরিচর্যার ছোঁয়া এবং তার পাহারাদারীর আলামত সুস্পষ্ট। কবি বলেন– 'মাটিতে রক্ত সরবরাহ করে আমি তা বাগানে রূপায়িত করেছি।'

কাজেই মুসলমান এমন দেশের ধ্বংস চাইতে পারে না, যাকে সে মাতৃভূমি হিসেবে বেঁছে নিয়েছে। কঠিন সময়গুলোতে তাদের পূর্বপুরুষগণ এ মাটিতে তাওহিদের পয়গাম, ভ্রাতৃত্ব ও মানবিক সমতার পবিত্র সংগ্রামের দায়িত্ব সম্পাদন করেছে। আর এদেশ তাদেরকে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিয়েছে।

এটিই ছিল সেই বাস্তবতা, বিশ্বাস ও চিন্তাধারা– যা আমাকে এখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতি, প্রেক্ষাপট, মাটি, মানুষের চলমান অবস্থা ও ভালো-মন্দকে এড়িয়ে যাবার সুযোগ দেয়নি। মুসলিম বিশ্বের পরিস্থিতির দিকে তাকানোর সময়, ইসলামি পুনর্জাগরণের (যা বর্তমানে মরক্কো, ইন্দোনেশিয়া ও বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে নতুন মোড় নিচ্ছে) বিষয়ে লেখা ও বক্তৃতা, আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে এর সমাধানে অংশ নেবার পাশাপাশি আমি স্বীয় মাতৃভূমিকে কখনও ভুলতে পারিনি, যার উপর তার নিজের এবং মুসলিম উম্মাহর বড় এক জনগোষ্ঠীর নীড় রচিত হয়েছে। এ জনপদ এখনও তাদের মনস্তাত্ত্বিক চারণভূমি ও উর্বর কর্মক্ষেত্র হিসেবে আপন যোগ্যতা হারায়নি।

'তাহরীকে পয়ামে ইনসানিয়ত' আন্দোলনের সূচনায় (যা আমার স্বভাবজাত অভিরুচি, অধ্যয়ন, লেখালেখি, অভিনিবেশ ও বংশগত নিভৃতচারী বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যায় না) আমি সকলকে সে বিষয়ে উদ্বুদ্ধ ও প্রাণিত করেছি। একে কেন্দ্র করে তিনি কতিপয় বন্ধু-বান্ধবসহ দেশের আনাচে-কানাচে সফর করেছি, বড় বড় জনসমাবেশে বক্তৃতা করেছি; বিভিন্ন জায়গায় সভা-সেমিনারের আয়োজন করেছি।[১]

তালাকপ্রাপ্ত ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর ইংরেজি ও হিন্দী সংবাদমাধ্যম, অমুসলিম বুদ্ধিজীবী, লেখক-বিশ্লেষক, বিভিন্ন দলের নেতৃবর্গ

---

১. বিস্তারিত 'কারওয়ানে যিন্দেগি' দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ১০৯-১২৭ এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ৩২৩ পৃষ্ঠায় আলোচিত হয়েছে।

যেভাবে আবেগসর্বস্ব, আক্রমণাত্মক, অদূরদর্শী পথ অবলম্বন করে পুরো বিষয়টিকে সংখ্যারিষ্ঠের মান-মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, আইন তৈরির অধিকার এমনকি জাতীয় ঐক্যের মানদণ্ড ও প্রতীক বানিয়ে ফেলেছে– এমন প্রেক্ষাপটে আমি মুসলমানদের সেই দেশপ্রেমের দিকে পুরো জাতির দৃষ্টি ফেরাতে সচেষ্ট হই। সংখ্যারিষ্ঠ মানুষ মুসলমানদের মৌলিক আকিদা-বিশ্বাস, তাদের ধর্মীয় অভিরুচি, নিজস্ব বোধ, সংস্কৃতি, ও তাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিধান সম্পর্কে এতই অনবহিত, যা সচরাচর (বর্তমান প্রচার, যোগাযোগ-প্রযুক্তির বিপ্লবের যুগে) ভিনদেশীদের ব্যাপারে হয় না। উপরন্তু, হিংসাত্মক অপসাহিত্য, রাজনৈতিক প্রচারণা, বিষাক্ত ও অতিরঞ্জিত তথ্যের মিশ্রিত ইতিহাস, পাঠ্যপুস্তকের 'সবক', বানোয়াট কাহিনীর ছড়াছড়ির ফলাফল শুধু পরস্পরকে না জানার নেতিবাচকতায় সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং দু'পক্ষকে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে, নিয়ে এসেছে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও শত্রুতামূলক মনোভাব পোষণের জায়গায়। সেই সঙ্গে অনাস্থা, ভীতি ও আতঙ্কও ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে লক্ষ-কোটি সাধারণ মানুষের অন্তরে।

'তালাকাপ্রাপ্ত মহিলার ভরণপোষণ' ইস্যুতে জনমনে ছড়ানো বিভ্রান্তি দূর করার তাগিদ থেকে আমাদের মনে হয়েছে ভারতের প্রধান প্রধান নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রগুলো– বিশেষত, যেখান থেকে শীর্ষস্থানীয় ইংরেজি ও হিন্দি মিডিয়া, সাময়িক প্রভৃতি প্রকাশিত হয়, যেসব জায়গায় সাম্প্রদায়িক উস্কানির এবং হিন্দুত্ববাদী জাগরণের নামে উত্তেজনা সৃষ্টির কেন্দ্রীয় তৎপরতা পরিচালিত হয়, সেসব স্থানে সমন্বিতভাবে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ আয়োজন ও ইতিবাচক জনমত তৈরির ব্যবস্থা করা উচিত।

এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রথমে দিল্লী, অতঃপর নাগপুর এরপরে পুনার দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে একটি ভারতের রাজধানী ও রাজনীতি-সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি আর অপর দুটি আরএসএস ও শিবসেনার ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। অভিজ্ঞতা থেকে জানা ছিল যে, এমন সংলাপ অনুষ্ঠান সফল করতে কেবল গতানুগতিক প্রচার, দাওয়াতনামা ও বিজ্ঞাপন যথেষ্ট নয়। বরং এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অধিকতর ফল দেবে। দিল্লীতে আমি এ বিষয়টি বন্ধুবর ডাক্তার ইশতিয়াক হোসাইন কুরাইশী সাইয়িদ হামেদ সাহেব (সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর মুসলিম ইউনিভার্সিটি আলীগড়)-এর হাতে অর্পণ করেছি, যিনি এ-বিষয়ক চিন্তা ও কাজে একজন পুরোপুরি সহমত পোষণকারী এবং দিল্লীর স্থানীয় সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। প্রায় সব মহলে তার পরিচয় ও গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। তার সহযোগিতার জন্য কাজী আবদুল হামিদকে কিছুদিন দিল্লীতে

অবস্থান করতে অনুরোধ করি। তিনি ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে সাধ্যমতো বিপুলসংখ্যক অমুসলিম সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক নেতৃবর্গকে সংলাপে অংশগ্রহণ করাতে সক্ষম হয়েছেন।

একটি অতি সংবেদনশীল বিষয় ছিল যে, (দেশের বিভিন্ন জায়গায় সফর ও অসহনীয় ব্যস্ততার কারণে) ১৯৮৬ খ্রি. এর মে মাসের ৪ তারিখ সংলাপের দিন নির্ধারণ করা হয়। এর ঠিক দু'দিন পর 'তালাকপ্রাপ্ত মহিলার ভরণপোষণ' ইস্যুতে পার্লামেন্টে আলোচনার জন্য অধিবেশন বসবে, যে ইস্যুটি পুরো ভারতকে অস্থির, টালমাটাল ও অগ্নিগর্ভ করে রেখেছে। তা সত্ত্বেও তৎপরতা আপন গতিতে চলছিল। সাইয়িদ হামেদ সাহেব ইংরেজিতে প্রস্তাবাবলির খসড়া প্রস্তুত করেন।

আমি 'মুসলমানদের সমস্যা ও চেতনাকে বুঝতে চেষ্টা করুন' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ *নিখিল ভারত ঐক্য ফোরাম লক্ষ্ণৌ*-এর পক্ষ থেকে ছাপিয়ে নিয়েছিলাম। এর ইংরেজি ও হিন্দি সংস্করণও প্রস্তুত ছিল। এ প্রবন্ধে মুসলমানদের মৌলিক স্বাতন্ত্র্য (নির্দিষ্ট বিশ্বাস, স্বতন্ত্র জীবনব্যবস্থা, বিধান, ধর্মীয় পরম্পরার তাৎপর্য, স্বীয় পয়গম্বর মুহাম্মদ সা. ও কুরআন মাজীদের সঙ্গে মুসলমানদের অতুলনীয় বন্ধন) বর্ণনার পাশাপাশি মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের গুরুত্ব বয়ান করা হয়েছে। এরপর গান্ধীজির দূরদর্শিতা ও সত্যাগ্রহ (খেলাফত ইস্যুতে মুসলমানদের প্রতি সমর্থন)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা ভারতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, স্বাধীনতা যুদ্ধে পরস্পরের প্রতি আস্থা, সহযোগিতা ও অভিন্ন চেতনার এমন এক সচলায়তন তৈরি করেছে– যা পূর্বাপর নজীরবিহীন।

এরই সঙ্গে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুর সেই আদর্শবাদিতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে, যা তিনি ১৯৫০ সালের কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক তোষণনীতির বিরুদ্ধে পেশ করেন, যা জাতীয় নেতৃত্বের মূল বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেছে। এটাকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ হিসেবে চিহ্নিত করে তার পক্ষে জনমত তৈরির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। তিনি ১৯৫০ সালের ২১ সেপ্টেম্বর গান্ধী নগরের এ ভাষণে বলেছিলেন, "কতিপয় লোক আমাকে বলে, সভা অমুক কথা অনুমোদন করে না এবং গণতন্ত্রের জয়ধ্বনি উচ্চকিত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এটি (নির্বিচারে স্রেফ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দোহাই) কাপুরুষদের দলিল। যদি গণতন্ত্রের অর্থ– যেদিকে জটলা সেদিকেই ঝুঁকে

পড়া হয়, তবে এ ধরনের গণতন্ত্র জাহান্নামে যাক! এ ধরনের মনোভাব যেখানে মাথাচাড়া দেবে, আমি সেখানের এর বিরোধিতা করবো।"[১]

এর ভারতীয় গণমাধ্যমের গঠনমূলক সমালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এসব মিডিয়া বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর চেতনা, অভিযোগ, প্রতিবাদ সমাবেশ ইত্যাদির (Bulk) প্রকৃত চিত্র এবং বক্তাদের বক্তৃতা, শ্রোতাদের উদ্দীপনা ও বাস্তব অবস্থা জনগণের সামনে সঠিকভাবে উপস্থাপন করে না যাতে তারা পরিস্থিতির স্বরূপ অনুধাবন করতে পারে। এ প্রসঙ্গে আমি কোলকাতার শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত সমাবেশের কথা উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছি। 'মুসলিম পার্সোনাল ল' বিলটি সম্পর্কে তারা যেভাবে (One way traffic) পদ্ধতি আঁকড়ে ধরে আছে এবং একতরফা বক্তব্যে রেকর্ডার বাজিয়ে চলেছে, আমি তারও সমালোচনা করেছি। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও উপরে বর্ণিত প্রেক্ষাপট ও বিরূপ পরিস্থিতির ফলে অমুসলিম সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীদের উপস্থিতি প্রায় নগণ্যই ছিল। তবে সৌভাগ্যের ব্যাপার সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন রাশিয়ায় নিযুক্ত সাবেক ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ইন্দ্রকুমার গুজরাল। অন্যদিকে, সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার সম্মেলনের আগাগোড়া উপস্থিত ছিলেন, যিনি তুলনামূলক উদার ও স্বাধীনচেতা সাংবাদিক হিসেবে পরিচিত। মালাক রাম ও স্টেটম্যান পত্রিকার দুজন অমুসলিম প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন। তবে মুসলমান নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি সংখ্যায় বিপুল ছিল, যাদের মধ্যে প্রাদেশিক মন্ত্রী জিয়াউর রহমান আনসারী, মুসলিম ইউনিভার্সিটির সাবেক উপাচার্য বদরুদ্দিন এমপি, আহমদ রশিদ শিরওয়ানী ও হাকিম আবদুল হামিদের কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাওলানা সাইয়িদ মিন্নাতুল্লাহ রাহমানী সাহেব সেসময় উক্ত বিলটি সংসদে উত্থাপিত হওয়ার কারণে দিল্লী অবস্থান করছিলেন। সংলাপটি দিল্লী ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো, আমার প্রবন্ধটি উপস্থাপনকালে কুলদীপ নায়ার বলেন, "সংখ্যারিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর জনগণ নিজেদের চার পাশে এক ধরনের চাপ অনুভব করতে শুরু করেছে। চারদিকের জগৎ যেন তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে আসছে! চারিদিকে মুসলিম রাষ্ট্র আর খোদ ভারতেও মুসলমানদের সংখ্যা বাড়ছে।" এর জবাবে মাওলানা জিয়াউর রহমান বলেন, "এটি ইতিহাসের প্রথম অভিজ্ঞতা যে, এত বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী

১ সূত্র : কওমি আওয়ায, লক্ষ্ণৌ, ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯০৫ খ্রি.

অবরুদ্ধ ও বিপন্ন বোধ করছে।" প্রতিকুল পরিবেশের ফলে যদিও এ সংলাপে অমুসলিম সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীদের একটি বড় অংশকে শরিক করার ব্যাপারে পুরোপুরি সফলতা আসেনি। তথাপি বিরাজমান পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য সবকিছু করা হয়েছে।

নাগপুর সংলাপ

দিল্লীর পরে ছিল নাগপুর সংলাপের পর্ব। এটি আরএসএস এর অন্যতম বড় কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। এখানে জাতীয়তাবাদ, বর্ণবাদী চিন্তাধারা ও হিন্দু পুনর্জাগরণবাদের শীর্ষস্থানীয় কট্টরপন্থী নেতৃবর্গ ও পুরোধাগণের অবস্থান। এ শহর বা প্রদেশটি ১২ শতক থেকে ১৮ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত ভারতে ব্রাহ্মণ্যবাদী সরকার উগ্রহিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকা রেখেছে, যা সমসাময়িক মুসলিম মনীষী আহমদ শাহ আবদালীর সময়োচিত পদক্ষেপ, হাকিমুল ইসলাম শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভীর চিন্তাশীলতা ও বিশেষ মনোযোগের কারণে ব্যর্থ হয়ে গেছে।

নাগপুর সংলাপের দিকে আমাদের আগ্রহ সৃষ্টির পেছনে এটিও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক ছিলো যে, সেখানে আমাদের যোগ্য সহকর্মী মাওলানা আবদুল করিম পারেক ছিলেন। দেশ ও জাতি নিয়ে তার চিন্তাধারা আমাদের চেয়ে স্বচ্ছ ও অগ্রবর্তী। তিনি নৈতিক উচ্চতা, নিঃস্বার্থ জনসেবা, এলাকার সার্বিক নিরাপত্তার জন্য নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি হিসেবে অমুসলিম জনগণের মাঝেও খুবই গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সংলাপ সফল করার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। সৌভাগ্যক্রমে তার বড় ছেলে এ তৎপরতার তার চাইতেও অধিক সক্রিয়তা এবং যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। অমুসলিম প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ সাক্ষাৎ ও সংলাপের প্রস্তাবাবলি প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি কাজে তিনি প্রশংসনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। পিতা-পুত্রের মিলিত চেষ্টায় সম্মেলনটি ব্যাপকভাবে সফল হয়।

সংলাপটি অনুষ্ঠিত হয় ৫ এপ্রিল ১৯৮৬ জেলা পরিষদ সেক্রেটারিয়েট হলে। সংলাপের সভাপতি ছিলেন নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মি. চান্সারকার (Chansarkar) যিনি একজন বিখ্যাত ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ বহু গ্রন্থপ্রণেতা ও আরএসএস-এর সমর্থক। সৌভাগ্যক্রমে সাইয়িদ হামেদ সাহেবও দিল্লীতে এসে পৌছান। তিনি সংলাপের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, তাহরীকে পয়ামে ইনসানিয়ত ও এর নগন্য আহ্বায়কের পরিচিতি, দেশের বর্তমান নাজুক পরিস্থিতি ইংরেজিতে খুবই সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। মি. চান্সাকারও

খুব চমৎকারভাবে তার বক্তব্যের সমর্থনে আলোচনা পেশ করেন। সংলাপে নগরীর শিক্ষাবিদ, সক্রিয় জনপ্রতিনিধি, হিন্দু-মুসলিম সমাজের বিশিষ্টজন ও মধ্যভারতের বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তি, শিখ সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় প্রতিনিধি, বৌদ্ধ সমাজের সমস্যাটি নিয়ে কাজ করেন এমন ব্যক্তিবর্গ, চীনের প্রধানমন্ত্রী চুয়াং লাই-এর উপদেষ্টা, মহারাষ্ট্রের জনপ্রিয় কবি ও মহারাষ্ট্র উর্দু একাডেমির সভাপতি, শিখদের সুপরিচিত ধর্মীয় মুখপাত্র, কয়েকজন খ্যাতিমান বিজ্ঞানী ও কয়েকজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ উপস্থিত ছিলেন।

'দেশ ও সমাজ কঠিনতম পরিস্থিতির দ্বারপ্রান্তে : প্রয়োজন সচেতনতা ও দ্রুত পদক্ষেপ' শীর্ষক আমার প্রবন্ধ মুদ্রিত আকারে প্রস্তুত ছিল। সঙ্গে ইংরেজি ও হিন্দি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। দুটোই সংলাপস্থলে বিতরণ করা হয়েছে। প্রবন্ধটির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এরকম :

১. সমাজের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো অত্যাচার প্রবণতার উদ্ভব তবে তার চাইতেও ভয়ানক সমস্যা হলো সৎ লোকদের নীরবতা ও প্রতিবাদহীনতা অথবা এমন সোচ্চার ও প্রতিবাদী সৎ লোকের অনুপস্থিতি।

২. রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শক্তি ও মূল্যবান সম্পদ সত্য উচ্চারণে নির্ভীক ও জানবাজ মানুষের সরব উপস্থিতি।

৩. মানবতার শেষ ভরসা দু'টি শ্রেণী (প্রকৃত ধার্মিক ও উচ্চশিক্ষিত), যাদের মধ্যে বিকৃতি ও অবক্ষয় সবার শেষেই পরিলক্ষিত হয়।

৪. বর্তমান সময়টি ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ও ভয়ানক সময়, যে পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের নৈতিক অবক্ষয় তার প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেছে। রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ সহকর্মী ও বন্ধুদের আত্মসমালোচনার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে অন্য সম্প্রদায়কে নসিহত করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

শেষে চার অধিবেশনে সমাপ্ত দীর্ঘ সংলাপের অনুষ্ঠানসূচি উপস্থাপন করা হয়।[১] লিখিত প্রবন্ধ উপস্থাপনের সময় আমি বিভিন্ন জায়গায় মৌখিক আলোচনাও করি। প্রবন্ধে আরও উল্লেখ করা হয় যে, দেশে জুলুম-বর্বরতা, নৈতিক মূল্যবোধ দলন, মানবাধিকারের বেপরোয়া লঙ্ঘন, ভ্রূণহত্যা বিনা

১. বিস্তারিত 'দেশ ও সমাজ কঠিনতম পরিস্থিতির দ্বারপ্রান্তে' প্রকাশক, তাহরিকে পয়ামে ইনসানিয়ত লক্ষ্ণৌ, পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

বাধায় চলছে।[১] এসব বন্ধে কোনো কার্যকর ও ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। দেশের সমস্যাগুলো এমনসব জায়গা থেকে সৃষ্টি হবে কোনও জ্যোতিষীর পক্ষেও এর পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব হবে না।[২] আমি অত্যন্ত সোজাসুজিভাবে বলেছি, এক জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর দেশে নেমে আসা দুর্যোগ ও দুর্ঘটনার শিকার মানুষজনকে হিসেব করে দেখা গেছে, উভয় সংখ্যা শুধু সমানে সমান নয় বরং দ্বিতীয় ক্ষতি প্রথমটাকে কিছুটা ছাড়িয়ে গেছে। প্রবন্ধের উপর আলোচকদের আলোচনা শেষে সবাই মধ্যাহ্নভোজে অংশগ্রহণ করেন। এটি খুবই যুৎসইভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। উপস্থিত কতিপয় বড় বড় ব্যক্তির একান্তভাবে সাক্ষাৎ করে তাদের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

শেষে নাগপুরে অনুষ্ঠিত সংবাদসম্মেলনে আমি বলেছি, "আপনাদের কাছে প্রশ্ন– আপনারা দেশ ও দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কী ভাবছেন ? পরিস্থিতি যখন এমন যে, অভিভাবকরা সন্তানকে দেখে আনন্দিত হবার পরিবর্তে তাদের অনাগত ভবিষ্যৎ-চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে, তারা এই ভেবে উৎকণ্ঠিত কখন উন্মাদনার কোন্ ঝড় এসে ফুলের কলিগুলোকে বৃন্তচ্যুত করে দেয়, কবি যখন আওড়াতে বাধ্য হবেন সেই পংক্তি : "পরিতাপ সেসব কুঁড়ির জন্য, যা ফুল হয়ে ফোটার আগে করুণভাবে ঝরে গেছে।"

দ্বিতীয় সম্মেলন

নাগপুর সম্মেলন শেষ করে একটু বিশ্রামের সুযোগ পেয়েছি, যা খুব কমই পাওয়া যায়। এ বিশ্রামকে একটু কাজে লাগানোর চেষ্টা করলাম। নাগপুর সম্মেলনের সুবাদে আরব (নাগপুরে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আরবীয় শিক্ষার্থী ছিল; তাদের সঙ্গে আমার লেখালেখির পাঠক হিসেবে পুরনো সম্পর্ক রয়েছে বলা যায়), ইউরোপীয় এবং গার্লস স্কুলের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তৃতা, পারেক সাহেবের দরসে কুরআনে অংশগ্রহণকারীদের সামনে বয়ান এবং কমিটির একটি সাধারণ সভায় আলোচনা করার সুযোগ ঘটেছিল।

---

১. এর তরতাজা দৃষ্টান্ত মিরাটের মর্মান্তিক ঘটনা, যা ১৯৮৭ সালের মে মাসে সংঘটিত হয়। এ বিষয়ে কিছু বিস্তারিত আলোচনা সামনের কোনও অধ্যায় হবে।

২. বাউ ফোর্সের মামলার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে সরকারি দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বড় অঙ্কের ঘুষ কেলেঙ্কারীর অভিযোগ উঠেছে, যার ফলে দেশে এক ব্যাপক অস্থিরতা লক্ষ্য করা গেছে। এর পাশাপাশি একদিকে, জনগণের সম্পদ লুটের উৎসব, অন্যদিকে, দারিদ্র্য, অনাবৃষ্টি ও খরার প্রাদুর্ভাব, দুর্ভিক্ষ আর কংগ্রেসের বিভিন্ন স্তরে দ্বন্দ্ব ও সুস্পষ্ট বিভক্তি।

নাগপুর থেকে আমি মাওলানা মিন্নাত আলী রহমানীসহ বোরহানপুর গিয়েছি। ওখানে রাতে স্থানীয় মুসলমানদের এক মাহফিলে বয়ান করা হয়েছে। সে বক্তৃতায় পার্সোনাল ল' বোর্ডের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিষয়ে আলোকপাত করেছি। পরের দিন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের পরামর্শে নগরীর বিচারক নিয়োগের সুযোগ লাভ করেছিলাম। এদিকে আমি কয়েকজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে ধারনি এলাকায় চলে যাই। এটি মহারাষ্ট্রের মধ্যপ্রদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চল। এখানে কিছুদিন আগে একটি আরবি শিক্ষাকেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সঙ্গে পয়ামে ইনসানিয়তের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ প্রস্তুত হয়েছে। এলাকার অমুসলিম অধিবাসীদের উল্লেখযোগ্য অংশ আমাদের অভ্যর্থনা জানায়। পরে পয়ামে ইনসানিয়তের উদ্যোগে একটি বড় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে খুবই উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা ও জোরালো মতামত অভিব্যক্ত হয়েছে। কর্মসূচির বেশ ইতিবাচক ফলাফলও লক্ষ্য করা গেছে।

পুনা সংলাপ

নাগপুর সম্মেলনে আমাদের এক বন্ধু আনিস চিশতী সশরীরের উপস্থিত ছিলেন। তিনিই পরবর্তী সম্মেলন পুনায় আয়োজনের প্রস্তাব দেন (এটি শুধু মহারাষ্ট্র নয় সম্ভবত পুরো ভারতের মধ্যে হিন্দুত্ববাদী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের সবচেয়ে বড় কেন্দ্রভূমি)। আনিশ চিশতী (এমএ) মহারাষ্ট্র জুনিয়র কলেজের উর্দুর প্রভাষক। তিনি উর্দুর লেখালেখির প্রতি বিশেষ অনুরাগী এবং ময়দানে তার বিচরণও বেশ দাপুটে। তিনি উর্দু লেখার কম্পিউটার সংস্করণেও আগ্রহী। আল্লাহ তাকে উর্দু ভাষা নিয়ে আরও ব্যাপক এবং নিবিড়ভাবে কাজ করার তাওফিক দিন। সংলাপের জন্য ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ খ্রি. তারিখ নির্ধারিত হয়। আনিস সাহেব সংলাপ সফল করার জন্য অসামান্য পরিশ্রম করেন। তিনি নিজের ছাত্রদের দিয়ে দেড় হাজার হাতের লেখা চিঠি পুনার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিবর্গের কাছে পৌঁছে দেন। আমন্ত্রিতদের মধ্যে সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের পদস্থ কর্মকর্তাগণ, সংসদ সদস্য, মন্ত্রিবর্গ, সমাজকর্মীবৃন্দও রয়েছেন। চিঠিতে তার নিজের ছাড়াও কতিপয় অমুসলিম সম্মানিত ব্যক্তি, বিশিষ্টজন ও গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম নেতৃবৃন্দের স্বাক্ষরও ছিল। সেখানেও এরূপ সংলাপের গুরুত্ব সম্বন্ধে মূল কথাগুলো পুনর্ব্যক্ত করা হয়। তাদের অনেকের পক্ষ থেকে উৎসাহব্যঞ্জক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত সাক্ষাতের

ব্যবস্থাও রাখা হয়। অন্যদিকে পুলিশ, প্রশাসনিক ব্যক্তি, রাজনীতিক ও সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিলো পুরোদস্তুর। একাধিক হিন্দি, মারাঠী, ইংরেজি সংবাদমাধ্যম, রেডিও, টিভি সংলাপের প্রচার ইত্যাদিতে সহযোগিতার ও একাত্ম মনোভাব প্রদর্শিত হয়। আরিয়া সম্প্রদায়ের সাবেক প্রধান ও লায়ন্স ক্লাবের সেক্রেটারী মিস্টার উজ্জ্বল তাওড়ে সংলাপ সফল করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা ও সমর্থন দিয়েছিলেন।

একটি সম্মেলন

এ সম্মেলনের জন্য আমি আমার একান্ত বিষয় 'দেশপ্রেমিকদের ভাবনার বিষয়' শিরোনামে প্রবন্ধ তৈরি করি। ২১ ফেব্রুয়ারি ঠিক সকাল ৭.৩০টায় মিরাট চেম্বার অব কমার্স পুনায় (Maharashtra Herald) সম্পাদক মি. এসডি ওয়াঘ (S.D. Wagh) এর সভাপতিত্বে সম্মেলন শুরু হয়। মিস্টার উজ্জ্বল তাওড়ে খুব চমৎকারভাবে সম্মেলন পরিচালনা করেন। সাইয়িদ হামেদ সাহেব দিল্লী থেকে এসেছেন। আমি যথাযথ ও কার্যকর উপায়ে প্রবন্ধের শুরুতে সামাজিক প্রেক্ষাপট ও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরি এবং পরিষ্কার ভাষায় বলি, "আমি চাইলে আরামে ও স্বচ্ছন্দে কোনো নির্জনে এলাকায় নিজের লেখালেখি ও গ্রন্থন কাজ করে যেতে পারতাম। কিন্তু মুসলিম-অমুসলিম সকল সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য ও সচেতন ব্যক্তিবর্গকে সঙ্গে নিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের অবক্ষয়-বিপর্যয় মোকাবেলায়, এ কিশতি, যাতে আমরা সকলেই আরোহী– তা যেন ডুবতে না পারে, সেই চেষ্টা-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে বাস্তবতা আমাকে বাধ্য করেছে। সবাই খোলামেলা মতবিনিময় করুন! চলমান বিপর্যয় ও দুর্দিন প্রতিরোধে কার্যকর কিছু চিন্তা করুন।"

প্রবন্ধটির মিরাটী ও ইংরেজি অনুবাদ প্রস্তুত ছিল। উপস্থিত লোকজনদের মাঝে ওগুলো বিতরণও করা হয়েছে। মিলনায়তনে পিনপতন নীরবতার পাশাপাশি শ্রোতাদের মনোযোগ ছিল নিবিড়।

প্রবন্ধের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপাদ্য

প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে, সব কিছুর আগে সমাজ ও জাতির জন্য স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ দরকার। টেকসই উন্নয়ন, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা-দীক্ষা এমনকি ধর্মীয় ও কল্যাণমুখী রাজনৈতিক তৎপরতার জন্যও এই স্থিতিশীলতা অপরিহার্য শর্ত। এরপরে দেশ ও সমাজের বিভিন্ন দিকের ওপর বাস্তবধর্মী আলোকপাত করা হয়েছে। পরিস্থিতির নিরপেক্ষ ও

নির্মোহ মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। সোজাসুজি ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, এ মুহূর্তে মানবিক মূল্যবোধ একেবারেই অকার্যকর হয়ে গেছে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হলো, মানুষের ক্রমবর্ধমান স্বার্থপরতা। আমাদের উত্তর প্রদেশের প্রবচন বলে 'নিজের আখের গোছাতে মরিয়া'। এতে কারও জান গেলেও মাথাব্যথা নেই! নেহাৎ দৃষ্টিকটু ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, মানুষের জীবন, মান-মর্যাদার এখন কোনও মূল্য নেই। এরপর স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে, দেশ এ অবস্থায় চলতে পারে না। আমাদের পেছনে আমেরিকা থাকুক কিংবা রাশিয়া, আমরা নিজেদের ঘর নিজেরা যদি না গোছাই, অন্যরা এসে আমাদের বাঁচাতে পারবে না। নিজের ঘর নিজের হাতেই সাজাতে হয়, অন্যের হাতে নয়।

সন্ত্রাসকে সন্ত্রাস দিয়ে, নৈরাজ্যকে নৈরাজ্য দিয়ে মোকাবেলা করা যায় না। একটি জাতীয় ঐক্য কেবল আরেকটি জাতীয় ঐক্যের মূলে আঘাত হানতে পারে আমাদের চিন্তানৈতিক গলদের কারণে। যে ঐক্য মানবতাবোধ ও আল্লাহর নিরঙ্কুশ ইবাদতের আলোকে গড়ে না ওঠে, তার বৈশিষ্ট্য এমনই। যে সংহতি সর্বজনীন নাগরিক অধিকার, দায়িত্ববোধ, সাম্য-সমতা, আল্লাহভীতি ও মানবিক মর্যাদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়, সে ঐক্য প্রকৃত অর্থেই ভয়ানক। যে দানা মালা থেকে ছিটকে পড়েছে, তা আপন জায়গায় থাকে না, সে অন্যের সঙ্গে টক্কর খাবেই। পয়গাম্বরগণ চিরকাল মানবজাতিকে সেই মানবিক সুতোর মালায় গাঁথার চেষ্টা করে গেছেন যাতে মানুষ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে। শয়তান বরাবরই চেষ্টা চালিয়ে গেছে এবং যাচ্ছে মানুষকে যেন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে একে অন্যের সাথে সংঘাতে লিপ্ত রাখা যায়। মানুষের ভাগ্যও পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। রাষ্ট্র বা সমাজে কোনো বিপর্যয় দেখা দিলে কেউ যদি ভাবে এর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক আমি তো নিরাপদ আছি; অন্য কোনো শহরে দাঙ্গা হলে, নিরাপদ সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন হলে, পথচারী আক্রান্ত হলে আমার কী ? তবে ভেবে দেখুন এমন সমাজের জন্য কী পরিণতি অপেক্ষা করছে।

পুরো মানবজাতিকে বিশ্বনবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) যে অভিনব উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত সাধারণ সাহিত্য নয় বিশ্বসাহিত্যেও (Word Literature) খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর উপস্থাপিত দৃষ্টান্তটি বিশ্লেষণ করলে বলতে হয়, এ তরীতে দুটি শ্রেণী আছে একটি উচ্চশ্রেণী আরেকটি নিম্নস্থ শ্রেণী। কিছু যাত্রী উপর তলার (Upper Class Passengers) আর কিছু নিচ তলার, যারা সাধারণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর লোক। উপরের যাত্রীদের জন্য,

উন্নতমানের পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমনকি নিচের তলার লোকদের খাবার পানির জন্য উপরেই যেতে হয়। পানির বৈশিষ্ট্য হলো, সে ফাঁকফোকর গলে চুঁয়ে পড়ে, ছিটকায়, গড়ায়। অন্যদিকে, কিশতি তো এমনিতেই দোলায়মান জিনিস। অনেক সতর্কতার পরও পানি টপকায়, ছিটকায়। পানি তো এটা বোঝে যে, ওখানে জমিদার সাহেব বসে আছেন, ওদিকে নবাব সাহেবের কাপড় রয়েছে। একবার, দু'বার, তিনবার– এক সময় আপার ক্লাসের যাত্রীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। বিরক্ত হয়ে তারা নিচতলার যাত্রীদের বলে, "আমরা আর পানি নিতে দেব না।" নিচের যাত্রীদের প্রশ্ন, "তাহলে আমরা কী পানি ছাড়া বেঁচে থাকবো ?' আপনারা যদি ওপর থেকে পানি নিতে দেন, তবে আমরা জাহাজের নিচে ফুটো করে পানি সরবরাহ করবো!"

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন, "যদি উপর তলার লোকদের পুরোপুরি বোধশক্তি লোপ না পেয়ে থাকে, তাহলে তারা হাতে-পায়ে ধরে নিচের তলার লোকদের এমন আত্মঘাতী কাজ থেকে নিবৃত্ত করবেই। তারা বলবে, আল্লাহর দোহাই! তোমরা যত খুশি উপর থেকে পানি নিয়ে যাও, কখনও নিচের দিকে ফুটো করতে যেও না। আর যদি তারা নির্বোধ হয়, তবে উদ্বিগ্ন না হয়ে বলবে, জাহাজের নিচে ছিদ্র করে পানি নিলে নাও; তাতে আমাদের কী যায় আসে। এমতাবস্থায় বুঝতে হবে এ তরীর ভাগ্যে খারাবী আছে!"

এক পর্যায়ে প্রবন্ধে আধ্যাত্ম সাধকদের কিছু উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে, যা অনুসরণ করলে আমরা সকলেই শান্তি, সম্প্রীতি, স্থিতিশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও নিরাপত্তাপূর্ণ জীবনের স্বাদ পাবো। আমি এ প্রসঙ্গে খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়ার উক্তি তুলে ধরেছি। "দেখো ! কেউ যদি একটি কাঁটা বিছিয়ে রাখে আর তুমি যদি আরও একটি কাঁটা বিছাও তাহলে পথটি কাঁটায় ভরে যাবে। যদি সে কাঁটা রেখে যায় আর তুমি ফুল রেখে যাও তবে ফুল রাখার রেওয়াজ শুরু হয়ে যাবে। কাঁটার চিকিৎসা কাঁটা দিয়ে নয়, ফুল দিয়ে করতে হয়।" তিনি একবার বলেছেন, "মানুষের রীতি হলো বাঁকার সঙ্গে বাঁকা আর সোজার সঙ্গে সোজা আচরণ করে। আমার স্বভাব হলো সরলের সঙ্গে সরলতা এবং কুটিলের সঙ্গেও সরলতা।" রাজ-বাদশাহ, দেশবিজেতা ও বস্তুগত ক্ষমতাবান শ্রেণীর চরিত্র হলো, তারা চায় কোনও 'বাঁশ না থাকুক আর বাঁশরী না বাজুক।' আর প্রেমিকসমাজের মনোভাব হলো 'বাঁশও বাঁচুক বাঁশরীও বাজুক।' শুধু গানের কথা ও আবেদন বদলে যাবে, যে বাঁশিতে আগে হিংসার সুর উঠতো, এখন তাতে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতির সুর বাজবে। হযরত খাজা ফখরুদ্দিন শাকারগঞ্জের দরবারে তাঁর কোনও ভক্ত

একবার হাদিয়া হিসেবে নিজ শহরের বিখ্যাত জিনিস কাঁচি নিয়ে হাজির হয়। এটা দেখে তিনি স্মিত হেসে বলেছিলেন, "মানুষের মাঝে সম্পর্কের বন্ধন যুক্ত করা আমার কাজ, কাটাছেঁড়া বা বিচ্ছিন্ন করা নয়। আমার জন্য তুমি কাঁচি নয় সুঁই-সুতা হাদিয়া নিয়ে এলেই ভালো হতো!"

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, কোনও জাতির পতন নৈতিক দিক থেকেই শুরু হয়, রাজনৈতিক পতন আসে আরও পরে। ভারত আজ সেই পতনের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। দেশটি এখনও নিদারুণ অবক্ষয়ের শিকার। তার চেয়েও দুঃখের বিষয় হলো, এত বিশাল রাষ্ট্রে কন্যাকুমারী থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত এ অবক্ষয়ের প্রতিকার চেয়ে কেউ সোচ্চার নয়। কেউ উচ্চকণ্ঠে বলছে, চলো! আমাদের চরিত্র সংশোধন করি। মানবতার সবক পুনর্পাঠ করো। দেশ বাঁচাও। হ্যাঁ, আমাদের দলে এসো! এটা বলার লোক হাজারে হাজার। অমুক নেতার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হও। যা কিছু ঘটছে, তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। সকলের দাবি যেন একটাই, আমাদের দলে ভিড়লে সব সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। আল্লাহর ওয়াস্তে কোনও দরদী মানুষ, ব্যথিতের জখমে সান্ত্বনার প্রলেপ দেবার মতো ব্যক্তি, ভুল শোধরানোর মতো আন্তরিক, 'অন্যায় অন্যায়' বলে প্রতিবাদ করার মতো সাহসী কেউ নেই। নিজের সম্প্রদায়ের অন্যায্য কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করার মতো নির্ভীক লোকের অভাব তীব্র। যারাই ভালো কিছু বলার জন্য দাঁড়ায়, তাদের লক্ষ্য অন্য পক্ষ। প্রত্যেকেই যেন নিজ দল ও সম্প্রদায়ের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী আর প্রতিপক্ষের জন্য দারোগা এবং সরকারি উকিল (পাবলিক প্রসিকিউটর)।

আমি একজন ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে বলতে চাই, আমাদের অত্যাচার ও অনাচারের ফলে আসমানী গজব আসছে। আল্লাহ যেন একথাই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন– মারার যন্ত্র আমার কাছে তোমাদের চাইতে বেশি আছে। যখন কোনও এলাকায় জুলুম-নিপীড়নের ঘটনা ঘটে, তখনই আমার আশঙ্কা জাগে কবে আবার কুদরতী শাস্তি এসে হাজির হচ্ছে। পরে হতাশা ও নেতিবাচক ভাবনা থেকে মুক্তি দেবার উদ্দেশ্যে বলেছি :

> "আল্লাহর শোকর আদায় করছি– আমাদের দেশ ঘুমিয়েছে তবে মরে যায়নি। ঘুমন্তকে তাকে জাগানো সম্ভব কিন্তু মৃতকে নয়। আমরাও বহুবার ঘুমিয়ে গিয়েছি, বহুবার জেগে উঠেছি। তবে আমরা যখন জেগেছি, এভাবে জেগেছি যে, ঘুমানোর পুরো ক্ষতি পুষিয়ে নিয়েছি।"

এক ঘণ্টার প্রবন্ধটি হলজুড়ে চমৎকার নীরবতায় পঠিত হয়েছে। মাঝে মাঝে শ্রোতারা সজোরে তালি বাজিয়ে তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেছে। শেষে মহারাষ্ট্র হেরাল্ডের সম্পাদক মি. এস ডি ওয়াঘ সভাপতির ভাষণ দিয়েছেন। তাঁর ভাষণে প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য ও আবেদনকে জোরালোভাবে সমর্থন করেছেন। তিনি বলেন, "পরিস্থিতি অবশ্যই ভয়াবহ কিন্তু হতাশার কোনও কারণ নেই। যদি মানবতার ডাক প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেয়া যায়, তবে অবশ্যই ব্যাপক সুফল বেরিয়ে আসবে। মাওলানা নদভীর মতো মানুষ আমাদের সমাজের জন্য খুবই জরুরি।"

সভাপতি মি. ওয়াঘের ভাষণের পর উপস্থিত শ্রোতারা নৈশভোজের জন্য উঠে গেছে। খাবার গ্রহণের ফাঁকে ফাঁকে লোকদের বেশ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে দেখা গেছে। শহরের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও নানা শ্রেণীর পেশার মানুষ অভিন্ন সুরে ঐকমত্য পোষণ করেছে। একটি রেডিও টানা সাত মিনিট সংলাপের নির্বাচিত অংশ সম্প্রচার ও সম্মেলনের প্রতিবেদন প্রচার করেছে। ইংরেজি, মিরাটী ও হিন্দি পত্রিকাগুলো প্রথম পাতায় ছবিসহ গুরুত্বের সঙ্গে সংলাপের খবর ছেপেছে এবং আলোচকদের বক্তৃতার চুম্বক অংশ উদ্ধৃত করেছে।

অন্যান্য সভা

আমরা পুনায় তিনদিন অবস্থান করি। দুই দিনই পুনা কলেজ, মেডিকেল কলেজ, মোলদিনা হাইস্কুল, আশ শুববানুল মুসলিমুন আরব ছাত্র ফেডারেশন, জ্ঞান পরবোধন, মুমিনপুরা মসজিদ, তাম্বুলিয়ান মসজিদ প্রভৃতি জায়গায় বক্তৃতা করা হয়েছে। অবস্থানের জায়গার অদূরে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষাদীক্ষা বিষয়ক একটি সেমিনারেও অংশগ্রহণ করি। পুনা কলেজ হলে মুসলিম এডুকেশন সোসাইটির উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছি। ওখানে দুইশতের মতো আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি, ১৮৫৭ সালের পর স্বাধীনতা সংগ্রাম, শিক্ষা, উন্নয়ন ও সামাজিক আন্দোলনে আইনবিদরাই সমধিক নেতৃত্ব দিয়েছেন। কারণ, আইনবিষয়ক জ্ঞান তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও সাহসের জন্ম দিয়েছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের মুসলিম-অমুসলিম মিলে বড় একটি অংশ আইনজীবীদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলতেন। উত্তর ভারতের শীর্ষস্থানীয় জাতীয় নেতা মুহাম্মদ আদিল আব্বাসীর কথা উল্লেখ করে বললাম, "তিনি জাতীয় উন্নতির জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এ পাঠ্যক্রম তৈরির জন্য পুরো

ভারতের আলিম-ওলামা, উচ্চশিক্ষিত, চিন্তাশীল সামাজিক নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে নতুন সিলেবাস প্রণয়ন করেছেন।

তাদের গবেষণা ও অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে সরকারি সিলেবাসের অনেক ক্ষতিকর অংশ আগামী প্রজন্মকে কীভাবে বিশ্বাস ও চিন্তাগত দিক থেকে ধর্মহীনতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তার এক বাস্তব চিত্র। তারা জাতিকে সে বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন। উত্তর প্রদেশে তাদের নেতৃত্বে ব্যাপক শিক্ষা আন্দোলন পরিচালিত হয়। এর ফলে দশ হাজারের মতো স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। যেখানে হাজার হাজার শিক্ষার্থী জ্ঞান আহরণ করছে। আফসোসের বিষয় হলো, বর্তমানে আইনজীবীরা নিজেদের পেশাগত ব্যস্ততায় এতো বেশি ডুবে গেছেন যে, সকল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক কার্যক্রম, তৎপরতা ও নেতৃত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। এখন তারা নিজেদের জীবন-জীবিকা নিয়ে এতই মশগুল যে, সমাজে নেতৃত্বের একটি বড় শূন্যতা তৈরি হয়েছে। আমি বলবো, মুসলিম সমাজের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক চিরকাল থাকতে হবে। এ সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকলে এর সুবাতাস আপনাদেরও স্পর্শ করবে। এতে আপনারা শান্তি, মর্যাদা ও সম্মানের পরিবেশ উপভোগ করবেন।

যদি এ সমাজ অনিরাপদ হয়ে ওঠে, তাহলে আপনাদের শান্তিও বিঘ্নিত হবে। আন্তঃসামাজিক সম্পর্ক যদি ইতিবাচক ও সম্প্রীতিপূর্ণ না হয়, তাহলে আপনারাও নিরাপদ নন। জাতি আপনাদের নৈতিক দিকনির্দেশনার দিকে তাকিয়ে আছে। এদেশে যদি মুসলমানদের মর্যাদা ও নেতৃত্ব লাভ হয়, সেটা কেবল জনসেবার মাধ্যমেই সম্ভব।

আপনাদের অন্যতম গুরু দায়িত্ব হলো, ইসলামি আইনগুলো গভীরভাবে অধ্যয়ন করা। আপনারা নিজেদের বক্তৃতা, বয়ান, তর্ক, বার এসোসিয়েশনসহ বিভিন্ন সভা-সমিতিতে দেয়া ভাষণে এটা প্রমাণ করুন যে, যুগের চাহিদা মেটানোর সবচেয়ে বেশি যোগ্যতা রয়েছে ইসলামি আইনে। এমন একটি দিনও যায় না, যেদিন ইংরেজি ও হিন্দি পত্রিকাগুলোতে কমপক্ষে একটি হলেও ইসলামি আইনবিরোধী প্রবন্ধ ছাপা হচ্ছে না। আপনারা এদিকটায় নজর রাখবেন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করুন। আপনারা মুসলিম পার্সোনাল ল'-এর শ্রেষ্ঠত্ব এবং জীবনঘনিষ্ঠতা ও যুগচাহিদা পূরণে এর সক্ষমতা সর্বোপরি মানবীয় সামঞ্জস্যতা দৃঢ়ভাবে উপস্থাপন করুন।"[১]

---

১. পুনা সংলাপ ও সফরনামায় মাওলানা নযরুল হাফিয নদভীর প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ থেকে সহায়তা নেয়া হয়েছে, যা তামীরে হায়াত, মার্চ ১৯৮৭-তে কয়েক সংখ্যায় ধারাবাহিক ছাপা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়

রাবেতা আদবে ইসলামীর সম্মেলন

মাওলানা হাসরত মুহানীর বিখ্যাত একটি চরণ এরকম :

"একদিকে চলছে প্রহসন, অন্যদিকে হাসরতের জবান
মুখরতায় সোচ্চার,
তবে তার ওপর সমানে চলছে যাঁতাকলের পীড়নও।"

আজকের দিন পর্যন্ত আমি এরকম 'দুই বৈপরীত্য'কে নিজের মধ্যে একত্র করার দাবি করতে পারি না। জেলে যাওয়া বা কারাবরণের সুযোগ এখনও ঘটেনি।

এ সৌভাগ্য যার লাভ হয়েছে তো হয়েই গেছে,
সব আশীর্বাদ কি আর সকলের জন্য হয় ?

তবে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ঐতিহ্যের প্রভাব, যে প্রতিষ্ঠানের (নাদওয়াতুল উলামা) সঙ্গে আমার সম্বন্ধ, সংযোগ ও পরিচয়যুক্ত– এসবের প্রভাব তো নিশ্চয় আমার ওপর প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়াও, বিভিন্ন দেশে ব্যাপক সফর, জাতি-উম্মাহ্‌র অবস্থা ও সমস্যার সঙ্গে নিবিড় সম্পৃক্ততা এবং চিন্তা-ভাবনা, পয়ামে ইনসানিয়তের বার্তা বহন, বিভিন্ন সমাজ ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংলাপের ব্যস্ততার পাশাপাশি সমকালের সাহিত্যানুরাগ, ভাষা আন্দোলন বিষয়ক অধ্যয়ন-গবেষণা, এবং এর সঙ্গে যুক্ত মুসলমানদের নতুন প্রজন্মের ওপর ইতিবাচক-নেতিবাচক প্রভাব বিশ্লেষণ তো করেই যাচ্ছি। শিল্প-সাহিত্য, কবিতা, গবেষণা ইত্যাদি ধর্ম ও নৈতিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া বরং শিল্প-সাহিত্যকে ধর্ম ও নৈতিকতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়ার অশুভ তৎপরতা ও বিপদ সম্পর্কে সতর্কতা এবং এ বিষয়ক নিবিড় পর্যবেক্ষণ থেকে অবসর নেবার কোনও সুযোগ মেলেনি। আমি নিজেও এসব বিষয়কে পাশ কাটাতে চাইনি। এতদসংশ্লিষ্ট চেতনা, উপলব্ধি, ব্যস্ততা ও তৎপরতাই আমাকে রাবেতা আদবে ইসলামির দায়িত্ব প্রভৃতিতে জড়িয়ে যাবার অনুপ্রেরণা দিয়েছে। এ খণ্ডের শুরুতেই এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

নদওয়াতুল উলামায় রাবেতার সম্মেলন

৭, ৮ ও ৯ জানুয়ারি ১৯৮৬ খ্রি. নদওয়াতুল উলামায় রাবেতা আল আদব আল ইসলামির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে রাবেতার গঠনতন্ত্র চূড়ান্ত করা হয়। সেদিন অনুষ্ঠিত সংগঠনের কাউন্সিল অধিবেশনে এ অভাজনকে আজীবন সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। আমন্ত্রিত প্রায় সকল প্রতিনিধি নাদওয়াতুল উলামা, এর শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের, কর্মকর্তাদের শোকরিয়া জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানের আলাদা এক আসরে আরব্য কবিদের কয়েজন বিশেষত ড. আলী রেজা আদনান নাহ্বী ও ড. আবদুল কুদ্দুস আবু সালেহ নিজেদের রচিত কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে গভীর আস্থা ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অভিব্যক্ত করেন।

সম্মেলনে আরব বিশ্বের বিখ্যাত কথাশিল্পী ও কবি ওমর বাহা আল আমিরী বিশেষ মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অধিবেশনে তিনি বেশ জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছেন, প্রবন্ধ পাঠ অধিবেশনে প্রবন্ধও পাঠ করেছেন। কিছুকাল পাকিস্তানে রাষ্ট্রদূত থাকার সুবাদে তিনি উর্দুও জানেন। ইকবালের কিছু কবিতার তিনি উর্দু তরজমাও করেছেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন কাতারের ইয়াহইয়াউত্ তুরাসিল ইসলামির পরিচালক শায়খ আবদুল্লাহ ইবরাহিম আনসারী। অন্যদের মধ্যে সঊদী আরব, কাতার, বাহরাইন, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, আবিসিনিয়া, মরক্কো ও বাংলাদেশের কবি, সাহিত্যিক, কথাশিল্পী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। ভারতের মুসলিম ইউনিভার্সিটি, জামিয়া মিল্লিয়া, দিল্লী ইউনিভার্সিটি, বেনারস ইউনিভার্সিটি, এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি, ক্যালিকাটা ইউনিভার্সিটি, কেরালা ইউনিভার্সিটি, দারুল মুসান্নিফীন আজমগড় ও নাদওয়াতুল উলামার শিক্ষকবৃন্দ এতে অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে আমার পঠিত প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'ভারতের সাহিত্য-স্কুল'। দুর্ভাগ্যক্রমে, আরবজাহানসহ অন্যান্য মুসলিম দেশের ধর্মপ্রাণ মহল সাহিত্যাঙ্গন থেকে ক্রমেই ছিটকে পড়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ভারতের উর্দু সাহিত্যের ব্যাপারটি ব্যতিক্রম। এখানে আল্লাহর রহমতে উর্দু সাহিত্যের কাণ্ডারী তারাই, যাদের হাতে কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামি ধর্মতত্ত্বে নেতৃত্বের বাগডোর। আমার সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে আমি মাওলানা শিবলী নুমানী, মাওলানা হালী, মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর, আল্লামা ইকবালসহ অন্যান্য সাহিত্যিকদের কথা উল্লেখ করে তাদের ইসলামি

চেতনার বিষয়ে ইঙ্গিত করেছি। উপস্থিত আরব প্রতিনিধিগণ এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, যার প্রতিক্রিয়া এখনও লক্ষ্য করার মতো। ফলে, জয়পুরের ইসলামি সাহিত্য সেমিনারে আরবরা উর্দু সাহিত্যের কিছু নমুনার অনুবাদ পেতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

নাদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠাতা ও এর খাদেমদের ইখলাস-নিষ্ঠার বরকতে রাবেতা আদবে ইসলামির প্রথম সম্মেলনেই বিপুলসংখ্যক আরব প্রতিনিধি লক্ষ্ণৌ আগমন করেন। এ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের উদ্দেশে আমি বলেছি, "ভারতের এশিয়ার কোনও সংগঠন কিংবা অন্য দেশের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়া কোনও অবাক হবার মতো বিষয় নয় বরং বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, ইসলামি সাহিত্যের একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন ভারতে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এতে আরব বিশ্বের বাঘা বাঘা সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ শরিক থাকবেন। শুধু তাই নয়, সে সংগঠনের প্রথম সম্মেলনটিও ভারতেই অনুষ্ঠিত হবে, কেন্দ্রীয় কার্যালয়টিও ভারতেই হবে; এটা স্রেফ আল্লাহর বিশেষ রহমত এবং নদওয়ার প্রতিষ্ঠাতাগণের নিষ্ঠাপূর্ণ সাধনার ফসল।"

জামিয়া হেদায়েত জয়পুরে রাবেতার সেমিনার

২২/২৩ জুন ১৯৮৬ খ্রি. তারিখে রাবেতার বোর্ড অব ট্রাস্টির সভাটি অনুষ্ঠিত হয় তুরস্কের ইস্তাম্বুলে। সেখানে রাবেতার ভারত শাখা ১৯৮৭ সালের কোনও একটি সময়ে ভারতের যে কোনও জায়গায় রাবেতার একটি সেমিনার আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়। অনুষ্ঠানস্থল হিসেবে ভারতের একাধিক জায়গার প্রস্তাব উঠে আসে। তবে জামিয়া হেদায়েত জয়পুরের মাওলানা আবদুর রহিম রাব্বানী মুজাদ্দেদীর দাওয়াত ও তার সম্মানার্থে জামিয়া হেদায়েত জয়পুরকে সম্মেলনের স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হয় আর ১৭, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ খ্রি. সম্মেলনের তারিখ নির্ধারিত হয়।

রাজস্থানের রাজধানী জয়পুর (যা খোদ ভারতেরও একটি সুন্দর ও ঐতিহাসিক নগরী) ১৭ অক্টোবর ১৯৭৬ শাহ আবদুর রহিমের দাদা বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব শাহ হেদায়েত আলীর স্মারক হিসেবে জয়পুর শহর থেকে কয়েক মাইলের দূরত্বে জামিয়া হেদায়েতের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তিনদিকে রুক্ষ পাহাড়ের কোলে সবুজ উপত্যকার বুকে (যা হিজাযের পাহাড়গুলোর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়) ডিসেম্বর ১৯৮৫ খ্রি. এ জামিয়ার প্রথম জলসা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে অন্যান্য প্রদেশের শীর্ষস্থানীয় আলিম, শিক্ষাবিদ, পণ্ডিতগণ

একত্র হয়েছেন। হেদায়েত উপত্যকায় প্রথমবারের মতো গমনকারী আমাকে উক্ত সম্মেলনের সভাপতির দায়িত্বও পালন করতে হবে। এই মনোরম জায়গাটি দেখে–একজন বড় আত্মপ্রত্যয়ী আল্লাহওয়ালার দূরদৃষ্টির ফসল–মাওলানা আসলাম জী রাজপুরীর এই কবিতাটি স্বগতভাবে মুখ ফুটে বেরিয়ে এসেছে আর কবিতাটির চরণটি দিয়ে আলোচনা শুরু করি :

'দৃঢ় প্রত্যয় ও বুলন্দ হিম্মত পাহাড় খুদাই করার শক্তি যোগায়
গহীন পর্বতের বুক আবাদ করে ভালোবাসার সক্রিয় হাত।'

এখন এটি ইলম ও হেদায়েতের উপত্যকা হয়ে উঠেছে। জামিয়ার সুপ্রশস্ত অঙ্গন, মনোহর প্রাসাদ ও এখানকার শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কারণে 'জঙ্গলে মঙ্গল আছে' কথাটি মূর্ত হয়ে উঠেছে। আলোচনা সভাটি আয়োজন করেছে রাবেতার ভারতীয় শাখা। আমন্ত্রণও করা হয়েছে ভারতীয় শিক্ষাবিদ, কবি-সাহিত্যিকদের। কিন্তু রাবেতার মধ্যপ্রাচ্য শাখার অফিস (রিয়াদ, সউদী আরব)-এর পক্ষ থেকে জামিয়াতুল ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ ইউনিভার্সিটির আরবি সাহিত্যের অধ্যাপক ও রাবেতার সহসভাপতি ড. আবদুল কুদ্দুস আবু সালেহ সেমিনারে যোগদান করতে ভারত চলে এসেছেন। শিক্ষাবিষয়ক আলোচনার পুরো অধিবেশনেই তিনি উপস্থিত থেকে আলোচনা ও বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করেন। নিজের কয়েকটি কবিতাও আবৃত্তি করেন। অন্য আলোচকদের বক্তব্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর নোট গ্রহণ এবং শেষে খুবই সন্তুষ্টচিত্তে স্বদেশে উদ্দেশ্যে ভারত ত্যাগ করেন। ভারতের প্রায় ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাহিত্যিক, লেখক-গবেষক এ সম্মেলনে যোগদান করেন। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা হেদায়েত উপত্যকার পরিবেশ, একজন বুযুর্গ ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা ও আন্তরিক দৃষ্টি এ সম্মেলনের সফলতায় নতুনমাত্রা যোগ করেছে। প্রতিনিধিগণ দূর-দূরান্তের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কষ্ট স্বীকার করে ও নিজ খরচে অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন। তারা প্রত্যেকেই বেশ স্থিরতা, মনোযোগ ও স্বচ্ছন্দের সঙ্গে অনুষ্ঠানের আগাগোড়া উপস্থিত ছিলেন (যা এ উপত্যকার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেও বেশ সংগতিপূর্ণ)।

সম্মেলনটি ৫ অধিবেশনে সমাপ্ত হয়। প্রথম অধিবেশনে একান্ত স্নেহভাজন সাইয়িদ রাবে' হাসানী নদভী (রাবেতার সেক্রেটারী) ভারত শাখার প্রতিবেদন পাঠ করে শোনান, এ পর্যন্ত যেসব কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং আগামীর পরিকল্পনা ইত্যাদি উল্লেখ করেন। এরপর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি মাওলানা শাহ্ আবদুর রহিম-এর ভাষণ উপস্থাপিত হয়।

প্রদত্ত ভাষণে তিনি সাহিত্যের শক্তি ও তার ক্রমবর্ধমান প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে أفصح العرب والعجم (আরব-অনারবের সুন্দরতম বিশুদ্ধভাষী)–সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাম–এর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ বাণী উদ্ধৃত করার পর বলেন, "আমাদের অব্যাহতভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত– মানুষের সুকুমার বৃত্তি ও ইতিবাচক প্রতিভাগুলোকে ধ্বংসের জন্য কোথায় কোথায় কী কী আয়োজন চলছে!" এরপর তিনি পশ্চিমা দুনিয়া থেকে আমদানীকৃত চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি ইঙ্গিত করেন।

সেমিনারের অধিবেশনগুলোতে মোটাদাগে যেসব বিষয়ের উপর প্রবন্ধ পঠিত হয়– সে বিষয়ে সামান্য আলোচনা করতে চাই যাতে এর বিষয়-তাৎপর্য ও রাবেতার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা প্রভৃতি সম্পর্কে পাঠকের ধারণা জন্মে।

'তের শতকের উর্দু ভাষায় ইসলামি সাহিত্যের দিক-নির্দেশক ভূমিকা, লেখক ড. আবদুল্লাহ আব্বাস নদভী, প্রফেসর, উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় মক্কা, হযরত মুহসিন কাকুরীর কবিতা مديح خير المرسلين-এর চিন্তা ও বিষয়গত বৈশিষ্ট্য' নিয়ে আলোচনা করা হয়। সেই সঙ্গে বিভিন্ন প্রশ্নের পর্যালোচনাও হয়।

এরপর 'পশ্চিমা সাহিত্যের চরিত্রগত অবয়ব ও ইসলামি সাহিত্য' লেখক ড. মুহাম্মদ রাশেদ নদভী, চেয়ারম্যান, আরবি বিভাগ, মুসলিম ইউনিভার্সিটি আলীগড়, 'আরবি ভাষায় ইসলামি সাহিত্য ও তথ্য-বিশ্লেষণে পশ্চিমা শাস্ত্র', লেখক ড. আবদুল বারী, আরবি বিভাগ, মুসলিম ইউনিভার্সিটি আলীগড়, 'পশ্চিমা সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গিগত পট', লেখক ড. মুহাম্মদ মুহসিন উসমানী নদভী, গবেষক, নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় দিল্লী। 'ইসলামি সাহিত্য ও কতিপয় সাহিত্যের নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি', লেখক মাওলানা সাঈদুর রহমান নদভী, 'ইসলামি সাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্য আন্দোলন', লেখক সাইয়িদ মুহিউদ্দীন, সাবেক ডেপুটি সেক্রেটারী ইউপি, প্রাদেশিক সরকার, 'ইসলামি সাহিত্য ও রোমান সাহিত্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ', লেখক ড. সাইয়িদ ইবরাহিম নদভী, চেয়ারম্যান, আরবি বিভাগ, উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হায়দারাবাদ, 'সাহিত্যে সমাজতন্ত্রের অশুভ প্রভাব' লেখক, ড. যফর আহমদ সিদ্দিকী নদভী, গবেষক, উর্দু বিভাগ, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস। পর্যালোচনা হয় আরবি প্রবন্ধ موقف الأدب العربي من الجنس (জেন্ডার ইস্যু বিষয়ে আরবি সাহিত্যের অবস্থান), লেখক ড. আবদুল কুদ্দুস আবু সালেহ 'আধুনিক

আরবি সাহিত্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের তৎপরতা পর্যালোচনা', লেখক প্রফেসর ড. আবদুল হালিম নদভী, নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় দিল্লী, আরবি প্রবন্ধ الإنسان في الأدب العلم الحديث وموقف الأدب الاسلامي লেখক সাইয়িদ জাফর মাসউদ নদভী' الرومانيتكي والأدب الاسلامي ড. ফরিদ আহমদ নদভী, 'ইসলামি সাহিত্যে প্রাচ্যবিদদের অবদান' লেখক সাহেবজাদা শওকত আলী খান, ড. এরাবিক ইনস্টিটিউশন রিসার্চ ইনস্টিটিউট, টুংক, 'অস্তিত্ববাদের সাহিত্যিক ব্যাখ্যা', লেখক মুহাম্মদ ফয়জান বেগ, শিক্ষক, জামিয়া মিল্লিয়া, দিল্লী, 'ইসলামি শিক্ষার আলোকে শিশুসাহিত্য' লেখক মাওলানা নজরুল হাফিয নদভী, 'পশ্চিমা সাহিত্য আন্দোলন : অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা' লেখক, বাহাউদ্দিন সুলাইমান, শিক্ষার্থী নদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌ, 'পাশ্চাত্যের আধুনিক জনবসতিতত্ত্ব ও মক্কা যুগের মুসলিম জনপদ'-এর লেখক, ড. ইয়াসিন মাযহার সিদ্দিকী নদভী, শিক্ষার্থী, ইতিহাস বিভাগ, মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় আলীগড়।

মাওলানা নূর আজিম নদভী পুরো সেমিনারটি চমৎকারভাবে পরিচালনা করেন।

পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও সাহিত্যের বিপথগামিতা, ব্যর্থতা ও লক্ষ্যভ্রষ্টতার মৌলিক কারণ

আমি উক্ত সেমিনারের উদ্বোধনী অধিবেশনের শেষভাগে যে বক্তব্য পেশ করেছি, তাতে সামগ্রিকভাবে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও দর্শন বিষয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করা হয়েছে। এখানে প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করছি :

"সবসময় কমপক্ষে আজকের সেমিনারে যে বিষয়টি আমাদের সামনে থাকা উচিত তা হলো, পাশ্চাত্যের বিপথগামিতা ও ব্যর্থতার পেছনে মৌলিক কারণ, নবুওয়তের আলো থেকে বঞ্চিত থাকা। নবুওয়ত বস্তুত এমন একটি জিনিস, যা মানুষকে অনুমান ও ধারণা থেকে বের করে এনে স্বচ্ছ বিশ্বাসের সীমানায় পৌঁছে দেয়। পাশ্চাত্য তাদের যাবতীয় উন্নতি-উৎকর্ষ সত্ত্বেও আগোগোড়া জীবনসফরে নুরে নবুওয়ত থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। এ মুহূর্তে পবিত্র কুরআন মাজীদের দু'টি আয়াত আমার মনে পড়ছে, যাতে পাশ্চাত্যের পরিষ্কার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। আয়াত দু'টিতে পাশ্চাত্যের চিন্তাধারাও নিখুঁতভাবে চিত্রিত হয়েছে। আশা করি, আরবি ভাষায় যাদের রুচি, গভীর পাণ্ডিত্য ও পারদর্শিতা রয়েছে, তারা আয়াতদ্বয়ের মর্মের গভীরে পৌঁছুতে চেষ্টা করবেন। আমি এর যথাযথ ও বিশুদ্ধতম অনুবাদ করতে অপারগ।

আয়াত দু'টির একটি সুরা নামলের এ আয়াতটি :

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٦﴾

'বরং আখেরাতের বিষয়ে তাদের চিন্তা হঠাৎ থমকে গিয়ে পতিত হয়েছে। বরং এ বিষয়ে তারা নিছক সন্দেহে ঘুরপাক খাচ্ছে। বরং তারা এ ব্যাপারে অন্ধত্ববরণ করেছে'।[১]

আমি অপারগতা প্রকাশ করছি, যদিও কুরআন নাযিলকারী ও কুরআনের প্রত্যক্ষ বাহকের সঙ্গে অপারগতার স্পর্ধাও দেখানোর সুযোগ নেই– তবে কুরআনের উচ্চ ভাষাশিল্প, কুরআনের অলৌকিকত্বের মর্মভেদ করতে অপারগতা জ্ঞাপন করে بل ادّرك علمهم -এর অনুবাদ করছি– তাদের জ্ঞান 'বিকল' হয়ে গেছে। পাশ্চাত্যের উন্নয়ন-অগ্রগতিকে সামনে রেখে বিষয়টির সবচাইতে সুন্দর উদাহরণ হিসেবে আমার চিন্তায় হাজির হয়েছে এমনটাই যে, গাড়ি চলছে তো চলছেই, হঠাৎ তাতে এমন একটি যান্ত্রিক ত্রুটি ঘটে গেছে যে, তা সম্পূর্ণ বিকল হয়ে পড়ে আছে। তার জন্যে পাংচার শব্দটাই সমধিক যুৎসই বিবেচনা করি।

চিন্তা করে দেখুন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের গাড়িটি মাইলের পর মাইল দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে, যা যুক্তিতত্ত্ব, প্রকৃতি, গণিতশাস্ত্র এমনকি অতিপ্রাকৃত বিষয় পর্যন্ত বিশ্লেষণ করছে, নিজেদের চিন্তাশীলতার বিস্তার ও ক্ষিপ্রতা প্রদর্শন করছে। যখন সে (واجب الوجود) অবশ্যম্ভাবী সত্তার অস্তিত্ব ও ইহকালীন জীবনের পরের জীবনটির সীমানায় হাজির হয়েছে, হঠাৎ করেই সে বিকল হয়ে গেছে। আয়াতে পশ্চিমাদের চিন্তার বিভিন্ন মোড় ও প্রকৃত অবস্থার চিত্রণও প্রতিফলিত হয়। 'বরং এ বিষয়ে তারা নিছক সন্দেহে ঘুরপাক খাচ্ছে। বরং তারা এ ব্যাপারে সকল প্রকারের দৃষ্টিশক্তি ও দূরদর্শিতা হারিয়ে অন্ধত্বের শিকার হয়েছে।' দ্বিতীয় আয়াতটি হলো– সেটা যা ইমাম ইবন্ তাইমিয়্যা তার আন্ নুবুওয়াত গ্রন্থের বলতে গেলে ভিত হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ ﴿٣٩﴾

'যা কিছুই তাদের বুদ্ধির অগম্য, তাকে তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করে বসেছে।'[২]

---

১. সুরা নামল : ৬৬
২. সূরা ইউনুস : ৩৯

পাশ্চাত্যের এক ধরনের খামখেয়ালী যে, 'যা দৃশ্যমান নয় তার অস্তিত্বও নেই।' অস্তিত্বমান বস্তুগুলোকে দৃষ্টিগ্রাহ্যতার সীমায় বন্দী করে নেয়া মনুষ্য বুদ্ধির চরম দুর্বলতা। এরূপ দুর্বলতাকে তারা নাম দিয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞান। এ যেন অন্ধ ছেলের নাম পদ্মলোচন! এটি মানুষের চরম দুর্ভাগ্য।

আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত জ্ঞান-বিজ্ঞান ওহি-ভিত্তিক জ্ঞানের মাঝে এটাই বড় প্রভেদ, যা হযরত ইবরাহিম (আ.) খুবই সোজাসুজিভাবে বর্ণনা করেছেন :

وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ

'আমি সঠিক পথের হেদায়েতপ্রাপ্ত; তিনি (আল্লাহ) আমার
হাত ধরে সোজা পথে আমাকে তুলে এনেছেন। অতএব,
এ বিষয়ে আর সন্দেহ কিংবা তর্কের অবকাশ কোথায় ?'[১]

সাফা পাহাড়ের সেই ঐতিহাসিক ভাষণেরও সারবস্তু এটাই যে, সে ভাষণে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন পাহাড়ের চূড়ায় আর সমবেত লোকেরা ছিলো নিচের উপত্যকায়। তিনি বলেছিলেন, 'আমি যদি বলি এ পাহাড়ের ওপাশে তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণোদ্যত একদল শত্রু সৈন্য ওঁত পেতে আছে– তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে?' আরবের দর্শন ও সংস্কৃতি পশ্চিমা দর্শন-সংস্কৃতির চাইতে অনগ্রসর ছিলো কিন্তু তাদের সুস্থ বোধশক্তি, পাশ্চাত্যের চাইতে প্রখর ছিল। তারা অনুধাবন করেছিল, কথাটি বলছেন এমন ব্যক্তি যিনি পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন। সেখান থেকে তিনি সামনের দিকে দেখতেও পাচ্ছেন। তিনি বাস্তব দৃশ্য দেখার ক্ষমতাও রাখেন এবং তিনি কখনও অসত্য বলতে পারেন না। তারা সরলভাবে জবাব দিয়েছিল 'নিশ্চয় বিশ্বাস করবো।'

সমকালীন আরবসমাজের লোকগুলো সুস্থ বোধশক্তির মাধ্যমেই সত্যের সীমানায় পৌঁছতে পেরেছে, যেখানে সেদিন গ্রীক জাতি পৌঁছুতে পারেনি আর পাশ্চাত্য জাতি তো আজও পারেনি। উপস্থিত সেই আরবরা তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিল যে, শুধু এই কারণে তাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করা যায় না যে, তার বলা বিষয়টি আমাদের দৃষ্টির গোচরীভূত নয়। আমি মনে করি, পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইসলামি আকিদা বিশ্বাসের বাস্তবতাকে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে এ তফাৎটি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নেয়া

---

১. সূরা আনআম : ৮০

দরকার। অন্যথায়, প্রকৃত সত্যের উৎসমুখ পর্যন্ত পৌঁছার কোনও সূত্র থাকবে না।[১]

পৃথিবীর জ্ঞান, চিন্তা ও সাহিত্যের নেতৃত্ব : মুসলমানদের অবস্থান ও দায়িত্ব

সেমিনারের শেষ অধিবেশনে আমার সমাপণী বক্তব্যের কয়েকটি নির্বাচিত অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি :

বক্তৃতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতার দিকে দর্শক-শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আমি বলেছি, "দুনিয়ার জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব এককভাবে মুসলমানদের অধিকার। এ নেতৃত্ব থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলে পৃথিবী এবং আমরা নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত হবো।

إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾

"যদি এমনটি না করা হয়, তাহলে পৃথিবীতে নৈরাজ্য ও অশান্তি ছড়িয়ে পড়বে।"[২]

মানবজাতির সামনে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে পুনরায় মেলে ধরার গুরু দায়িত্ব মহান আল্লাহ এই ছোট দলটির (আনসার-মুহাজিরীনের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধা লোকগুলোর সংখ্যা তখনও দু'হাজারের বেশি নয়) ওপর ন্যস্ত করেছেন। আর বলেছেন, দেখো ! তোমরা যদি এখন ইসলামি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারো, ধ্বংসের প্রান্তে এসে দাঁড়ানো ও আত্মহননে প্রবৃত্ত মানবজাতিকে দূরে টেনে আনতে না পারো, তবে পৃথিবীর ভাগ্যে চূড়ান্ত ধ্বংসই লিপিবদ্ধ হয়ে যাবে। ইতিহাস সাক্ষী, এই ছোট্ট দলটি এ মহান ও নাজুকতম দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে।

এতকিছু কীভাবে সম্ভব হয়েছিল ? এটি তখনই সম্ভব হয়েছিল, যখন দলটি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেছে এবং তারা গোটা পৃথিবীর সামনে একটি নতুন জীবনধারার অসাধারণ ও অভূতপূর্ব একটি চিত্র উপস্থাপন করেছে। এরপর আপনারা আমাকে অনুমতি দিলে আমি এ পর্যন্ত বলতে চাই, তারা মানবজাতির বিশ্বাস, মূল্যবোধ, কৃষ্টি ও সভ্যতার নেতৃত্ব কবুল করে নিয়েছে। বাস্তবতা হলো, মানবজাতির ভাগ্য পরিবর্তনে এর কোনো বিকল্প ছিল না।

---

১. আত্মজীবনীতে প্রবন্ধটি সংযুক্ত করার সময় মৌখিক বক্তৃতার কপিতে কিছুটা সম্পাদনা করা হয়েছে।

২. সুরা আনফাল : ৭৩

তারা যদি নিজেদেরকে এ খেদমতের উপযুক্ত ও যোগ্য হিসেবে গড়তে সক্ষম না হতো, তাহলে তারা ঈমান-ইয়াকিনের সম্পদ লাভে ধন্য হতো না। আর বিশ্বের জন্য নতুন জীবনব্যবস্থার বাস্তব নমুনাও পেশ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। অনুরূপভাবে, মানুষের জড়তা, মনন, প্রতিভা, সক্ষমতা, চিন্তাধারা ও স্বভাবজাত শক্তিকে কল্যাণমুখী ও সৃজনশীলতার পথে তুলে আনা তাদের জন্য সম্ভবপর হয়ে উঠতো না।

এই ছোট্ট প্রজন্মটি যাদেরকে আল্লাহ মানবজাতির নেতৃত্ব দেবার জন্য বাছাই করলেন, আল্লাহর সিদ্ধান্ত যেন এরূপ যে, তারা কেবল একটি সমাজের বা যুগের জন্য প্রযোজ্য জীবনধারার ভিত্তি স্থাপন করেননি বরং যেন প্রত্যেক যুগের (তারা যত উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হোক না কেন) মানবসমাজের মানবিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, মনন, শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান, উন্নয়ন, সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রভৃতি সবকিছুতেই নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হলো। তারা হাতে-কলমে দেখিয়ে দিয়েছেন, মুসলমানরা বেশ কয়েক শতকজুড়ে গোটা মানবজাতির রাজনৈতিক, প্রশাসনিক নেতৃত্বই শুধু নয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব নিজেদের দক্ষ হাতে সামলেছেন। কমপক্ষে সপ্তম শতকে তাতারীদের হামলা পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে এবং তার পরবর্তী সময়ে আংশিক ও বিচ্ছিন্নভাবে শুধু বিশ্বাস, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, সংস্কার ও সত্য ধর্মের ঝান্ডা বুলন্দ করার কাজই সম্পাদন করেননি বরং জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি সবকিছুর দিকনির্দেশকের ভূমিকাও পালন করেছেন। উপরোক্ত সবক্ষেত্রে তারা যথেষ্ট যোগ্যতা ও পারদর্শিতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

আমি নিজের অধ্যয়নের আলোকে একথা বলিষ্ঠভাবে দাবি করতে পারি যে, মুসলমানরা রাজনীতি, সমরশক্তি, শাসন-প্রশাসনসহ শিল্প-সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছে। মুসলিম উম্মাহ এমনসব ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করেছে– যারা সমকালের জ্ঞান-বিজ্ঞান, উন্নত অভিরুচি, ভালোবাসা, ত্যাগ, সেবা, গ্রন্থরচনা, গবেষণা প্রভৃতি বিচারে সেরা ও শীর্ষস্থানীয় কীর্তিমান। আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও হাদিসশাস্ত্রের ইমামদের কথা বাদই দিলাম। কারণ, উম্মাহদের সব প্রজন্মে তারা তুলনা-রহিত। প্রতিটি যুগে এভাবেই বিশ্বসেরা বিশেষজ্ঞ, শাস্ত্রবিদ, সুবক্তা, লেখক-গবেষক ক্রমাগত সৃষ্টি হয়েছেন, যারা সমকালীন বিশ্বে ছিলেন একক ও অনন্য। যদি চতুর্থ শতকে আপনি দৃষ্টি ফেরান তো ইমাম আবুল হাসান আশআরী, কাজী আবু বকর কল্লানী, শায়খ আবু ইসহাক ইসফারায়েনীকে দেখবেন। আর পঞ্চম হিজরিতে দৃষ্টি মেলে তাকালে তখন আল্লামা ইবন্ হাযম আন্দুলুসী,

ইমাম গাজ্জালী[১]কে দেখবেন আর যদি ষষ্ঠ শতকে নজর ফেরান তো ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী[২]কে দেখা যাবে। আপনি সপ্তম ও অষ্টম হিজরিতে প্রবেশ করলে শায়খুল ইসলাম হাফিয ইবন্ তাইমিয়্যা, আল্লামা ইবরাহিম আম শাতিবী (মুআফিকাত গ্রন্থকার)-এর সাক্ষাৎ মিলবে। এভাবে হিজরি নবম শতকে হাদিসশাস্ত্রের ইমাম ইবন্ হাজার আসকালানীকে পাবেন, হিজরি দশ শতকে আল্লামা শামসুদ্দিন সাখাভী, আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতীর মতো মনীষীর সঙ্গে আপনার দেখা হয়ে যাবে। এ ধারাবাহিকতা বরাবরই চলে এসেছে। একাদশ ও দ্বাদশ শতকে ভারতবর্ষের মতো (যা ইসলামের কেন্দ্রভূমি ও ইসলামি শিক্ষা থেকে বহুদূরবর্তী) জনপদেও আপনি মোল্লা মাহমুদ জৌনপুরী, হাকিমুল ইসলাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর মতো উঁচুমাপের জ্ঞানগবেষক, লেখক-গ্রন্থকার ও ক্ষণজন্মা মহাপুরুষকে দেখবেন।

এ পর্যন্ত তো তাঁদের কথা হলো, যারা আকিদা, কালামশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা ও ইসলামি তথ্যভাণ্ডার চষে বেরিয়েছেন, ইসলামি শরীয়তের ময়দানে বিস্তৃত গবেষণা ও গভীর অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমে উৎকৃষ্ট মেধা ও প্রখর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু পৃথিবীতে নেতৃত্ব দেবার জন্য এগুলো যথেষ্ট নয়। ভূগোল, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদ ও গণিতশাস্ত্র, চিকিৎসা, রসায়ন, ইতিহাস, দর্শন, জাতিসত্তা ও ধর্মতত্ত্ব, সংস্কৃতি প্রভৃতির তুলনামূলক গবেষণা ও পর্যালোচনার মধ্যে এ উম্মাহ এমনসব ব্যক্তি সৃষ্টি করেছে, যারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গোটা দুনিয়াতে এককভাবে নেতৃত্ব দিয়েছে। যেমন– মুহাম্মদ আল ইদরিসী যিনি 'আল মামালিক ওয়াল মাসালিক' গ্রন্থের গ্রন্থকার। মুহাম্মদ ইবরাহিম আল হুসাইম, মুহাম্মদ ইবন মুসা আল খাওয়ারেজমী, মুহাম্মদ জাবের আল বাত্তানী, আবু বকর আর রাযী, জিয়া ইবন্ বায়তার, শাইখুর রাঈস আবু আলী ইবন্ সিনা, ইবন্ খালদুন, আবু রায়হান আল বেরুনী[৩]

কবিতা ও সাহিত্যেও এমন বিরল প্রতিভা (Genius) সৃষ্টি হয়েছে, যাদের সৃষ্টিকর্ম, আঙ্গিক ও প্রবর্তিত ধারা মানুষের চিন্তা ও মননে শতকের পর শতক ধরে প্রভাব বিস্তার করেছে এবং টিকে আছে, যাদের মধ্যে মাওলানা

---

১. ইমাম গাজ্জালীর মৃত্যু হয় ৫০৫ হিজরিতে কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানে তার অবদান ও গবেষণা ইত্যাদি পঞ্চম শতকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

২. ইমাম রাযীর মৃত্যু সপ্তম শতকের প্রথমভাগে ৬০৬ হিজরিতে কিন্তু তার জ্ঞান অবদান-তৎপরতা ষষ্ঠ শতকজুড়ে বিস্তৃত হয়েছে।

৩. এ তালিকাও পূর্ণাঙ্গ নয় বরং সংক্ষিপ্ত তালিকাটি নমুনা হিসেবে প্রদত্ত হয়েছে।

জালালুদ্দিন রুমী, শায়খ সাদী, হাফিয সিরাজী, হাকিম সানাঈ ও আমির খসরুর সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষত, রুমীর মসনভীর প্রভাব সবচেয়ে গভীর ও ব্যাপক পরিসরে ছড়িয়ে গেছে। কবিতা, সাহিত্য, দর্শন, ইলমে কালাম সবকিছুতেই এর প্রভাব সমান ও সুস্পষ্ট। এটি বহু শতক পর্যন্ত সংশয়বাদী অবিশ্বাসীদেরকে ধর্মহীনতার পথ থেকে বিশ্বাসের আলোতে ফিরিতে আনতে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।

এ জাতি বিশ্বের নেতৃত্বের বাগডোর ছেড়ে দিলে নিজেরা এবং পৃথিবী উভয়ে দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কাজেই আজ যদি আমাদের জ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, লেখক-গবেষকরা আরাম-আয়েশের অবকাশ যাপনে নিভৃতচারী হয়ে যান অথবা নিজেদের একটি নিরাপদ ও নির্ঝঞ্ঝাট জগৎ তৈরি করে নেন, তবে পুরো মানবজাতি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারা নিজেরাও ঈমানী দাওয়াতের পয়গাম বহনের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবেন।

সম্মানিত উপস্থিতি! এ সেমিনারে প্রাচ্যবিদদের আলোচনা বারবার উঠে এসেছে। এটা সত্য যে, ইউরোপীয় এসব জ্ঞানসাধক সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম করেছেন, যার ফলে তাদের উন্নতিও চোখে পড়ার মতো। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে, তাদের লক্ষ্য বরাবরই প্রাচ্যের সাম্রাজ্যবাদী কর্মসূচি বাস্তবায়ন, উদারমনা প্রজন্ম ও মুক্ত মন-মানসিকতার সমাজ। মূলত তারা একটি মিশনারী গন্তব্যেই পথ চলেছে। সমাজের সামনে তারা জ্ঞানগত পুঁজি উপস্থাপন করেছে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণায় মানুষের অনগ্রসরতা ও দুর্বলতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। উদারমনা জাতিগুলোকে হীনমন্যতা, ধর্ম ও ধর্মের উৎস (Sources) সম্পর্কে তাদের মনে সন্দেহ-সংশয়ের বীজ বপন, তাদের পূর্বপুরুষ সম্পর্কে অনাস্থা সৃষ্টি করা তাদের কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ দিক।

যখনই ক্রমে গোটা বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থা প্রায় শেষ হয়ে গেছে, তখন সমাজের তরুণ প্রজন্মের একটি অংশকে পড়ালেখার প্রয়োজনে ইউরোপ যাবার প্রয়োজন হয়। তবে আমি আপনাদেরকে বোঝাতে চাই, প্রাচ্যবিদদের মধ্যে প্রবল উদ্যম ছিল, পরিশ্রমে মানসিকতা ছিল, উঁচু আত্মবিশ্বাস ছিল। পরে এতে বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে গেছে। বর্তমানে ইউরোপ-আমেরিকায় প্রাচ্যবিদদের কাজের গতিতে ভাটির টান লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাদের সফলতার একটি বড় রহস্য ছিল, তারা তাদের বিষয়টিকে জীবনের লক্ষ্যবস্তুই বানিয়ে নিয়েছিল এবং এভাবে তারা তাতে গভীরভাবে

অবগাহন করতো। কিন্তু তাদের এই অহমিকাবোধ যে, তারা অনেক বড় মাপের জ্ঞানী! এটি সামগ্রিকভাবে সত্য নয়। আমি ইউরোপে কয়েকজন প্রাচ্যবিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বুঝাতে পেরেছি, তারা কেবল নির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা রাখেন, যা নিয়ে তাদের পড়াশোনা রয়েছে, তারা গবেষণা করছেন, গ্রন্থ রচনা করছেন।

তাদের বিপরীতে ভারতবর্ষে এমন বহু গবেষণাকর্ম হয়েছে, পাশ্চাত্যে যার তুলনাই মিলবে না। উদাহরণ হিসেবে আমি আল্লামা সাইয়িদ সুলাইমান নদভীর গ্রন্থ 'খৈয়্যাম' এর কথা উল্লেখ করতে পারি। তার এ গ্রন্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ শুধু নয় বরং চূড়ান্ত দলিল। আল্লামা ইকবাল এটি পাঠ করে বলেছিলেন, 'এ বিষয়ে এমন গ্রন্থ আরেকটি রচনা করা বর্তমানে খুবই দুষ্কর।' ইসলামের 'শিরীনের' জন্য সুলাইমান নদভীর চেয়ে বড় 'ফরহাদ' আর কে হতে পারে ?

এভাবে আল্লামা শিবলী নুমানীর 'শেয়েরুল আজম' (হাফি মাহমুদ খান শিরানীর সমালোচনা সত্ত্বেও) ইরান ও ভারতের সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এভাবে আমি আরও কতিপয় গ্রন্থের নাম উল্লেখ করতে পারি যথা– মাওলানা সাইয়িদ সুলাইমান নদভীর 'আরব ওয়া হিন্দ কা তায়াল্লুকাত' আরবোঁও কা জাহায রানী, মাওলানা শিবলীর الجزية في الإسلام, কুতুবখানা ইস্কান্দারিয়া, মাওলানা হাকিম সাইয়িদ আবদুল হাই এর الثقافة الاسلامية في الهند, নুযহাতুল খাওয়াতির সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অতুলনীয় গ্রন্থ।

কিন্তু আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে আমি বলবো, (এবং এটি আত্মসমালোচনা হিসেবে নেবেন), আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণার হক আদায় করা হয় না। বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্ম এখনও হয়নি। অন্যদিকে, ইংরেজি ভাষায় বিশেষত সাইয়িদ আমির আলী, 'দ্য স্পিরিট অব ইসলাম'-এর পর এ পর্যন্ত কোনও গবেষক ইংরেজীতে ইসলাম সম্বন্ধে উঁচুমানের কোনও গ্রন্থ রচনা করেননি। এভাবে আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলো (A literary History Of Persia) নিকলসনের গ্রন্থ (A literary History Of The Arabs) পড়াতে বাধ্য হচ্ছে। এভাবে বলা যায়, পি.কে হিট্টির A Short Hostory Of Arabs থেকে আজও সহযোগিতা নিতে হচ্ছে। আমাদের শিক্ষাবিদ ও গবেষকগণ আজ পর্যন্ত ওসব গ্রন্থের সমতুল্য কোনও গ্রন্থ রচনা করেননি, যা ইউরোপীয় ভার্সিটিগুলোতে পড়ানো যাবে। অন্যদিকে, ফিকহশাস্ত্রের উদ্ভাবন ও হাদিসশাস্ত্রের ইতিহাস বিষয়ে

শাখত ও গোল্ড যাহরের গ্রন্থগুলোর বিকল্প হতে পারে এমন গ্রন্থ রচিত হয়নি।

এটি বড় একটি শূন্যতা, যা পূরণ হওয়া খুবই জরুরি। এ বিষয়ের দিকে শিক্ষাবিদ, গবেষকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করবার জন্য রাবেতায়ে আদব এ সেমিনার একটি উপযুক্ত স্থান। এখানে আমাদের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এসেছেন, তাদের গোচরে আনতে চাই, আমাদের শিক্ষিত সমাজকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে। এটি যদি আমরা গ্রহণ না করি, তাহলে আমরা জাতির ক্ষতি করছি! সবেমাত্র যারা শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন, তাদেরও বলতে চাই, যে জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, সাধনা ও বিকাশের দায়িত্ব স্বতপ্রণোদিত হয়ে গ্রহণ না করে, সেই জাতি দুনিয়াতে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারে না, অন্যদের প্রভাবিত করতে পারে না। যারা আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের হেরেম নির্মাতা হবে, তারাই জাতিকে জ্ঞানগত বর্বরতার অন্ধকার থেকে বের করে আনতে পারবে। তাদের কলম তথা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যের হাতিয়ারে সজ্জিত হতে হবে। বর্তমান যুগ শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগ, এটি লেখা ও গবেষণার যুগ, সমালোচনা-পর্যালোচনার যুগ। জাগতিক শিক্ষামুক্ত উম্মি নবীর ওপর যে ওহি নাযিল হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে, কলমের মাধ্যমে জ্ঞানচর্চা করতে হবে। তাঁর উম্মতকে কলম-কাগজের অধিকারী হতে শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তাদেরকে পৃথিবীর সব জাতির শিক্ষক হতে হবে। তারা শিক্ষাবিদদের শিক্ষক, দার্শনিকদের শিক্ষাগুরু, শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষানিকেতনের তারাই শিক্ষক। তাদের সাহিত্য, বুদ্ধিবৃত্তি এবং সাহিত্য-চিন্তার নিয়ন্ত্রক ও সমীক্ষক হতে হবে, পুরো দুনিয়ার চিন্তানৈতিক দায়িত্বশীল তারাই।

"চেঙ্গিস আর ফিরিঙ্গিরা পৃথিবী বিরান করে দিয়েছে;
পৃথিবীকে আবারও নির্মাণ করতে ফিরে আসবে হারাম নির্মাতা।
দুনিয়াকে সুগভীর নিদ্রা থেকে তারা জাগাবেই।"

নবম অধ্যায়

মালয়েশিয়া পরিভ্রমণ এবং সেখানকার বিভিন্ন সম্মেলন ও মুসলিম সংগঠনের উদ্দেশে বক্তৃতা

মালয়েশিয়া সফর : দাওয়াত ও আন্দোলন

মালয়েশিয়া – যাকে একসময় মালয় বলা হত – বঙ্গোপসাগরের পূর্বে দ্বীপ আকারে অবস্থিত। এর আশেপাশে রয়েছে বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জসম্বলিত বিপুল এলাকা। মালয়েশিয়াকে দূর প্রাচ্যের অংশ মনে করা হয়, যা এর পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত। মালয়েশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী রাষ্ট্র হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ইত্যাদি।[১]

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমি উল্লেখ করেছি যে, আমার বহির্বিশ্বের সফর ছিল অধিকাংশ সময় উত্তর ও পশ্চিম দিকে– ইসলামী দেশগুলোর মধ্যে আলজিরিয়া, মরক্কো ও রাবাত এবং অমুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ইউরোপ ও আমেরিকা। দক্ষিণে একবার শ্রীলংকা এবং পূর্বে একবার মিয়ানমার ও একবার বাংলাদেশ সফরের সুযোগ হয়েছে।

মালয়েশিয়ার কতিপয় যুবক দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামায় শিক্ষালাভ করেন এবং যোগ্যতা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হন। ইন্দোনেশিয়ায়ও বেশ কিছু বিজ্ঞ নদভী যুবক ভাষার ঐক্য ও সাযুজ্য এবং ভৌগোলিক ঘনিষ্ঠতার কারণে মালয়েশিয়াকে নিজেদের ধর্মীয় ও শিক্ষাবিষয়ক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেন। নাদওয়া থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত আলিমগণ সহনশীলতা, সংস্কৃতির মনোবৃত্তি ও কর্মোদ্দীপনার মাধ্যমে ওখানকার ইসলামী সংগঠন ও

---

১. মালয়েশিয়ার ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর বিস্তারিত বিবরণ, জনসংখ্যা, মুসলিম সংখ্যাগঠিতার বৈশিষ্ট্য, ধর্মীয় ও শিক্ষা আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন আমার সফরসঙ্গী মাওলানা সাইয়িদ রাবে হাসানী নদভী লিখিত নিবন্ধে দেখা যেতে পারে। নিবন্ধটি দিল্লী থেকে প্রকাশিত মাসিক "যিকর ও ফিকর" মুহররম/সফর, ১৪০০ হিজরী সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৮৭ সংখ্যায় (৫-৬) প্রকাশিত হয়।

আন্দোলনে বিশেষ আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হন। এক বছর আগে নাদওয়াতুল উলামার দু'জন শিক্ষক– মাওলানা নজরুল হাফিয নদভী ও মাওলানা শামসুল হক নদভী মালয়েশিয়া সফর করেন। তাঁদের পরিভ্রমণ ও পরিচিতির কারণে এখানে আমাকে দাওয়াত দেয়ার অধিকতর আগ্রহ সৃষ্টি হয়। মাললেশিয়ার নদভী যুবকগণ স্থানীয় দল ও সংগঠনের সহযোগিতা নিয়ে তাদের পক্ষ থেকে এবং বিশেষভাবে ওখানকার সক্রিয় ইসলামী সংগঠন আবিম (Abim), এর পক্ষ হতে দাওয়াতনামা পাঠান।

এ সংগঠনটি ইসলামী চিন্তা-চেতনার ধারক এবং দাওয়াতের ময়দানে অত্যন্ত সক্রিয় আধুনিক ও অগ্রসর চিন্তধারার মানুষের একটি জীবন্ত মঞ্চ। সমকালীন পরিস্থিতি, সমস্যা, বিপদ, কর্মীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি ও কর্মকৌশলে প্রণয়নে এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

Abim-এর সাবেক সভাপতি আনোয়ার ইবরাহীম এ সময় নতুন মন্ত্রীসভার শিক্ষামন্ত্রী। অপরদিকে 'আল হিযর আল ইসলামী'সহ কয়েকটি সংগঠন এবং বিভিন্ন অঞ্চলে দাওয়াত ও তাবলীগের ময়দানে কর্মরত ভাইয়েরা এ সফর ও কর্মসূচিকে সফল করার ক্ষেত্রে আন্তরিকতা ও সহযোগিতার হাত বাড়ান। এক্ষেত্রে দু'জন নদভী ফাযিল আহমদ ফাহমি যমযম ইন্দোনেশি ও মুহাম্মদ আলী রজবের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দিল্লী থেকে কুয়ালালামপুর

মালয়েশিয়ার সফরসঙ্গী হিসেবে মূলত স্নেহের মাওলানা মুহাম্মদ রা'বে হাসানী নদভীকে বাছাই করা হয়। তাঁর সাথে মালয়েশিয়ায় নদভী শিক্ষক ও যুবকদের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। তাঁদের মধ্যে অনেকে মাওলানা রা'বে হাসানী নদভীর ছাত্র। শারীরিক অসুস্থতা, দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার কারণে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, দীর্ঘ সফরে দু'জন সফরসঙ্গী অধিকতর যুক্তিযুক্ত। হযরত শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া (রহ.) শত বছর আগে এ বিষয়ে বিশেষ জোর দিতেন যে, বিদেশ সফরে দু'জন সঙ্গী থাকা জরুরী।

ওই সময় এর গূঢ় অর্থ ও তাৎপর্য বুঝে আসে নি। কিন্তু এখন এ নির্দেশনা ও পরামর্শের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি। এ সফরে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে একটি গায়েবী মদদ আসে, আর তাহলো– আমার স্নেহভাজন সাইয়িদ গোলাম মুহাম্মদ হায়দারাবাদীর সঙ্গ পেয়ে যাই। তিনি দীর্ঘ দিন যাবত জেদ্দা বিমান বন্দরে প্রকোশলী হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

বর্তমান সফরে নিজ মাতৃভূমি হায়দারাবাদে অবস্থান করছেন। তাঁর দীর্ঘ দিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল, বিদেশের কোন সফরে তিনি যেন আমার সফরসঙ্গী হন। তিনি যখন মালয়েশিয়ার সফরের কথা জানতে পারেন, নিজ খরচে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আমার সফরসঙ্গী হতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমি নিজের প্রয়োজন ও বিশেষ সম্পর্কের কারণে তাঁর এ প্রস্তাবে সম্মত হই।

১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে ২ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লী থেকে রুশ বিমান সংস্থা অ্যারোফ্লেত যোগে আমরা তিনজন মালয়েশিয়ায় রাজধানী কুয়ালামাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হই। আমাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য কুয়ালালামপুর বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আবদুর রউফ মিশরী, কাদাহ অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'জমিয়াতে তারবিয়াত আল ইসলামী'র প্রধান বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শায়খ নেয়ামত ইউসুফ মালয়েশী, বিভিন্ন দাওয়াতী সংগঠনের প্রতিনিধি ও নাদওয়ার স্নাতকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আমন্ত্রণকারীদের সহযোগিতার ফলে বিমান বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে বেশি সময় লাগেনি এবং আমরা দুপুর আড়াইটার সময় বিশ্রামের স্থলে পৌঁছি। মালয়েশিয়া ও ভারতের মধ্যে সময়ের ব্যবধান দেড় ঘন্টা। গ্রীস্মকালে আরো এক ঘন্টা বাড়িয়ে আড়াই ঘন্টা করা হয়। দিল্লী থেকে কুয়ালালামপুর সদরে সময় ব্যয় হয় আসলে পাঁচ ঘন্টা। কিন্তু স্থানীয় সময়ের ব্যবধানে সাড়ে সাত ঘন্টা দাঁড়ায়। আমরা ভোর বেলা রওনা দিয়ে যোহরের পরে পৌঁছি।

কুয়ালালামপুর দশ লাখ জনঅধ্যুষিত মালশিয়ার সবচেয়ে বড় শহর। পরিচ্ছন্নতা, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সাংস্কৃতিক মানদন্ডে ইউরোপের যে কোনো মাঝারি শহরের চাইতে কোনো অংশে কম নয়। কুয়ালালামপুর বিমান বন্দর ও ইউরোপীয় বিমান বন্দরের মত উন্নত। অট্টালিকা, সড়ক, বাজার, যোগাযোগ, পরিচ্ছন্নতা ও ব্যবস্থাপানার দিক থেকে ইউরোপের মত মানসম্পন্ন। যেহেতু জনবসতির অধিকাংশ মুসলমান, সেহেতু ইসলামী জীবনধারা তাঁদের জীবনে প্রতিভাত। ভারতীয় মুসলমানের সম্পর্ক ভাষাগত পার্থক্য বাদ দিলে অন্য কোনো ব্যবধান চোখে পড়ে না। ইংরেজি ভাষা জানার কারণে কোন পার্থক্য বোঝা যায় না। কুয়ালালামপুর পৌঁছার দিন নিয়মিত কোন কর্মসূচি রাখা হয়নি। তবে বাদ মাগরিব আমন্ত্রণকারী সংগঠন Abim-এর দায়িত্বশীল কর্তকর্তাগণ দেখা করতে আসেন। তাদের সাথে কথা

প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। আল্লাহর পথে দাওয়াতের মর্যাদা, মুসলমানের দাঈদের চরিত্র ও গুণাবলি, দাওয়াতে দ্বীনের ইতিহাসের আলোকোজ্জ্বল উদাহরণ তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। ব্যক্তিগত পরিচয় ও পারস্পরিক আলোচনা মধ্যে দিয়ে প্রথম দিন সমাপ্ত হয়।

ত্রিঙ্গানু সফর : প্রদত্ত এক রাশ বক্তৃতা

পর দিন ৩ এপ্রিলের কর্মসূচী ছিল মালয়েশিয়ার উত্তর-পূর্বে প্রদেশ ত্রিঙ্গানু যাত্রা। ভোরে রওনা হয়ে সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তন। দূরত্ব প্রায় আড়াইশ মাইল। অতি প্রত্যুষে ত্রিঙ্গানুর প্রধান কেন্দ্র কুয়ালাত্রিঙ্গানু যাত্রা শুরু করি। ওখানে শায়খ আবুদল হাদী নামে একজন প্রবীণ দাঈ আছেন, যিনি মদ্বীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া লেখা শেষ করে নিজদেশে দাওয়াতী ও তারবিয়াতী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে বিশেষ মর্যাদার গড়ে তুলতে সক্ষম হন। প্রতি জুমার দিন ওখানকার বড় মসজিদে তিনি ভাষণ দেন, যেখানে দূর ও নিকটের বহু মুসলমান বক্তব্য শুনতে আসেন। শায়খ আবদুল হাদী আগেভাগেই আমাদের আসার ঘোষণা দিয়েছিলেন। ফলে, জনসমাগম ছিল উপচে পড়া। জুমার নামাযের আগে আমি আরবী ভাষায় খুতবা প্রদান করি। শায়খ আবদুল হাদী এ ভাষণের মালয়েশীয় ভাষায় তরজমা পেশ করেন। আমার ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল ইসলামের দিকে পুনঃপ্রত্যাবর্তন ('ইলাল ইসলাম মিন জাদিদ')। নানা উদাহরণ দিয়ে আমি বোঝাবার চেষ্ঠা করি যে, প্রতিটি বস্তুর পৃথক গুরুত্ব ও উপকারিতা রয়েছে; নির্দিষ্ট থাকে তার মান ও মর্যাদাও। শ্রোতাদের বোঝাবার জন্য আমার হাতে রক্ষিত লাঠি দেখিয়ে বলি, "এটি যদি কোন কাজে না আসে, এটির ব্যবহার যদি কোন উপকার না দেয়, তাহলে এর উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের আগে কোন মূল্য নেই।" মুসলিম মিল্লাতের সৃষ্টি, নির্বাচন ও সম্মানের কারণ কী। তার মর্যাদা ও দায়িত্ব কি? বর্তমান সময়ে এবং এ দেশে এর প্রয়োজনীয়তা কী? যদি মুসলমানরা তাদের গুরু দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে জীবনে কি ধরণের শূন্যতা সৃষ্টি হতে পারে, এসব বিষয়ে আলোকপাত করি।

আমি শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে এ কথাও বলি যে, যদি মুসলামানগণ সঠিক জীবনধারা চরিত্র ও সামাজিকতা অনুশীলন করে, তাহলে দেশ ও সমাজ ব্যবস্থায় কী ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে হুদায়বিয়ার সন্ধির উদাহরণ উপস্থাপন করি। এ সন্ধির পর অমুসলিমগণ মদ্বীনা মুনাওয়ারা হিজরতকারীদের স্বজন, নিকটবর্তী একই ভাষাভাষী, একই বংশের ভাইদের

সাথে স্বাধীনভাবে মিলিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে এবং ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়। সন্ধিনামার কারণে জানের ভয় ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সান্নিধ্যের কারণে মুহাজিরদের মধ্যে চারিত্রিক এবং অপরাপর যে পরিবর্তন গুলো আসে, তা কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়। রক্ত, ভাষা, সমাজ ও সংস্কৃতির কোনো ব্যবধান না থাকা সত্ত্বেও অমুসলিমগণ নিজেদের এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকারী মুহাজিরদের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য দেখে অভিভূত হন। মুহাজিরদের জীবনধারার পরিবর্তনে প্রভাবিত হয়ে মুহাজির ও প্রখ্যাত তাবেঈ ইমাম যুহরীর ভাষ্য অনুযায়ী ২/৩ বছরের ব্যবধানে এত বেশি মানুষ ইসলাম কবুল করে, যা ১৫/২০ বছরেও হয়নি। সকলকে এদেশে চারিত্রিক ও সামাজিক এমন বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র ধারায় প্রতিভাত করতে হবে যাতে এদেশের অমুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলাম সম্বন্ধে জানার ব্যাপক আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা তৈরী হয়। ফলে একদেশ, একভাষা ও একই নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর লোক হয়েও দু'টি পৃথক ধারার ব্যাপক ব্যবধান তৈরী করবে।

আমি এ সম্বন্ধে হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রহ.) এর মুজাহিদ কাফেলার ওই সব সৈনিকদের উদাহরণ উপস্থাপন করি, যারা পেশোয়ার জয় করেন। ওখানকার জনগণ কতিপয় ভারতীয় যোদ্ধাদের জিজ্ঞেস করেন যে, "তোমাদের চোখে কোন রোগ আছে দূরের বস্তু দেখতে পাও না? প্রশ্নের কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, "একটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করেছি যে, বছরের পর বছর তোমরা তোমাদের পরিবার থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও কোন বেগানা মহিলার দিকে চোখ তুলে তাকাও না। কিন্তু কেন? এক দু'জন হলে কথা ছিল, পুরো বাহিনীর একই অবস্থা এর রহস্য কী?" মুক্তি সেনারা জবাবে বলেন, "এটা ইসলামের শিক্ষা ও আমাদের নেতার প্রশিক্ষণের ফলশ্রুতি। আমরা কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের উপর আমল করি–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ

"হে আল্লাহর রাসূল! ঈমানদারদেরকে আপনি বলুন, তারা যেন তাদের চোখ নিচে করে রাখে।"[১]

আছর পর্যন্ত মেহমানখানায় অবস্থান করি। আছর নামাযের পর শহরের বাইরে অবস্থিত যায়নুল আবেদীন হলে আয়োজিত সম্মেলনে বক্তব্য রাখি এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেই। মাগরিবের পূর্বক্ষণে কর্মসূচি সমাপ্ত হয়।

---

১. সুরা নূর : ৩০

এখান থেকে কুয়ালাত্রিঙ্গানু তাবলীগি মারকাযে রওনা হই। এখানে সুপরিসর একটি মসজিদ রয়েছে। মালশিয়ার জনৈক দানবীর তাবলীগী ব্যক্তিত্ব এ মসজিদ নির্মাণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। এখানে তাবলীগের বড় বড় ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদকে কেন্দ্র করে একটি হিফযখানা গড়ে উঠে। আমি ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখি। ইলম দ্বীন অর্জন, হিফয কুরআনের সৌভাগ্য, দাওয়াতে দ্বীনের গুরুত্বের উপর আলোকপাত করা হয়। দু'আর মাধ্যমে মজলিশের সমাপ্তি ঘটে। এশার সময় বিমান যোগে কুয়ালালামপুর প্রত্যাবর্তন করি।

মুসলিম বিশ্বে অস্থিরতা জনগণ ও সরকারের মাঝে সংঘাতের কারণ

দ্বিতীয় দিন শনিবার ৪ এপ্রিল দিনের বেলায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়া অনুষদ পরিদর্শন, ছাত্র-শিক্ষকদের সাথে সাক্ষাৎ, বক্তব্য প্রদান এবং বিকেলে আমাদের আবাসস্থলের সন্নিকটে প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয়ার কর্মসূচী ছিল।

বেলা ১১ টার দিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছি। এক বিশাল ক্যাম্পাস। অবস্থানগত দিক দিয়ে শহরের বাইরের ক্যাম্পাসটি অত্যন্ত মনোরম। শরীয়াহ অনুষদের কর্মকর্তাবৃন্দ অভ্যর্থনায় জন্য হাজির ছিলেন। সম্মেলন ছিল বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তনে। বক্তৃতার বিষয় ছিল শিক্ষা। উপস্থিত জনগণের মধ্যে শিক্ষকমণ্ডলি এবং গবেষণামূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। বক্তৃতায় আমি নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর আলোকপাত করি। মুসলিম দেশে ইসলামপন্থী ও ইসলামবিদ্বেষীদের মধ্যে সংঘাত, যার ফলশ্রুতিতে দ্বন্দ্ব-সহিংসতা (এরূপ দৃষ্টান্ত নিখাদ অমুসলিমদের দেশে কম দেখা যায়) এ জন্য দেখা দেয় যে, আমাদের মুসলিম দেশসমূহের শিক্ষাব্যবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর আকীদা, বিশ্বাস, উত্তরাধিকার, ঐতিহ্য ও চিন্তা-চেতনার সাথে খাপ খায় না বরং ক্ষেত্র বিশেষে বিরোধপূর্ণ হয়ে উঠে। মুসলিম জনগোষ্ঠী এক জগতের এবং ক্ষমতাশীল দল, শিক্ষা, সমাজ ও আইন প্রণয়নকারী লোকজন আরেক জগতের বাসিন্দা হয়ে দাঁড়ায়। এসব কারণে এ দু'শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ধারাবাহিক অবিশ্বাস ও অনাস্থার সম্পর্ক বিরাজমান। ক্ষমতাসীন লোকেরা ভীত ও ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে সাধারণ জনগণের দ্বীনি জযবাকে বিলুপ্ত করে দেয়ার অথবা শিথিল করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। জনসাধারণ অথবা

ইসলামপছন্দ শক্তি সুযোগ পেলে দ্বীনকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার আন্দোলন ব্রতী হয়। বক্তৃতা শেষে ছাত্র ও শিক্ষকগণ বিভিন্ন প্রশ্ন করেন এবং তার জবাব প্রদান করা হয়। এশার পর প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে ভাষণ প্রদান করি।

পরদিন ৫ এপ্রিল ১৯৮৭ শহরের গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহত্তম হলে বক্তব্যের অনুষ্ঠান ছিল। মালয়েশিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রী টুংকু আবদুর রহমানের নামে হলটির নামকরণ করা হয়। দিনটি রোববার হওয়ার কারণে শহরের শিক্ষিত ও পণ্ডিতবর্গের উপস্থিতিতে সুপরিসর হলটি কানায় কানায় ভরে উঠে। সকাল ১১ টায় বক্তৃতায় অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং ১ ঘন্টা স্থায়ী হয়। Abim এর সহ–সভাপতি শায়খ আবদুল গনি শামসুদ্দিন অনুবাদকের দায়িত্ব পালন করেন। অনুবাদক আরবী ও মালয়ী ভাষায় পারঙ্গম একজন পন্ডিত ব্যক্তি।

কাদাহ্ সফর ও ভাষণসমূহ

পরদিন ৬ এপ্রিল রোববারের কর্মসূচী ছিল কাদাহ যাত্রা। কাদাহ মালয়েশিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত। এখানকার উৎপাদিত চাল পুরো দেশের চাহিদা পূরণ করে। অধিবাসীদের অধিকাংশ মুসলমান। আধুনিকতায় মন্দ বিষয়ের ছোঁয়াচ এতঞ্চলের মুসলমানদের কম লেগেছে। ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও দ্বীনের সাথে সাধারণ জনগণের সম্পৃক্ততা বেশ লক্ষণীয়। আরবী পোষাক ও মাথায় পাগড়ি সর্বত্র নজরে পড়ে। জনগণের মধ্যে ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের অনুভূতি বেশ জোড়ালো। ফাতানী নামে পরিচিত থাইল্যান্ডের পশ্চিম সীমান্ত এখান থেকে বেশি দূরে নয়। সেখানকার অধিকাংশ জনগণ মুসলমান, যারা সরকারের বৈষম্য ও নিবর্তনের শিকার।

৫ এপ্রিল বাদ মাগরিব কুয়ালালামপুর থেকে কাদাহ-এর ফ্লাইট ধরি, যার দূরত্ব ২৫০ মাইল। বিমান বন্দরে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য একটি বড় গ্রুপ উপস্থিত ছিল, যারা ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের উষ্ণ অনুভূতি দিয়ে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। বিশ্রামস্থল শহর থেকে দূরে একটি গ্রামে। বহু লোক আমাদের সাথে মিলিত হন এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এই গ্রামে 'ইসলামী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট' অবস্থিত, যেখানে রয়েছে নাদওয়া থেকে ডিগ্রী প্রাপ্ত অধিকাংশ শিক্ষক । এই এলাকায় পৌঁছে জানা গেল যে, বহুদূর থেকে ইসলামপছন্দ জনগণ এখানে জমায়েত হন। এমনকি বিশটি গাড়ীতে করে জনসাধারণ আমাদের সাক্ষাৎ ও বক্তব্য শোনার আগ্রহ নিয়ে সভাস্থলে আসেন।

মুহূর্তের মধ্যে পুরো এলাকা জনসভায় রূপান্তরিত হয়। ইনস্টিটিউটের কার্যালয় প্রাঙ্গণ ছিল সমাবেশ হল। সারাদিনের ব্যস্ততা ও ভ্রমণের ক্লান্তি ছিল আমাদের দেহ-মনে। কিন্তু এ বিশাল সমাবেশ হলে এবং আয়োজকদের আন্তরিকতা ও ভালোবাসা উচ্ছ্বাস দেখে আমাদের মধ্যে নবতর উদ্দীপনা ও সজীবতা সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় দিন ৬ এপ্রিল ১০ টায় ইসলামী গবেষণা ইনস্টিটিউটের ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করি। ইনস্টিটিউটের অধীনে উচ্চতর দাওয়াহ ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করি। সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় কৃষি প্রশাসন সংস্থা 'মাদা'য় বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। এখানে সরকারি বেসরকারি ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। উপযুক্ত সময় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী বক্তব্য পেশ করা হয়। বিশেষত, মুসলমানদের দাওয়াতী, নৈতিক ও জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডের তাৎপর্যের উপর সবিশেষ জোর দেয়া হয়।

'কাদাহ'-তে রাত যাপনের পর মঙ্গলবার ৭ এপ্রিল বিমানযোগে কুয়ালালামপুর প্রত্যাবর্তন করি। এই দিন যোহরের পূর্বে মালয়েশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মসূচি ছিল। এজন্য বিমান বন্দর থেকে সরাসরি ক্যাম্পাসে পৌঁছি। একই দিন বাদ আসর দু'টি কর্মসূচি ছিল। একটি শহরের তাবলীগি মারকাযে এবং অপরটি 'আবিম'-এ।

দ্বীনের তরুণ দাঈ ও ঝাণ্ডাবাহীদের মার্জিত আচরণ এবং ঈমানী জীবনের স্তরসমূহ

যেহেতু এ সফর মূলত 'আবিম' এর আমন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় সম্পন্ন হয়, সেহেতু দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও আধুনিক চ্যালেঞ্জের উপস্থিতিতে দ্বীনের কার্যকর দাওয়াত, আমলি যিন্দেগী গঠন ও সমাজে নতুন প্রাণের সঞ্চার করার জন্য সংগঠনের কর্মীদের কাছে অধিকতর প্রত্যাশা করা যায়। এ সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় শহরের বাইরে একটি উপশহরে অবস্থিত। স্থানটি খোলামেলা ও সুপরিসর। সংগঠনের কর্মী ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন এলাকা থেকে এখানে জড়ো হয়। এ মুহূর্তে এখানে একটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প চলছে।

সংগঠনের প্রধান অধ্যাপক সিদ্দিক ফাযিল পরিচিতি ও উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন, যেখানে তিনি মালয়েশিয়ায় অপরাপর সমাবেশের মত অতিথির চিন্তাধারা ও তার সাহিত্যকর্মের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করেন। আমি সূরা কাহাফ এর নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করি–

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ﴿١٤﴾

"তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমি তাদের মন দৃঢ় করেছিলাম, যখন তাঁরা উঠে দাঁড়িয়েছিল। অতঃপর তারা বলল, আমাদের পালনকর্তা আসমান ও যমিনের পালকর্তাই, আমরা কখনো তার পরিবর্তে অন্যকোন উপাস্যকে ডাকবো না। যদি করি তা হবে অত্যন্ত গর্হিত কাজ।"[১]

উপর্যুক্ত আয়াতে ওইসব তরুণদের ভয়ংকর পদক্ষেপের উল্লেখ করা হয়, যারা সমসাময়িক মুশরিকী ধর্ম ও প্রতাপশালী রাজত্বের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। তাদের পরিবারের মধ্যে অনেকে ছিল রাজ-কর্মচারী এবং বহু পরিবারের অভিভাবক ছিল সরকার। এই আয়াতে তাদের সত্যগ্রহণ, বিশ্বাস ও হিদায়াতের উন্নতি ও দৃঢ়তার পর্যায়সমূহ আশ্চর্যজনকভাবে এক বিশেষ ধারাবাহিকতায় বর্ণনা করা হয়। এটাই কিয়ামত পর্যন্ত সঠিক নিয়ম এবং ঈমান ও দাওয়াতের মজবুত ও ধারাবাহিক পর্যায়। আয়াতে বলা হয় যে, প্রথমে তাঁরা সাহসিকতার সাথে ঈমানী দাওয়াত প্রদান করেন। 'আমানু বিরাব্বিহিম' প্রথমে আল্লাহ তায়ালা হিদায়তের মাত্রা বৃদ্ধি করেন। অতঃপর পরীক্ষার পর্যায় যখন সামনে আসে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁদের অন্তরে শক্তি এবং প্রতিটি পদক্ষেপে দৃঢ়তা ও স্থায়ীত্ব দান করেন 'ওয়া রাবাতনা আলা কুলুবিহিম।'

আমি এটাও বলেছি যে, এক্ষেত্রে দেখার বিষয় যে, আল্লাহ তায়ালা কম সংখ্যক বোঝাবার জন্য 'জামা কিল্লাত' এর শব্দ 'ফিতয়াতুন' শব্দ ব্যবহার করেন।[২]

---

১. সূরা কাহাফ : ১৩-১৪

২. এই নিয়মানুসারে 'জামা কিল্লাত'-এর আরো শব্দ আরবি ভাষায় এসেছে; যেমন 'ফিতয়া' কতিপয় যুবক, 'গিলমা কতিপয় বালক, 'সিবয়া' কতিপয় শিশু

এর কারণ জানবাজি রেখে, উন্নতি ও জৌলুসপূর্ণ অবস্থা থেকে চোখ বন্ধ করে রাখার মত যুবক যুগে যুগে কম পাওয়া যায়। এরপর আরেকটি ব্যাপারে আমি শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করি তাহলো, আল্লাহ তায়ালা তাঁর পবিত্র নামের মধ্যে 'রব' শব্দটি বাছাই করেন–

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ

"তারা কতিপয় যুবক যারা তাদের পালন কর্তার উপরে ঈমান এনেছিল।"

এবং

إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

"যখন তারা উঠে দাঁড়িয়েছিলো। অতঃপর তারা বলল; আসমান যমিনের পালনকর্তাই আমাদের পালনকর্তা।"

এটা এজন্য যে, তাদের ভবিষ্যত, অর্থনৈতিক প্রয়োজনের পূর্ণতা, জীবনধারণের উপকরণ অর্জন, ক্ষমতাসীন সরকারের সাথে ওফাদারী, পদ-পদবি ও চাকুরী প্রাপ্তির সাথে বিজড়িত বলে মনে করা হত। এগুলো ছাড়া আরামপ্রদ ও সম্মানজনক জীবন অর্জনের চিন্তাও করা যায় না। কিন্তু যুবকরা এ কথা বলে, "আমাদের লালন ও পালনকর্তা কোন সরকার বা মাখলুক নয় বরং আসমান-যমিনের পালনকর্তাই আমাদের সব।" এই ফাসিক, জাহিলী আকিদা ও চিন্তাধারায় সজোরে আঘাত হানে। তারা ঘোষণা করে যে, তাদের রিযিক, ভাগ্য এবং ভাল-মন্দ আসমান-যমিনের সৃষ্টিকর্তার হাতে। তাঁরা এ প্রসঙ্গে হযরত সালিহ (আ.)-এর ঘটনার উদাহরণ উল্লেখ করে। হযরত সালিহ (আ.)-এর সাথে তাঁর পরিবারের সদস্যগণ ও অনুরূপ আচরণ করে। পরিবারের জ্যেষ্ঠ সদস্য ও মুরব্বিগণ অত্যন্ত হতাশ ও অনুতাপের সূরে বলেন-

قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا

'হে সালিহ! তোমার কাছে এর চাইতেও বড় প্রত্যাশা ছিল আমাদের (তুমি আশা-ভরসা নিঃশেষ করে দিলে)।'[১]

আমি বলেছি যে, পবিত্র কুরআনের প্রতিটি আয়াত সুনির্দিষ্টভাবে এক মু'জিযা। কিন্তু এ আয়াতে ঈমানের বিভিন্ন পর্যায়, দাওয়াত, দৃঢ়তা ও হকের

১. সূরা হূদ : ৬৩

ঘোষণাকে এমন ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে, যা সুনির্দিষ্টভাবে কুরআনের অলৌকিক ঘটনা ও খোদায়ী ধারাবাহিকতা।

অতঃপর আমি শ্রোতাদের মধ্যে যারা তরুণ এবং যারা দাওয়াতের ময়দানে সক্রিয়, তাদের গুণাবলি ও দাওয়াতের ময়দানের বিভিন্ন স্তর ও মার্জিত আচরণের উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করি। বাকি মুসলমানদের পুরো জীবন এবং সমাজকে ইসলামী শিক্ষা ও জীবনধারার ছাঁচে গড়ে তোলার এবং এর আলোকে আলোকিত করার উপর জোর দেই। ইসলামে 'রাষ্ট্র' ও 'গির্জা', 'সামষ্টিক' ও 'ব্যক্তি' জীবন এবং 'ইবাদত' ও 'পারিবারিক আইন' (Personal Law) এভাবে বিভাজন নেই। এর মধ্যে কয়েকটি ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শ অনুসারে এবং কয়েকটি সম্পূর্ণ ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত অথবা মানুষের তৈরি আইনের আওতায় চলবে, এটা হতে পারে না। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বা জীবনকাঠামো।

সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত আমির শায়খ শামসুদ্দীন, যিনি আরবি ও মালয়েশীয় ভাষায় বেশ পারঙ্গম, আমার বক্তৃতার অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সফলভাবে সম্মেলনের সমাপ্তি টানেন।

কুয়ালালামপুরের শেষ দিন

৮ এপ্রিল বুধবার ছিল মালয়েশিয়া সফরের শেষ দিন। ওই দিনের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (Iium) গমন এবং বিকেলে আল হিযব আল ইসলামীয়ার কেন্দ্রে একটি ইসলামী সম্মেলনে বক্তব্য প্রদান। বেলা ১২ টার দিকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করি। বড্ড মনোরম খোলামেলা পরিবেশে আধুনিক শৈলীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থাপনা নির্মিত হয়। কেবল মালয়েশিয়া নয় বরং সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীগণ এতে অধ্যয়ন করে আসছে। বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্র এই বিশ্ববিদ্যালয়কে সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে।

প্রখ্যাত আরব পণ্ডিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আবদুর রউফ মিশরী আমাদেরকে ক্যাম্পাসে সাদরে অভ্যর্থনা জানান। তাঁর সাথে একবার আমার দেখা হয় ওয়াশিংটনে, যখন তিনি ওয়াশিংটন ইসলামিক সেন্টার ও মসজিদের পরিচালক ছিলেন। তিনি আমাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্যনির্মিত একটি প্রশস্ত মিলনায়তনে নিয়ে যান। পরীক্ষার কারণে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের স্বল্পতা ছিল। তিনি আমাকে শ্রোতাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন এবং আমার বক্তৃতার অনুবাদ করেন। বক্তৃতা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে দুপুরের আহারের ব্যবস্থা করা হয়।

বাদ আসর 'আল-হিযবুল ইসলামিয়াত'-এর কেন্দ্রে রওয়ানা হই, যা শহর থেকে ৩০/৪০ কি.মি. দূরত্বে একটি উপশহরে অবস্থিত। বক্তৃতায় আমি দ্বীনি ও দাওয়াতী ময়দানের কর্মীদের মুহব্বতের পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করি। মাগরিবের পর জনসভায় বিপুল শ্রোতার সমাগম হয়। দূর-দূরান্ত থেকে সংগঠনের কর্মীও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ এতে অংশ নেন।

পরদিন ৯ এপ্রিল, ১৯৮৭ খ্রি. বৃহস্পতিবার মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে মাদ্রাজের চেন্নাই) উদ্দেশ্যে রওনা হই। আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব ইমাদ উদ্দিন খতিব সাহেবের বাসভবনে ক'ঘণ্টা বিরতির পর এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইটে দিল্লী পৌঁছি।[১]

১. এ অধ্যায়ে স্নেহের মাওলানা মুহাম্মদ রাবে নদভীর লেখা থেকে অনেক তথ্য সংগৃহীত হয়। বহু ক্ষেত্রে তাঁর শব্দ ও ঘটনা অবলম্বন করে সফরনামা তৈরি করেছি।

দশম অধ্যায়

আয়াতুল্লাহ্ খোমেনির বিরোধিতা : শিয়া ইসনা আশারিয়া[১] সম্প্রদায়ের কতিপয় স্বীকৃত আকিদা ও দ্বিমুখী দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনামূলক লেখা

ইরানি বিপ্লব ও তার যাদুকরি প্রভাব

জনাব আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনি যখন ইরানের শাহ পাহলভী শাসনের মসনদ উল্টে দিয়ে (নিজের ভাষ্যমতে) 'ইসলামি শাসন' কায়েম করলেন এবং সূচনা করলেন এক নতুন যুগের, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার কাছে প্রত্যাশিত (এমন প্রত্যাশার অনুকূলে কিছু লক্ষণ আর ইঙ্গিতও দৃশ্যমান ছিল) ছিল যে, তিনি নিজের দর্শন ও মতাদর্শকে সর্বসাধারণের কাছে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য হিসেবে ছড়িয়ে দেবার স্বার্থে পুরনো শিয়া-সুন্নি বিরোধের পাতাগুলো খুলবেন না। নিজেদের কিতাব থেকে এ পাতাগুলো সরানো না গেলেও অন্তত তা খোলা থেকে বিরত থাকবেন, যদি তিনি রাজনৈতিক বা পারিপার্শ্বিক কারণে ফেরকায়ে ইমামিয়া (ইসনা আশারিয়া)-এর আকিদাগত বিষয়গুলোর সাথে তার সম্পৃক্ততার বিষয় নাকচ করে দিতে নাইবা পারেন, অন্তত সেসব আকিদা ঘটা করে প্রকাশ-প্রচার করবেন না! তার কাছ থেকে এমন প্রত্যাশা করা যেতেই পারে যে, নৈতিক দৃঢ়তা আর মুসলমানদের বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থে চিন্তা ও গবেষণার ভিত্তিতে এভাবে ঘোষণা করা হবে– "এ-বিশ্বাসগুলো ইসলামের ভিত্তিমূলে আঘাত হানে, এর দ্বারা দুনিয়াজুড়ে ইসলামের বদনাম রটে আর গ্রহণযোগ্যতা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন করে। পাশাপাশি অমুসলিমদের কাছে ইসলামের আহ্বান পৌঁছানোর পথে এটি এক বড় রকমের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। কারণ, এতে একথাই সাব্যস্ত হয় যে, যেখানে বিদায় হজের সময় লক্ষাধিক সাহাবি উপস্থিত ছিলেন, সেখানে রাসূলের ইন্তেকালের পর মাত্র চারজন সাহাবি ব্যতীত সকলেই ইসলাম ত্যাগ

---

১. বার ইমামের অনুসারী শিয়াদের অন্যতম উপদল। এসব ইমামকে তারা নবীর সমমর্যাদাসম্পন্ন বলে বিশ্বাস পোষণ করে থাকে।

করে মুরতাদ হয়ে গেছেন (নাউযুবিল্লাহ)! সাব্যস্ত হয় যে, কুরআন মাজীদ আগাগোড়া বিকৃত হয়ে গেছে, আহলে বায়তের ইমামগণ (পরহেযগারীর জায়গা থেকে তাদের ধর্মীয় ও নৈতিক দৃঢ়তার দাবি হলো সত্যকে প্রকাশ) সত্য গোপনকারী, আসল কুরআনকে আড়াল করার দায়ে তারা অভিযুক্ত, তারা যেকোনো ঝুঁকি থেকে নিজেরা এবং আপন অনুসারীদের দূরে রেখেছিলেন– ইত্যাদি।[১]

এসব আকিদা ও দাবি ইসলামের প্রথম যুগ অর্থাৎ সাহাবাদের সময়কালেই তৈরি হওয়া এক ইসলামবিরোধী জঘন্য এক দূরভিসন্ধির বিষফল। আর শতাব্দীকালের ইরানি রাজত্বের পতনোন্মাদনায় এ চিন্তাধারা বাস্তবতার অবয়ব ধারণ করে যার প্রকাশ ঘটেছিল– এখন এর প্রয়োজন কিংবা অবকাশ কোনোটাই নেই। আমরা ইসলামের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাই। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর পুনর্গঠন ও ইসলামি সমাজ থেকে যাবতীয় নৈরাজ্যকে ঝেটিয়ে বিদায় করতে হলে আমাদেরকে তিক্ত অতীত ভুলে যেতে হবে; শুরু করতে হবে নতুন সফর– যে সফরে কেবল থাকবে ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল অতীত আর সায়্যিদুল মুরসালিন ও সর্বশেষ নবীর (যার ব্যাপারে খোদায়ী সাহায্য ও নজিরবিহীন সাফল্যের সুস্পষ্ট ঘোষণা বিদ্যমান) আহ্বান, সাহচর্যের শক্তি, আদর্শের দ্যুতি, এবং সোনার মানুষ গড়ার সেসব স্বর্ণোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সামনে থাকবে, যা (ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যাশ্রয়ী ইতিহাসবিদগণের সাক্ষ্যমতে) দাওয়াত ও সমাজ সংস্কারের ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই–[২] যেমনটি পবিত্র কুরআনের প্রতিটি বর্ণ বিন্দু-বিসর্গসহ ধারাবাহিক সূত্রপরম্পরায় সর্বোচ্চ সুরক্ষিতরূপে চলে আসছে। এ ছাড়াও (মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্যের কথাটি বাদ দিলেও) অমুসলিম শিক্ষিত সমাজ, ইতিহাসবিদ, সমালোচকদের প্রকাশ্য সাক্ষ্য তো আছেই।[৩] কিন্তু সকল প্রত্যাশার গুড়ে বালি ছিটিয়ে তিনি

---

১. উসুলুল কাফী, ফাসলুল খেতাব, স্বয়ং আল্লামা খোমেনির রচনাবলি 'কাশফুল আসরার' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

২. দেখুন, মাগরিবি ফুযালা কায়েতানি, ড. লিবান, এডওয়ার্ড গিবন, ফিলিপ হিট্টি, স্যার উইলিয়াম ম্যুর ও জাস্টিস সাইয়িদ আমির আলীর বক্তব্যসমূহ। তাদের গ্রন্থ থেকে নেয়া নির্বাচিত অংশ– 'দ্বীন ইসলাম আওর আওয়ালিন মুসলমান কি দু মুতাযাদ তাসভিরীঁ' পৃ. ৩৪-৩৬ (বর্তমান লেখক)

৩. দেখুন, স্যার উইলিয়াম ম্যুর ওয়াহাইরি (Wherry), লেনপুল বসওয়ার্থ স্মিথ, প্রফেসর আর্নল্ড ও প্রফেসর ফিলিপ হিট্টির বিশ্লেষণ কুরআন মাজীদ বিকৃতি থেকে সুরক্ষিত হওয়া প্রসঙ্গে : 'দো মুতাযাদ তাসভিরীঁ' পৃ. ৭৮-৭৯

নিজের সেসব লেখায়, যা গ্রন্থ-পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়েছে – অত্যন্ত সোজাসাপ্টা ও বেশ জোরের সঙ্গেই ওই আকিদা-বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটিয়েছেন; যেমন তার 'আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়া ওয়া বিলায়াতুল ফকীহ'-গ্রন্থে ইমামত ও আইম্মা সম্পর্কে সেই চিন্তাধারাই তুলে ধরেছেন যাতে তাদেরকে প্রায় আল্লাহর সমমর্যাদার অধিকারী বানিয়ে দেয়া হয়েছে। ওসব আকিদা-বিশ্বাসে তাদেরকে নবী ও ফেরেশতাদের চাইতেও শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত করা হয়, যেন সৃষ্টিজগতের কুদরতি সব ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের অধীনে ও কর্তৃত্বে পরিচালিত হয়।[১]

এভাবে তাঁর রচিত ফার্সি গ্রন্থ 'কাশফুল আসরার'-এ রাসূলের সাহাবি বিশেষত খোলাফায়ে রাশেদিনের তিনজন সম্পর্কে এমন কোনো সমালোচনা ও গালমন্দ বাকি নেই, যা করা হয়নি, যা কোনো বিপথগামী, বিভ্রান্তকারী, দুরাচার, পাপিষ্ট ও কায়েমী স্বার্থবাদী ও জঘন্য কুচক্রী মহল সম্পর্কে প্রযোজ্য হতে পারে।[২]

একটি অপ্রত্যাশিত প্রতিবাদ

এমন প্রেক্ষাপটে এটিই পুরো প্রত্যাশিত ছিল যে, আকিদাগত বৈপরীত্যের ও তাওহিদের মৌলিক বিশ্বাসের প্রশ্নে এমন গোঁজামিল, নবুওয়তের মধ্যে উদ্ভট অংশীদারি (যা ইমামতের সংজ্ঞা ও শিয়া ইমামদের বর্ণিত বৈশিষ্ট্যে অনিবার্য উপসংহার), সাহাবায়ে কেরামের ব্যক্তিত্ব (যারা মুসলমানদের কাছে রাসূল সা.-এর পর সর্বোচ্চ মর্যাদাবান ও ভালোবাসার পাত্র)-কে আক্রণাত্মক ভাষায় গালমন্দের পর যারা আকিদাগত বিবেচনায় সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত, তারা একদিকে খোমেনির দাওয়াত প্রত্যাখান করার কথা, অন্যদিকে তাকে কোনোভাবেই ইসলামি বিপ্লবের পুরোধা, স্থপতি ও আদর্শ দিকনির্দেশক ও নেতা মানার কথা নয়।

কিন্তু যা দেখে খুবই মর্মাহত ও বিস্মিত হয়েছি তা হলো– মুসলমানদের একটি শ্রেণী তার প্রতি প্রগাঢ় আস্থা, উচ্ছ্বসিত ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাতে শুরু করলেন, যা রীতিমতো সীমা ছাড়ালো, যারা খোমেনির আকিদা চিন্তাধারা ও ইরানি বিপ্লবের ন্যূনতম সমালোচনাও সহ্য করতে নারাজ। তাদের কাছে প্রশংসা বা নিন্দার মানদণ্ড কুরআন সুন্নাহ, পূর্বসুরীদের আদর্শ, আকিদা কিংবা

১. আল হুকুমাতুল ইসলামিয়া পৃ. ৫৩
২. দেখুন, কাশফুল আসরার (ফার্সি), পৃ. ১১৩-১১৪

অনুসৃত পথ নয়; বরং স্রেফ ইসলামের নামে সরকার প্রতিষ্ঠার স্লোগান, শক্তি অর্জন, যেকোনোভাবে পাশ্চত্যের কোনো শক্তিকে ধমক দেয়া (প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে) তাদের জন্য একটি সংকট তৈরি করতে পারাই জনপ্রিয় আদর্শ নেতৃত্বরূপে চিহ্নিত হবার জন্য যথেষ্ট। আয়াতুল্লাহ খোমেনির এ সফলতার জন্যে পেছনে ছিলো ইরানি তরুণদের বড় ধরনের ত্যাগী মানসিকতা, আরব রাষ্ট্রগুলোর অন্তর্নিহিত ধর্মীয় ও নৈতিক দুর্বলতা, বিদ্যমান নেতিবাচক পরিবেশ-পরিস্থিতি[১] এবং এরূপ অবস্থার প্রতি উপমহাদেশের যুবসমাজের ব্যাপক অসন্তোষ ছিল ক্রিয়াশীল। তারা স্বভাবতই এমন একটি বিপ্লবকে– যা ইসলামের নামযুক্ত থাকবে– অভিনন্দিত এবং একে উৎসাহিত করার ব্যাপারে মোহাবিষ্ট ছিল। এক সময় ভারতীয় উপমহাদেশে খোমেনি সেরূপ জনপ্রিয়তা পাচ্ছেন যেমনটি আরব দেশসমূহে জামাল আবদুন নাসের পেয়েছিল ছিল ক্ষেত্রবিশেষে তার চাইতেও বেশি।

মোহ ও আকর্ষণ সৃষ্টির কারণ

ইতিহাসের সাক্ষ্য ও মানুষের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফল হলো, যখন বিকৃত বিশ্বাস, ভ্রান্তি ও হঠকারিতার সাথে দুর্দান্ত সাহসিকতা, প্রবল আত্মপ্রত্যয়, দুর্দমনীয় শক্তি ও স্পর্ধিত অপরাধের সংমিশ্রণ ঘটে, তখন সে আন্দোলন ও বিপ্লবের আহ্বানে এক চমৎকার মোহ ও যাদুময়তা তৈরি হয় যে, পরিপক্ব বুদ্ধিমত্তার অধিকারী, বিচক্ষণ, মেধাবী, ধীমান ও বড় মাপের জ্ঞানী ব্যক্তির পর্যন্ত এ আকর্ষণ থেকে নিজেকে দূরে রাখা এবং এর প্রশংসা থেকে বিরত থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। প্রথম শতাব্দীর খারেজি আন্দোলন, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে বাতেনিদের আন্দোলন, হাসান ইবন্ সাবা, ফেদাইনদের তৎপরতা, ভারত উপমহাদেশের কতিপয় আধাসামরিক আন্দোলন ও সংগঠনসমূহ নিয়ে তরুণদের (অদূর অতীতে) বিস্ময়কর আত্মোৎসর্গী মনোভাব ও তীব্র আকর্ষণবোধের ঘটনা এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সময়ের এমন বাঁকগুলো সত্য ও হেদায়তকে গ্রহণ-বর্জনের মানদণ্ড বলে বিশ্বাসী, বিশুদ্ধ আকিদার ধারক ও কুরআনি নির্দেশনার প্রশ্নে ঋজু ও নিরাপস মনোভাব পোষণকারীদের জন্য

---

১. এসব শাসকদের সঙ্গে সাক্ষাতে বেশ খোলামেলাভাবে বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরে তাদের সতর্ক করা হয়েছে, যা আমার বিভিন্ন রচনা ও বক্তৃতায় সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 'হেজাযে মুকাদ্দাস ওয়া জাযিরাতুল আরব : উম্মিদোঁ আরও আন্দিশোঁ কি দরমিয়ান', ও 'আলমে আরবি কা আলামিয়াহ' দ্রষ্টব্য।

একটি পরীক্ষার জায়গা। তারা এসব মোহমুগ্ধ তরুণদের সামনে সত্যের দাওয়াত নিয়ে হাজির হয় এবং জালিম শাসকের সামনে উত্তম জিহাদ 'সত্য উচ্চারণ'-এর সওয়াব ও মর্যাদা অর্জনে দৃঢ় প্রত্যয়ী।

মাওলানা মানযুর নুমানীর কিতাব 'ইরানি বিপ্লব, ইমাম খোমেনি ও শিয়া মতবাদ'

আশির দশকে তথা ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলিম বিশ্বের অসহনীয় জড়তা, নিষ্ক্রিয়তা, বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইসলামি আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ, সমকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তি (রুশ-মার্কিন)-এর হাতে নিজেদের ভাগ্যকে জুড়ে দেয়া মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোর ক্রিয়াকলাপে ত্যক্ত-বিরক্ত প্রতিশ্রুতিশীল ও স্বপ্নচারী তরুণ প্রজন্ম চারদিকে হতাশার কালো কুয়াশার মাঝে আল্লামা খোমেনির বিপ্লবে যেন আধাঁরে এক চিলতে 'আলোর ঝলকানি' দেখতে পায়। তাকে অনেকেই এমন পরিস্থিতিতে ইমাম মাহদীর আসনটিও পেশ করতে তৈরি হয়ে গেলেন।

অনেক ইসলামি চিন্তাধারার লেখক, গবেষক ও দাঈ আদর্শ-মতাদর্শ, সুপথ-বিপথ, হেদায়ত-বিভ্রান্তির প্রভেদ ভুলে এই বাস্তবতাকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলেন যে, ইসলামের সমগ্র ইতিহাসে খোমেনির এই 'বিপ্লবের বার্তা' ও আন্দোলন কী প্রভাব পরিলক্ষিত হবে। এভাবে তারা তাকে সমর্থন করতে লাগলেন। এ পরিস্থিতি লক্ষ্য করে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের বিদগ্ধ গবেষক বন্ধুবর মাওলানা মনযূর নুমানী, দীর্ঘকালীন সময়ের ইমামে আহলে সুন্নাত, আবদুশ শাকুর ফারুকী, যিনি দারুল মুবাল্লিগীনের শিক্ষক, বার্ধক্যজনিত অসুস্থতাকে উপেক্ষা করে 'ইরানি ইনকিলাব, ইমাম খোমেনি ও শিইয়্যত' নামে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন যাতে সাহাবায়ে কেরাম, খোলাফায়ে রাশেদীন, ইমামত ও আয়িম্মাহ-সংক্রান্ত আকিদা, কুরআন বিকৃতির দাবি প্রসঙ্গে ইসনা আশরিয়া সম্প্রদায়ের প্রামান্য ও সর্বসম্মত গ্রন্থগুলোর উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে। শেষে প্রমাণ করা হয়েছে যে, আয়াতুল্লাহ খোমেনিও এরূপ আকিদার প্রবক্তা ও আহ্বায়ক। এ দাবির সমর্থনে তার গ্রন্থাবলি (যা তার রচনা হওয়ার বিষয়ে তার সমর্থক এবং ওসব গ্রন্থের অনুবাদগণ কর্তৃক স্বীকৃত) থেকে বহু উদ্ধৃতি তুলে আনা হয়েছে।[১]

---

১. ভারত-পাকিস্তানে গ্রন্থটির একাধিক উর্দূ সংস্করণ বেরিয়েছে। বিশেষত, পাকিস্তানে গ্রন্থটির উৎসবমুখর প্রচার অনেকটা বুদ্ধিবৃত্তিক দাওয়াতি আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। আরবিসহ বিভিন্ন ভাষায় এ গ্রন্থের অনুবাদও প্রকাশিত হয়।

মাওলানা মনযূর নুমানী পুরনো বন্ধুত্ব ও সাধারণ রেওয়াজ অনুসারে আমাকে গ্রন্থটির ভূমিকা লেখার ফরমায়েশ পাঠিয়েছেন। ১৯৮৪ সালের অক্টোবরের শেষ ও নভেম্বরের শুরুর দিকে মুম্বাই থাকাকালে একাজটি সম্পন্ন করি এবং গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত পরিচিত তুলে ধরি।

দু'টি বিপ্রতীপ চিত্র

কিন্তু গ্রন্থটি অধ্যয়নকালে আমার তীব্র অনুভব হয়েছে যে, তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও তার্কিক ধাঁচের পথ এড়িয়ে এ বিষয়ে এমন একটি গ্রন্থ রচনা করা দরকার যা নিরপেক্ষ, সুস্থবোধসম্পন্ন, মুক্তবুদ্ধির সমঝদার পাঠকের জন্য জন্য পথনির্দেশিকা ও নির্মোহ উপসংহারে পৌঁছুতে সহায়তা করে, যাতে সুস্থবোধ, মানুষের বিবেক, বিভিন্ন ধর্ম ও মতাদর্শের ইতিহাস অধ্যয়ন, জাতি-গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের চরিত্র বিশ্লেষণ, মানবেতিহাসের বৈপ্লবিক, সংস্কারমূলক তৎপরতা এবং এ আন্দোলনগুলোর ফল সুস্পষ্ট ও বস্তুনিষ্ঠভাবে উপস্থাপিত হবে।

এর আলোকে শিয়া মতাদর্শ ও খোমেনির আকিদা-বিশ্বাস সঠিক নাকি ভুল, সে প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে। পাঠক ও গবেষক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন যে, যে দ্বীন ও জীবনব্যবস্থা পুরো মানবজাতিকে উদ্দেশ করে তার পয়গাম ঘোষণা করে, এ আকিদা-বিশ্বাস, আমল-আখলাকের মান, দাওয়াত ও সংস্কৃতির আঙ্গিক কেমন হওয়া চাই, তার স্বকীয় পরিকল্পনায় মানবসমাজের গঠন ও বিন্যাসের ধরণ কীরূপ হবে, এ দ্বীনে আহ্বায়কদের চরিত্রইবা কেমন হওয়া উচিত। কিয়ামত পর্যন্ত যে জীবনব্যবস্থা পৃথিবীতে টিকে থাকবে, মানুষকে সভ্যতা ও সংস্কৃতিসহ সকল বিষয়ে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দিয়ে যাবে, যে জীবনব্যবস্থার ইতিহাস-ঐতিহ্য, গৌরবোজ্জ্বল অতীত, আল্লাহর প্রেরিত ও পদে-পদে সাহায্যপ্রাপ্ত সত্যবাদীর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত মানুষগুলোর আদর্শিক নমুনা, প্রত্যক্ষভাবে নবীর সাহচর্য ও তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠা প্রথম প্রজন্মের নৈতিক মান ও কীর্তি কেমন হওয়ার কথা– যে নবী পরিবার-পরিজন সম্পর্কে বলেছেন, 'আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন।' বলেছেন, মুহাম্মাদের (সা.) পরিজনকে জীবনধারণ সম্ভব হওয়ার পরিমাণ জীবিকা' প্রদানের দোয়া করা হয়েছে, তাঁর সংশ্রবে আসা লোকগুলোকে সে আদর্শেই গড়ে ওঠা কি স্বাভাবিক নয় ? নাকি তারা সেসব রাজত্ব প্রতিষ্ঠাকামী, পরিবারতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক শ্রেণী ও গোষ্ঠীপ্রীতিতে অন্ধ, দলবাজ ক্ষমতালোভীদের মতোই হবেন, যারা যুগ-পরম্পরায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আত্মীয়করণের স্থায়ী বন্দোবস্ত করে দিতে চায়– যার যথেষ্ট মিল ইরানের

সামানি গোষ্ঠী ও অগ্নিপূজারীদের ইতিহাসেই। উক্ত গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে কুরআনি তত্ত্ব-নির্দেশনা, ইতিহাসের প্রতিষ্ঠিত তথ্য, ইতিহাসবিদ ও পাশ্চাত্যের বিদগ্ধ ব্যক্তিগণের পর্যালোচনা ও মন্তব্য নেয়া হয়েছে। পরে লেখক নির্মোহ পাঠকের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করেছেন, সায়্যিদুল মুরসালিন, খাতামুন্নাবিয়্যীন (সা.) এর উচ্চমর্যাদা, বিশ্বনবী হিসেবে প্রেরিত হবার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতি, নিরপেক্ষ ইতিহাসের সাক্ষ্যের আলোকে যে কোন চিত্রই মুসলমানের আত্মবিশ্বাস যোগায়, উদ্দীপনা তৈরি করে এবং বিবেকবান মানুষের জন্য অধিকতর বাস্তবানুগ।

'তুমি নিজের বিচারক্ষমতায় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করো, অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে নয়।'

গ্রন্থটি এ আঙ্গিকে লেখার পেছনে হয়তো এ-কারণগুলো ক্রিয়াশীল ছিল যে, লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞান, অধ্যয়ন, দাওয়াতি কাজের ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তন্মধ্যে বর্তমান তরুণ প্রজন্মের একটি বড় অংশ (আধুনিক শিক্ষার নেতিবাচক পরিবেশের প্রভাবে, উচুঁমাপের উর্দু সাহিত্যের সাহিত্য থেকে দূরবর্তী অবস্থানের ফলে) সীরাতে নববী (সা.) এবং ইসলামের প্রথম যুগের সমাজ ও সাহাবিদের জীবনচরিত অধ্যয়ন করেনি। তাদের মধ্যে একটি বড় অংশ না পড়েছে আল্লামা শিবলী নুমানীর অসাধারণ গ্রন্থ 'আল ফারুক', না নবাব সদর ইয়ার জং মাওলানা হাবিবুর রহমান খান শিরওয়ানীর হৃদয়গ্রাহী রচনা 'সীরাতুস সিদ্দিক', আর না পড়েছে মাওলানা আবদুস সালাম নদভির 'উসওয়াতুস সাহাবা' আর দারুল মুসান্নিফীন-এর 'সীয়ারুস সাহাবা' সিরিজ। তারা যখন শিয়া ইসনা আশরিয়ার ইমাম লেখকদের সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বেশ তথ্য-উপাত্তসহ লেখা গ্রন্থগুলো পাঠ করেছে, তাদের অনেকেরই মন সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে সন্দেহপ্রবণ ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়বেই।[১] তাই জরুরি হলো– ইতিহাসের অকাট্য তথ্যাবলি, তুলনামূলক নিরপেক্ষ শিয়া লেখক, বিজ্ঞ প্রাচ্যবিদ ও পাশ্চাত্যের বিগদ্ধ গবেষকদের কিছু উদ্ধৃতি যাতে ইসলামের প্রথম যুগ সম্পর্কে আলোচনা ও সাক্ষ্য মেলে।

এ উভয় উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ বিষয়ক গ্রন্থ সম্পাদিত হয়েছে। 'দ্বীন ইসলাম আওর দো মুতাযাদ তাসভিরীঁ' শীর্ষক '৮৫ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে গ্রন্থটি উর্দুতে প্রকাশিত হয়েছে। আরবিতে صورتان متضادتان নামে প্রকাশিত হয়েছে। Islam And The Earlisest Muslims : Two

১. এ বিষয়ে কিছু চিঠি-পত্রও বর্তমান লেখকের কাছে এসেছে

Conflicting Portraltes নামে ইংরেজি ভাষায় মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম লক্ষ্ণৌ'র পক্ষ থেকে এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থ এমন একটি শ্রেণীকে প্রভাবিত ও সন্তুষ্ট করেছে, যারা একদিকে পর্যালোচনা ও বিতর্কের গতানুগতিক পুরনো রেওয়াজের সঙ্গে অপরিচিত শুধু নয়; বরং কিছুটা বিতৃষ্ণও ছিলো।

কতিপয় ঘনিষ্ঠজনের বিস্ময় ও লেখকের নিশ্চিন্ত স্বস্তি

এ গ্রন্থটি যদিও তর্কের ধাঁচে লেখা নয়; এতে সাহিত্য ও ইতিহাসে রুচিশীল পাঠকের জন্য স্বাদ ও আকর্ষণের উপাদানও ছিল, তবুও কিছু বন্ধুর কাছে আমার এ বিষয়ে কলম ধরা পছন্দ হয়নি। যারা আমাকে দ্বীনের একজন ইতিবাচকতা অভিমুখী দাঈ, 'তারিখে দাওয়াত ওয়া আযিমত'-এর গ্রন্থকার ও আরব দেশ তথা মুসলিম বিশ্বে সমাদৃত সংস্কার ও বৈপ্লবিক চিন্তার লেখক হিসেবে জানতেন। অনেক বন্ধু আমার এ কাজে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন; কেউ কেউ প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন পুরনো বিতর্কিত এ বিষয়– যা নিয়ে হাজারো রচনা আছে– কলম ধরার চাইতে দাওয়াতি, সংস্কারমূলক, ইতিহাস ও সাহিত্যভিত্তিক সামাজিক বিষয়াদিতে নিজের শ্রম ব্যয় করা অধিকতর কল্যাণকর হবে।

বিভিন্ন মহল থেকে এ মন্তব্য আর অভিমতগুলো যখন আসছিলো, তখন আমি এ বিষয়ে অনুতাপ বা অপারগতা কোনোটাই ব্যক্ত করিনি। 'কারওয়ানে যিন্দেগি' প্রথমখণ্ডের পাঠকমাত্রই জানেন– আমি নিজের সকল দাওয়াতি, গবেষণামূলক লেখালেখির ব্যস্ততা সত্ত্বেও ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে কাদিয়ানী মতবাদ সম্পর্কে কলম ধরেছি।[১] আমার সে গ্রন্থ উর্দু, আরবি, ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়ে বহুল প্রচারিত ও ব্যাপক পরিচিত হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাস্তবতা হলো, কাদিয়ানী ও শিয়া উভয় মতবাদে খতমে নবুওয়ত অস্বীকারের মূল দর্শনটি সম্মিলিতভাবে বিদ্যমান।[২]

কোনো মতাদর্শের দাওয়াত বা আন্দোলন যখন ইসলামের চৌহদ্দি (Line Of Demarcation) অতিক্রম তখন শত নিরপেক্ষতা সত্ত্বেও ইসলামের

---

১. দেখুন, কারওয়ানে যিন্দেগি, প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠদশ অধ্যায়, পৃ. ৪৪৭-৪৫০

২. লক্ষণীয়, ইমামত ও আইম্মা সম্পর্কে শিয়া মতবাদ অনুসারীদের আকিদা ও দৃষ্টিকোণ বিশ্বনবী এককভাবে খাতামুন্নাবিয়্যীন হওয়ার সঙ্গে বৈপরীত্যপূর্ণ। দো মুতাযাদ তাসভিরীঁ, পৃ. ৮৫-৮৬।

একজন সত্যনিষ্ঠ দাঈ ও ন্যায়নিষ্ঠ লেখকের জন্য নীরবতা ও নিরপেক্ষতার রীতি ভেঙে সত্যের পক্ষে সোচ্চার হওয়া ও স্বাধীনভাবে কলম চালনা কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী, ইমাম গাজ্জালী, শায়খুল ইসলাম হাফিজ ইবন্ তাইমিয়া (রহ.) থেকে শুরু করে হযরত শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ ও শাহ্ আবদুল আযিয পর্যন্ত সকলের অনুসৃত রীতি এটাই ছিল। মালয়েশিয়া ও ইংল্যান্ডের সাম্প্রতিক সফর ও ইন্দোনেশিয়ার বেশ কিছু ওলামা ও দ্বীনের দাঈ'র চিঠির যৌক্তিকতা দৃঢ়তা দিয়েছে যাতে প্রতীয়মান হয় যে, বস্তুত এ ফিত্নার বিভ্রান্তি ও হঠকারিতা এতোই গভীর যে, (উপরের আলোচনায় এর যেসব দিক আলোচিত হয়েছে, সে বিবেচনায়) এর বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা ও ময়নাতদন্ত খুবই জরুরি হয়ে পড়েছিল। আলহামদুলিল্লাহ! এ কাজটি মোক্ষম সময়েই সম্পন্ন হয়েছে এবং এখনও এর উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা বর্তমান।

বিপুল রক্তক্ষয়ের মধ্যদিয়ে সংঘটিত ইরানি বিপ্লব, ইরাক-ইরান আট বছরের যুদ্ধ পুরো মধ্যপ্রাচ্যের জন্য একটি বড় হুমকি সৃষ্টি করেছে। উপরন্তু, ১৪০৭ হিজরি মোতাবেক ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় ইরানিদের সহিংস বিক্ষোভ, হারামাইন সম্পর্কে তাদের ভয়াবহ পরিকল্পনা (যা বর্তমানে ব্যর্থ করে দেয়া হয়েছে), এ ধরনের বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা ও ইরানি সরকারের বর্তমান নীতি-কৌশলের প্রতিবাদ অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যা পুরো মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি ঝুঁকি তৈরি করেছে, যা অমুসলিমদের দৃষ্টিতে ইসলামের বিকৃত ও নেতিবাচক চিত্র এবং ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে বিরূপ ধারণা সৃষ্টির সুযোগ করে দিচ্ছে।

একাদশ অধ্যায়

মিরাটের বিভীষিকাময় দাঙ্গা : দেশের ভেতরে ও বাইরে কয়েকটি সফর প্রসঙ্গ

মিরাটের বিভীষিকাপূর্ণ হাঙ্গামা

এমনিতেই '৪৭-এর পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেশের জন্য আদৌ অস্বাভাবিক বা নতুন কোনো ঘটনা নয়; ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে স্বল্প কিংবা দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলেই আসছে। এগুলোর মধ্যে মুরাদাবাদের এ ঘটনার উল্লেখ, যা ১৩ আগস্ট ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ঈদগাহে ঠিক ঈদের নামাজ চলাকালেই শুরু হয়ে যায়– এ হাঙ্গামায় বিপুলসংখ্যক নিষ্পাপ শিশু-কিশোর, যারা বড়দের সঙ্গে ঈদের নতুন জামা-কাপড় পরে ঈদগাহে এসেছিলো, তারাও আক্রমণকারীদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। 'কারওয়ানে যিন্দেগী'র দ্বিতীয় খণ্ডে এ ঘটনার কিছুটা সবিস্তার বর্ণনা আছে।[১]

এটা ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় সীমিত কিংবা ব্যাপক আকারে দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এটি রমজান মাসও ছিল। হতাহত বহু মুসলমান ছিলো রোযাদার। এ লেখা তৈরির সময় পর্যন্ত (ঘটনার শুরু থেকে চার মাস) ঘটনাগুলো উভয় পক্ষের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ ও রাষ্ট্রের হিতাকাঙ্ক্ষীদের কাছে শুধুই আলোচনা আর গবেষণার বিষয় হয়েই আছে। দাঙ্গার প্রেক্ষাপট, মূল কারণ ও সংঘটিত ভয়ানক অপরাধের নৃসংশতা ও ক্ষয়ক্ষতির বিবরণের জন্য কোনো প্রতিবেদনমূলক প্রবন্ধ নয়, সম্পূর্ণ একটি গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন রয়েছে। হয়তো বিভিন্ন জায়গা এ কাজটি হয়েও থাকবে। এ ঘটনাকেন্দ্রিক বিস্তারিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ এ গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু-বহির্ভূত।

তবে নিজের দেশে এমন একটি শহরে এরূপ বেদনাদায়ক ঘটনা সংঘটিত হওয়া – যা জ্ঞান, ধর্ম ও ইতিহাস-ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ, যেখান থেকে ১৯৪৭ সালে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের স্লোগান উঠেছিল, যার অদূরে উপমহাদেশের বিখ্যাত আধ্যাত্মিক (খানকাহ) ও আদর্শ নাগরিক সৃষ্টির কেন্দ্র অবস্থিত;[২] অন্যদিকে, এটি রাজধানী দিল্লীর খুব বেশি দূরে নয়, খুবই দুর্ভাগ্যজনক!

---

১. দেখুন, মুরাদাবাদ কা আলমিয়া (মুরাদাবাদের বেদনাদায়ক ট্রাজেডি)

২. দারুল উলূম দেওবন্দ (যাকে উপমহাদেশের জামিয়াতুল আযহারের সঙ্গে তুলনা করা হয়) ও মাযাহির উলূম সাহারানপুর অবস্থিত।

এখানে খুবই সংক্ষেপে কতিপয় অমুসলিম বিজ্ঞ লেখক-সাংবাদিকের তিনটি উদ্ধৃতি টেনেই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করবো। মর্যাদাশীল ও বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক Main Stream-এ লেখা হয়েছে :

> "মে মাসে মিরাটে সংঘটিত ঘটনা সচরাচর ও সাধারণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চাইতেও আলাদা। যখন কারফিউ শিথিল করা হয় এবং কিছু কিছু বাইরের লোক যাতায়াত করতে শুরু করে, তখন সেখান থেকে একের পর এক ভয়াবহ ঘটনার বিবরণ আসতে শুরু করে। মিরাটে ১৯৮৭ সালের ট্রাজেডি ক্রমেই আমাদের অনুভূতিতে জায়গা করে নিতে লাগলো। এখনও এ ভয়ানক ঘটনার পুরোটা সামনে আসেনি। এর ভেতরকার রহস্য পুরো অবগত আছেন এমন লোকের সংখ্যা একেবারেই কম। অকস্মাৎ পিএসি ঝটিকা বাহিনী যেন লোকালয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো, দরিদ্র ও সাধারণ মুসলমানদের দরোজায় আচমকা যেন কড়া নেড়ে হুড়মুড় করে গৃহে প্রবেশ করলো। ঘর থেকে তরুণদের উঠিয়ে নিয়ে গেলো। পিএসির নির্যাতন ক্যাম্পে নিয়ে লাইন করে দাঁড় করিয়ে সবাইকে ব্রাশ ফায়ারে লাশ বানানো হলো। ব্যস! এরপর সমুদ্রে ফেলে দেয়া হলো।"
>
> সূত্র : টাইমস অব ইন্ডিয়া, ১৪ জুন ১৯৮৭ খ্রি.

ইংরেজি পত্রিকা THE TELEGRAPH-এ শ্রী শংকর কৃষ্ণ ঠাকুরের প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি

"মালিয়ানার পরিস্থিতি খুবই করুণ। এখানে প্রাণ বাঁচাতে গ্রামে আশ্রয় নেয়া মানুষগুলোর ওপর নির্বিচার গুলি চালিয়ে নির্দয়ভাবে ঝাঁঝরা করে দেয়া হয়। পিআইএস এর জোয়ানরা মুসলমানদের বাড়িঘর দখলে নিয়ে কেউ বারান্দায় কেউ ছাদে অবস্থান নিয়ে মুসলমানদের নিখুঁত নিশানা বানিয়েছে, বহু মানুষকে জীবন্ত পুড়ে ফেলা হয়েছে। তিন ঘন্টার রক্তক্ষয়ী তাণ্ডব, গুলিবৃষ্টি ও লুটপাটের পর পিআইএস জোয়ানেরা চলে যায়। এরপর দেখা গেল ৬৬ টি ঘর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, নিহত হয়েছে ৪০ জন লোক (নিহতের প্রকৃত সংখ্যা এখনও চূড়ান্তভাবে নিরূপণ সম্ভব হয়নি; এখানকার এক বিরাট-সংখ্যক লোকজন নিখোঁজ রয়েছে)।"

বিখ্যাত সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার লিখেছেন :

> "মিরাট শহরের মালবানা গ্রামে সংঘটিত গণহত্যার নিষ্ঠুরতা ভাষায় বর্ণনাযোগ্য নয়। একটি ঘরও এমন ছিল না, যাকে গুলির লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়নি, একটি গোত্রও বাদ থাকেনি যাদের কমপক্ষে একজন ব্যক্তি মারা যায়নি। এ নির্মম হত্যাযজ্ঞের ২৪ ঘন্টার মধ্যে আমি ঘটনাস্থলে হাজির হই। দৃশ্যপটটি দেখলেই একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকা বলে মনে হবে। পুরুষ লোকেরা এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। '৪৭ এর দেশ-বিভাগের সময় আমি সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে যে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছি, এ যেন তারই পুনরাবৃত্তি।"

টাইমস অব ইন্ডিয়া ১৪ জুন ১৯৮৭ সালে নিখিল চক্রবর্তীর 'মিরাটে হিটলারি বর্বরতা' (Hitler Barbaries In Meraut) শিরোনাম করেছিল।

এ নৈরাজ্যের পর কিছুদিন অতিক্রান্ত হবার পরও বিভিন্ন সময়ে এ ধরনের পৈশাচিক কর্মকাণ্ড থেমে থেমে সংঘটিত হতে থাকে, যা ভারতের দেশপ্রেমিক ও মানবতাবাদী মানুষের জন্য খুবই লজ্জাকর। সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী ২২ জুলাই ১৯৮৭ খ্রি. রাতে দুটি বাসে মুসাফির মুসলমানদেরকে বের করে হত্যা করা হয়, যার মধ্যে ১২ জন ছিল নারী ও শিশু। বেসরকারি হিসেবে শহীদের সংখ্যা পনের জনের বেশি। ২৫ জুলাই ১৯৮৭ তারিখের টাইমস অব ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট-এর ভাষ্যমতে, নাফিস আহমদ, যিনি দিল্লী থেকে একটি বাসে আরোহণ করে বজনৌর যাচ্ছিলেন– রাত ১০.৪৫ টায় ত্রিশ জন হামলাকারী ওয়ালিদপুরের অদূরে বাসের গতিরোধ করে। জোরপূর্বক বাসে ঢুকে আটজন হত্যা করে ও অনেকের ওপর বীভৎস অত্যাচার চালায়। এভাবে বাসের মুসলমান যাত্রীদের ওপর হামলার আরও দুটি ন্যক্করজনক ঘটনা ঘটেছে। এ বিষয়ে কিছু কিছু সরকারি রিপোর্ট ও আহতদের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার তথ্য থেকে উদ্ধৃতি পাওয়া গেছে। সরকারি তরফে মিরাট ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। হিন্দুস্থান টাইমসের ভাষ্যমতে, তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ ছিল, এ ঘটনা সম্পূর্ণ পরিকল্পিত। আর জেলার প্রশাসনিক বিভাগ এ ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানোর জন্য পরিকল্পিত ও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তারা চাইলে এ ধরনের পরিস্থিতি ঠেকানো যেত।

সুতরাং বলা যায়, এ ধরনের নিষ্ঠুরতা চালানোর সুযোগ করে দেয়া হয়েছিল। ১৮ সেপ্টেম্বর সরকারকে কমিটি যে রিপোর্ট জমা দেয়, সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, রামের জন্মভূমি ও বাবরি মসজিদ ইস্যুকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উস্কে দেবার ক্ষেত্রে ইন্ধন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ১৮ মে'র পূর্বেই উভয় পক্ষ তীব্র বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। তদন্ত কমিটি তাদের রিপোর্টে ঘটনায় কোনো পাকিস্তানি নাগরিকের সম্পৃক্ততার অথবা বিদেশে তৈরি অস্ত্র ব্যবহারের বিষয় নাকচ করে দিয়েছে। অনেক জায়গায় শক্তিপ্রয়োগ, অত্যধিক কঠোরতা ও জিজ্ঞাসাবাদের নামে অযথা হয়রানি করা হয়েছে, হাশিমপুরায় পুলিশের অতিরিক্ত শক্তি ব্যবহারের কথা উঠে এসেছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশে বলা হয়েছে, আগামীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ করতে হলে রাম জন্মভূমি ও বাবরি মসজিদে ইস্যুর আশু নিষ্পত্তি করতে হবে। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিষয়ে আরও আন্তরিক এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।[১]

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্টেও উত্তর প্রদেশে পি.এ.সি-এর কর্মকাণ্ডের জন্য একহাত নেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এ ঘটনায় ডজনেরও বেশি নিরীহ মানুষকে হত্যার বিষয়টি একেবারে পরিষ্কার।[২]

অসুস্থতা ও দিল্লী-মুম্বাইয়ের সফর

এটা তাকদীরের বিষয় ছিল যে, রমজানের শেষ দশকে (যখন মিরাটে অরাজকতা শুরু হয়) আমি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ি, যার ফলে শেষের দশটি রোজাও ছাড়তে হয়। বাড়ির কাছে ঈদগাহ থাকা সত্ত্বেও আমি ঈদের নামাযে শরিক হতে পারিনি। চিকিৎকরা জানালেন –যাদের মধ্যে কয়েকজন খুবই ধর্মপরায়ণ এবং আমাদের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিও ছিলেন[৩]– মারাত্মক রক্তশূন্যতার ফলে স্বাস্থ্যের অবস্থা বেশ আশঙ্কাজনক। তারা আমাকে রক্ত নেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন কিন্তু আমি এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তাই বাহ্যিক চিকিৎসাতেই সীমিত থাকলাম। ঈদের পর অনেক পীড়াপীড়ি করে অধিকতর ভালো চিকিৎসার সুবিধার্থে তার লক্ষ্ণৌ-এর বাড়ি আকবর গেটে আমাকে অবস্থান করতে রাজি করালেন এবং সেখানে খুবই যত্ন ও আন্তরিকতার সঙ্গে

---

১. উদ্ধৃতি : 'কওমি আওয়াজ' , লক্ষ্ণৌ ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ খ্রি.

২. 'কওমি আওয়াজ' ২১ নভেম্বর ১৯৮৭ খ্রি. (সংক্ষিপ্ত)।

৩. যেমন শ্রদ্ধেয় ডা. সাইয়িদ কামরুদ্দিন (সিভিল সার্জন, মহারাষ্ট্র) ও কর্নেল মুহসিন শামসী

চিকিৎসা ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। ১০/১২ দিন এখানে চিকিৎসা নিয়ে দারুল উলূমের (নদওয়াতুল ওলামা) মেহমানখানায় স্থানান্তরিত হই।

এরপরে জনাব হাকিম আবদুল হামিদ (হামদর্দ ফাউন্ডেশন, দিল্লী) দিল্লী আসার জন্য বেশ জোর দিয়েই দাওয়াত করে বসলেন, যাতে তিনি নিজের তত্ত্বাবধানে ডাক্তারি পরীক্ষা ইত্যাদি করাতে পারেন। হাকিম সাহেব ও সাইয়িদ সাহেব (আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির উপাচার্য) দু'জনই দিল্লী বিমানবন্দরে এসে হাজির হন। সিদ্ধান্ত হলো, পরের দিন তুঘলকাবাদ মজিদিয়া হাসপাতালে যাওয়া হবে, যেখানে হাকিম সাহেব সরাসরি নিজের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থাপনা সারবেন।

হাকিম সাহেবের সম্মানে পুরো হাসপাতাল-কলেজ ও চিকিৎসাকেন্দ্র প্রায় সকল কর্মকর্তা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন এবং সর্বোচ্চ সেবা, আরাম ও সুচিকিৎসার চেষ্টা করে গেলেন (একটি হাসপাতালে যতদূর সম্ভব)। ওখানে প্রয়োজনীয় দিনগুলো অতিবাহিত করে স্নেহাস্পদ মাওলানা মুইনুল্লাহ নদভী, আবদুর রাজ্জাক ও মাওলানা নেসারুল হক নদভীর সঙ্গে মুম্বাই সফরে বেরিয়ে পড়ি। তখন দিল্লীতে খুব গরম পড়ছিল, সেই সাথে অনাবৃষ্টিও। মুম্বাইয়ে বরাবরের মতোই মুম্বাই অন্ধ্র ট্রান্সপোর্টের স্বত্বাধিকারী প্রিয়ভাজন আলহাজ্ব গোলাম মুহাম্মদ (মুহাম্মদ ভাই) মদনপুরার নবম মনযিলস্থ সুপরিসর বিশ্রামাগার 'সিহাগ প্লেসে' দুই সপ্তাহ অবস্থান করি। শুধু জুমার নামাযের জন্য দু'বার বাইরে এসেছিলাম। এতো বেশি দুর্বলতা অনুভূত হতো যে, ঘরটির মধ্যে চলাফেরাতেও খুবই ক্লান্তিবোধ করতাম। পাঁচ ওয়াক্ত নামায, আহারাদি ও এ 'কারওয়ানে যিন্দেগী' (আমার আত্মজীবনমূলক রচনা)-এর মুসাবিদা তৈরির কাজ চলতো সকাল ৮টা থেকে দুপুর বারোটা অবধি। এ কাজে সহযোগিতা করতো স্নেহভাজন মাওলানা নেসারুল হক নদভী। ৩০ জুলাই ঈদুল আযহা ঘনিয়ে আসায় আরও কিছু দিন থাকার জন্য আমার প্রিয় 'মেজবান' এর পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও লক্ষ্ণৌ ফিরে আসি।

লন্ডন ও কুয়েত সফর

আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক আমার স্নেহভাজন ড. ফরহান আহমদ নেজামী অক্সফোর্ড থেকে লক্ষ্ণৌ এলেন। তিনি এবছর ইসলামিক সেন্টারের ট্রাস্টির বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্য বারবার অনুরোধ করছিলেন। সম্মেলনটি '৮৭ সালের ২৭

আগস্ট অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিলো। সকল সদস্যকে সভার নোটিশ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে এবং এতে অংশগ্রহণ না করা প্রতিষ্ঠানের গঠনতান্ত্রিক ধারায় নিজের একটি দুর্বলতা হিসেবেই চিহ্নিত হবে। কারণ, এধরনের অনুষ্ঠানে সভাপতির উপস্থিতি অনেক তাৎপর্য বহন করে। শারীরিক দুর্বলতার কথা জানিয়ে উপস্থিতির অপারগতা প্রকাশ করেছিলাম কিন্তু তিনি এবং ঘনিষ্ঠজনেরা বললেন, এখানে বড় বড় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারও (Specialist) যেহেতু উপস্থিত থাকবেন, চিকিৎসার সুবিধাও পাওয়া যাবে। মৌসুমের ভিন্নতার সুবাদে এখানকার তীব্র গরম থেকেও মুক্তি মিলবে। অসুস্থতা ছাড়াও আমি স্বভাবগত নমনীয়তার কারণে আপনজনদের আবদারকে খুব জোর দিয়ে প্রত্যাখান (RESIST) করতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত কিছুটা দায়িত্ববোধ আর ঘনিষ্ঠজনদের সাহস যোগানোর পরিপ্রেক্ষিতে লন্ডন সফরের জন্য অনুপ্রাণিত হলাম। ফরহান, আমি ও আমার স্নেহভাজন রাবে' হাসানী (তিনি অক্সফোর্ড ইসলামিক সেন্টারের ট্রাস্টি মেম্বার (B.O.A.C) দু'টি প্রথম শ্রেণীর টিকেট কাটিয়ে নিলেন। ব্রিটেন দূতাবাসে ভিসার জন্য নির্দেশনাও চলে এসেছে। ডা. ফরহান নেজামী অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির সে সেমিনারে উপস্থাপনের জন্য ইসলাম, মুসলমান ও জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে একটি প্রবন্ধ তৈরির জন্য অনুরোধ করলেন। তাড়াহুড়োর মধ্যেই আমি 'সুশিক্ষার প্রসার, বিকাশ ও মানবতার পথনির্দেশনা এবং বহুমুখী কল্যাণে তার ভূমিকা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ তৈরি করলাম। আমার প্রিয়ভাজন মুহিউদ্দীন সাহেব খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই এর সুন্দর একটি তরজমা প্রস্তুত করে ফেললেন।

২৬ আগস্ট সকাল ৭টায় B.O.A.C এর ফ্লাইটে দুবাই ও কুয়েত হয়ে লন্ডনে পৌঁছি। এ সফরেও স্নেহভাজন ইসহাক (স্বত্বাধিকারী ইন্ডিয়া ট্যানারি কানপুর)-এর মতো এক সফরসঙ্গী পেয়ে যাই, যার কিছুদিন পরে ইংল্যান্ড জার্মানীতে বাণিজ্যের প্রয়োজনে সফর করার কথা রয়েছে। কিন্তু তিনি আমার আরাম ও সুবিধার জন্য ইঙ্গিত পাওয়ামাত্রই সফরকে এগিয়ে আনতে তৈরি হয়ে গেছেন। বিমানও দুবাই, কুয়েতে অবতরণ করার ফলে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল। টানা চৌদ্দ ঘন্টা বিমানে কাটানোর পর লন্ডন সময় বিকেল চারটা ও ভারতের সময় রাত সাড়ে আটটায় লন্ডন পৌঁছে যাই। ডা. ফরহান আহমদ নেজামীর সঙ্গে ডা. ব্রাউনিং (যিনি সেন্টারের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং ইউনিভার্সিটির অধীন একটি কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ, তিনি স্বয়ং গাড়িটি ড্রাইভ করছিলেন)-এর সামান্য অপেক্ষার পর বিমানবন্দরে দেখা হলো। আছরের নামায আদায় করে আমরা তার সঙ্গে আমরা অক্সফোর্ড

রওনা হলাম, যা লন্ডন থেকে প্রায় ৭০-৮০ কি.মি দূরে অবস্থিত (যা লক্ষ্ণৌ থেকে কানপুর বা লক্ষ্ণৌ থেকে রায়বেরেলীর দূরত্বের সমান বলা যেতে পারে)। যখন অক্সফোর্ড পৌঁছি, তখন ক্লান্তিতে শরীর একেবারে ভেঙে পড়ার উপক্রম। অল্পকিছু আগেই রোগাক্রান্ত থাকার ধকল ও চৌদ্দ ঘণ্টার সফর (যদিও ফার্স্টক্লাস আসনের সুবাদে কিছুক্ষণ শোয়ার সুযোগ হয়েছিল)-এর প্রতিক্রিয়ায় শরীর খুবই অবসন্ন ছিল। কিন্তু ড. ফরহান নেজামীর বাসায় খুবই আন্তরিক, প্রীতিপূর্ণ ও ঘরোয়া আতিথেয়তা, প্রফেসর খলিক আহমদের সহমর্মিতা এবং তার মাধ্যমে জ্ঞানচর্চায় সমৃদ্ধ আসরগুলোতে উপস্থিতি সফরের বিলম্বজনিত ক্লান্তি ও অস্বস্তি অনেকখানিই কমিয়ে দিয়েছিলো।

অক্সফোর্ড ও লন্ডনে

২৭ আগস্ট ট্রাস্টির মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। আমার মনে হলো, এ সফরে বিশ্বের অনেক বড় বড় জ্ঞানী ব্যক্তিদের (যাদের মধ্যে রাবেতা আলমে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল ডা. আবদুল্লাহ ওমর নাসীফ ও জামেয়াতুল ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন সউদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য) সঙ্গে সাক্ষাতের কারণে আমার এবারের সফর অনেক বেশি সার্থক হয়েছে। নিজের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যস্ততা সত্ত্বেও এতে অংশগ্রহণ করলাম। ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধিরা ছাড়াও এতে উপস্থিত হয়েছিলেন ড. কামেল আল বাকের, সাবেক উপাচার্য, উম্মে দারমান ইউনিভার্সিটি, কুয়েতের খ্যাতিমান ব্যবসায়ী, শিক্ষানুরাগী শায়খ আবদুল আযিয আল আলী আল মুতাওয়া প্রমুখ। সম্মেলনে খুবই আন্তরিক ও প্রীতিময় পরিবেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়। আমি নিজের অসুস্থতা ও শারীরিক দুর্বলতার বিষয়টি মাথায় রেখে সম্মেলনের একজন সহ-সভাপতি নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি, যাতে কোনোভাবে আমার উপস্থিতি বিলম্বিত হলে যেন তিনি সভাপতিত্ব করতে পারেন। এ জন্য আমি ড. আবদুল্লাহ ওমর নাসীফকে মনোনীত করলাম। বন্ধু-বান্ধবদের সাথে পরামর্শের পর এক পর্যায়ে সম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়।

২৯ আগস্ট অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টক্রস কলেজ-এ শায়খ আবদুল আজিজ আল মুতাওয়া বক্তৃতামালা আমার এ প্রবন্ধটি দিয়েই হয়েছিল। সম্মেলনে বেশকিছু আরব্য শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত থাকায় শুরুতেই আমি আরবিতে কিছু ভূমিকামূলক আলোচনার অবতারণা করি। এরপর ডা. ফরহান নেজামীকে প্রবন্ধটি পাঠ করার জন্য অনুরোধ করি। তিনি খুবই

চমৎকারভাবে প্রবন্ধটি পাঠ করলেন; শ্রোতারাও খুবই অভিনিবেশের সাথে প্রবন্ধ শুনছিলেন। নিম্নবর্ণিত উপশিরোনামগুলো পড়লে পাঠক এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা পেয়ে যাবেন। বিশেষ গুরুত্ব বিবেচনায় লেখার শেষাংশ পাঠকের খেদমতে উপস্থাপন করা হবে।

* নবুওয়তে মুহাম্মদী (সা.) এর চ্যালেঞ্জ ও বৈপ্লবিক অবদান
* এক অপ্রত্যাশিত সূচনা
* প্রকৃতি, মহাজগৎ, বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের ইতিহাস পর্যালোচনা ও এ বিষয়ের গবেষণার আহ্বান এবং কল্যাণকর দিক
* পৃথিবীর বিক্ষিপ্ত শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর মধ্যকার সংহতি ও সংযোগ
* পাশ্চাত্যের জাগরণ ও শিক্ষা-সংস্কৃতির নতুন যুগে ইসলামের অবদান
* প্রাচীন যুগে মুসলমানদের শীর্ষস্থান, বিশ্বমানবতা কল্যাণ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে তাদের নেতৃত্ব
* বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও আবিষ্কার-উদ্ভাবনে মুসলিম মনীষীদের কৃতিত্ব

শেষাংশ থেকে কয়েক ছত্র উল্লেখ করা হলো :

> "প্রবন্ধ শেষ করার আগে যে বাস্তবতার দিকে আপনাদের দৃষ্টি ফেরাতে চাই তা হলো– আমাদের এটি কখনও ভুলে থাকার সুযোগ নেই যে, মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা। বস্তুত, মানুষ জ্ঞানের উৎস যেমন নয়, তেমনি চূড়ান্ত ঠিকানাও নয়। সে স্রেফ আল্লাহর ইচ্ছেমাফিক তারই প্রতিনিধিত্বকারী সত্তা। কুরআনে আদম (আ.)কে বস্তুসমূহের নাম শিক্ষা দেয়া (যা জ্ঞানের ভিত্তি)-এর প্রসঙ্গটি যে ইঙ্গিত-আবহে (Context) আলোচনা করা হয়েছে, তাতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ তার লব্ধজ্ঞান আল্লাহর ইচ্ছে ও সম্মতির পথেই ব্যবহার করতে আদিষ্ট। জ্ঞানের ইতিহাসে বরং পৃথিবীর ইতিহাসে এটি বড় ট্রাজেডি যে, মানুষ এ সত্য প্রায় ভুলেই গেছে যে, সে বিশ্বজাহানের স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি, পৃথিবীর অনেক বড় দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করা হয়েছে। তাকে তো মালিক বানানো হয়নি যে, পৃথিবীর সম্পদরাশিকে সে ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত, দলীয়, রাজনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের স্বার্থে ব্যবহার করবে!

এ দিনটি ছিল সভ্যতার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসেও খুবই দুর্ভাগ্যপূর্ণ দিন, যেদিন সে ধ্বংসের এ পথটি বেছে নিয়েছিল। কেবল চিন্তাটি মানবজাতিকে সীরাতুল মুস্তাকিম তথা সঠিক পথের ওপর অবিচল রাখতে পারে তা হলো, মানুষ পৃথিবীর কোনো কিছুর মালিক নয়– আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধিমাত্র। কারণ, এ চিন্তা-চেতনাই তাকে স্বেচ্ছাচারী জীবনযাপন থেকে বিরত রাখতে পারে।"

অক্সফোর্ডে ফরহান নেজামী সাহেবের বাসায় তিনদিন অবস্থান করি, যেখানে প্রফেসর খলিক আহমদের সাহচর্যই আমার জন্য বেশি সুখকর এবং উপকারী ছিল। কারণ, এ দু'টি বৈঠক ছাড়া ওখানে তেমন কোনো কর্মসূচি ছিল না। ভারতে ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে প্রফেসর খলিক সাহেবের জ্ঞান ছিল সুগভীর ও বিস্তৃত, যা ভারত উপমহাদেশে খুবই কম লোকেরই থাকবে। আমার ক্ষেত্রেও এটি প্রিয় বিষয় হওয়াতে এ বিষয়ক আলোচনার আসরে তৃপ্তি বেড়ে যেতো বহুগুণ।

অনেকদিন ধরে স্নেহভাজন মাসরুর আহমদ লক্ষ্ণৌভি লন্ডনে সপরিবারে বসবাস করছেন। কিছুদিন যাবত তিনি অসুস্থতায় ভুগছেন। তাই তাকে কষ্ট দেয়া সমীচীন মনে করিনি। কিন্তু তিনি নিজেই গাড়ি নিয়ে হাজির এবং আমাদের তিনজনকে (আমি, মাওলানা রাবে' হাসানী ও মাওলানা ইসহাক) সাথে নিয়ে গেলেন। নিজের অসুস্থতা ও শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও মেহমানদারীতে তিনি কোনো কমতি রাখলেন না।

ডা. ফরহান নেজামী লন্ডনের প্রসিদ্ধ Cronwell Hospital-এর একজন বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক Dr. Brian G. Gazzard-এর কাছে চিকিৎসাসংক্রান্ত পরামর্শের জন্য সময় নিয়ে রেখেছিলেন। দু'বার সাক্ষাতে তিনি স্বাস্থ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন। আমার বর্তমান স্বাস্থ্যগত অবস্থার ব্যাপারে কোনো উদ্বেগ দেখালেন না। রিপোর্ট দেখে কিছু চিকিৎসাপত্র দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন, ভারতে এসে সেটা আমি যথা সময়ে পেয়ে যাই, যা স্বস্তি কর ছিল (অদৃশ্যের প্রকৃত খবর শুধু আল্লাহই পরিজ্ঞাত)।

ভারত প্রত্যাবর্তন

অসুস্থতার প্রতিক্রিয়া ও সাধারণ শারীরিক দুর্বলতা কারণে ঘনিষ্ঠজনদের আমি বলে রেখেছিলাম লন্ডনে যেন আর কোনো নতুন কর্মসূচি না রাখা হয়; তারা তেমনটিই করেছেন। স্নেহভাজন ইসহাক লন্ডন পৌঁছেই ব্যবসায়িক

কারণে সঙ্গত্যাগের অনুমতি নিয়েছিলেন। কেননা, ব্যবসায়িক কাজে তার জার্মানী যাবার কথা ছিল। আমি ও মুহাম্মদ রাবে' রবিবার ৬ সেপ্টেম্বর কুয়েত এয়ারওয়েজে চেপে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। সফরের দীর্ঘতা ও ক্লান্তি হ্রাস করতে কুয়েতে দু'দিন যাত্রাবিরতি করলাম। সেখানেও যাতে কোনো কর্মসূচি না হয় সেরকম চেষ্টা ছিল; কিন্তু কুয়েতের অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আমার অনেক দিনের প্রিয়ভাজন শায়খ আবদুল্লাহ আল-আলী আল-মুতাওয়ার অনুরোধে একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেই হলো, যা তিনি নিজের সুপরিসর কম্পাউন্ডে বেশ ঝাঁকঝমকের সঙ্গেই আয়োজন করেছিলেন– যেখানে কুয়েতে অবস্থানরত বন্ধু-বান্ধবদের দাওয়াত দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি 'আল মুজতামাআ' ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে একটি মতবিনিময় ছিল। সেখানে উপস্থিত থাকতে হলো যাতে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামি ভ্রাতৃত্বকে সুসংহত করা প্রসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সম্মানিত সম্পাদকের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়। এতে আরও কয়েকজন চিন্তাবিদ ব্যক্তি অংশগ্রহণ করলেও বেশির ভাগ আমিই বলেছি। পরে এটি 'আল মুজতাআ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

কুয়েতে দুদিন স্নেহভাজন সাইয়িদ ইবরাহিম হাসনী নদভী ও মুনযির আলম নদভীর কাছে অবস্থান করে আমরা ৮ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে দিল্লীর উদ্দেশে রওনা হয়ে যাই। নিরাপদ ও আরামেই ৯ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় দিল্লী পৌঁছে যাই এবং সেখানে কয়েক ঘণ্টা অবস্থান করে লক্ষ্ণৌ রওনা হয়ে যাই। পূর্বাপর নিরাপত্তা ও কল্যাণ আল্লাহর হাতে।

দ্বাদশ অধ্যায়

মধ্যপ্রাচ্য সফর, রাবেতা আলমে ইসলামীর তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান ও সফরে নানা সভা-সেমিনারের ব্যস্ততা

রাবেতার তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন

রাবেতা আলমে ইসলামি মক্কা (আমি শুরু থেকেই যার কেন্দ্রীয় সদস্য) কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েট সিদ্ধান্ত নেয়, ১৯৮৭ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝি (১১-১৫ অক্টোবর ১৯৮৭ খ্রি. মোতাবেক ১৮-২২ সফর ১৪০৮ হি.) সংস্থার তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এতে মুসলিম বিশ্বের বর্তমান অবস্থা, সংকট ও চ্যালেঞ্জ প্রভৃতি নিয়ে পর্যালোচনা হবে। এসব সমস্যা সমাধানের কলাকৌশল ও চেষ্টা-তদবির নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা হবে। দীর্ঘদিন পরে অনুষ্ঠিতব্য এ সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ছিল 'চলমান পরিস্থিতিতে ইসলামের দাওয়াতি তৎপরতাকে অধিকতর কার্যকর ও সফল করার পথ ও পদ্ধতি'। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন ইসলামি রাষ্ট্রের উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে ও অগ্রগতির পথে ইসলামি দৃষ্টিকোণে এর বাস্তবধর্মী সমাধান ও সহযোগিতা বিষয়ক প্রস্তাবনা পেশ করা ছাড়াও সম্ভবত হারাম শরীফে সংঘটিত অপ্রীতিকর ঘটনা (যা হজের সময় ৬ জিলহজ ইরানিদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল) এ সম্মেলন আয়োজনের তাগিদ বাড়িয়ে দিয়েছে, যেখানে মুসলিম বিশ্বের বড় বড় শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবীগণ উপস্থিত হবেন।

ধারণা করা হয়েছিল, এ সম্মেলনে যোগদানকারী মুসলিম জাহানের শীর্ষ ইসলামিক পণ্ডিত, ইসলামি সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দ হারামাইন শরীফে এ রকম ন্যক্কারজনক ঘটনায় তাদের প্রতিক্রিয়া জানাবেন এবং একথার ওপর জোর দেবেন যে, হারামাইনের পবিত্র ও হাজীদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা কেবল সৌদি সরকারের একার নয়; সমগ্র মুসলিম উম্মাহর সম্মিলিত দায়িত্ব। আমার একদিকে নিজের স্বাস্থ্যগত দুর্বলতা, অন্যদিকে এতো বড় পরিসরের সম্মেলন (যার কার্যকর ও ইতিবাচক সুফল খুব কম দেখেছি)-এ যোগদানের বিষয়টি অনিশ্চিত ছিল। কিন্তু বিভিন্ন দেশের শীর্ষ

চিন্তাবিদগণ, মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্বস্থানীয় বুদ্ধিজীবীবৃন্দ এবং বিশেষ খোদ সউদী আরবের সরকারি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হচ্ছেন– শেষ পর্যন্ত এটা ভেবে এতো দীর্ঘ সফরের কষ্ট স্বীকার করে তাতে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলাম। প্রেক্ষাপট খুবই নাজুক ও জটিল– যা ইরানি বিপ্লবপন্থী ও মধ্যপ্রাচ্যের অপর দেশের মধ্যকার সংঘটিত যুদ্ধের ফলে সৃষ্টি হয়েছে এবং উপস্থিত ঝুঁকিপূর্ণ পরিপ্রেক্ষিতে আরবদেশগুলো বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর ওপর নির্ভরশীল হয়ে যাচ্ছে। নিজেদের মধ্যকার সুসংহত ঈমানি আন্দোলন ও দাওয়াতি তৎপরতার কোনো অস্তিত্ব নেই, যার কর্মী ও দা'ঈগণ লক্ষ্য অর্জনে প্রত্যয়ী, অবিচল, ত্যাগী ও জীবনবাজী রাখার মতো দৃঢ়চেতা, তাদের জন্য বাস্তবসম্মত দিকনির্দেশনা, সরল, সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন পরামর্শ এবং আসন্ন বিপদ সম্পর্কে তাদের সামনে পরিষ্কার সতর্কবার্তা উপস্থাপনের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল (যা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে অংশগ্রহণকারী অন্যদের কাছ থেকে খুব সামান্যই প্রত্যাশিত ছিল)।

একেবারে শেষ সময়ে এ অনুষ্ঠানে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিলাম এবং খুবই তাড়াহুড়োর মধ্যে 'বর্তমান সময়ে ইসলামি দাওয়াতের উপযুক্ত ক্ষেত্র ও কেন্দ্রীয় মঞ্চ' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ তৈরি করা হলো। যোগদানদারী মেহমানদের সুবিধার্থে রাবেতার সেক্রেটারিয়েট সংস্থার তিনটি শাখা রাবেতার কেন্দ্রীয় কমিটি, আল মাজলিসুল ইলমি লিল মাসাজিদ-এর মূল অধিবেশনের ঠিক পূর্বে আর আল মাজমাউল ফিকহীর অধিবেশন মূল অধিবেশনের অব্যবহিত পরেই নির্ধারণ করেছে যাতে যারা তিনটি কমিটিরই সদস্য তাদের জন্য এক সফরেই প্রত্যেকটি অধিবেশনে অংশগ্রহণ সহজ হয় আর যারা একটি কমিটির সদস্য তারা সে অধিবেশনে অংশ নিতে পারে। ঘটনাক্রমে আমি তিন কমিটির সদস্য কিন্তু কিছুটা বিলম্বে পৌঁছার কারণে ১১ অক্টোবর শুরু হওয়া মূল অধিবেশনেই কেবল অংশ গ্রহণ করতে পেরেছি। অন্যদিকে, সময়ের স্বল্পতার কারণে আল মাজমাউল ফিকহীর একটিমাত্র অধিবেশনে অংশ নিই।

মক্কা-সফর ও রাবেতা কনফারেন্সের ব্যস্ত সময়

আমি ৯ অক্টোবর ১৯৮৭ খ্রি. স্নেহভাজন মাওলানা রাবে' হাসান নদভীসহ– যিনি রাবেতার অধিকাংশ সভাগুলো এবং সউদী আরব, মধ্যপ্রাচ্য সফরে প্রায়ই আমার সফরসঙ্গী ও সহযোগী হয়ে থাকেন (এ ছাড়াও ওখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে অধিকতর ওয়াকিবহাল)। জুমার দিন

সকালের বিমানে লক্ষ্ণৌ থেকে দিল্লী রওনা হয়ে যান। যেহেতু কাছাকাছি সময়ে দিল্লী থেকে সউদী আরবের কোনো ফ্লাইট ছিল না যাতে ১১ অক্টোবর সকালে পৌঁছে উদ্বোধনী অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করা যায়, তিনি দিল্লী থেকে মুম্বাইয়ের পথ ধরলেন; সেখানে কয়েক ঘণ্টা বিরতির পর ১০ অক্টোবর তিনি সিরিয়া পৌঁছেন এবং মাগরিবের নামাযের পরপরই সিরিয়া থেকে জেদ্দার পথে রওনা হয়ে যান। দুশ্চিন্তার বিষয় ছিল, জেদ্দায় অবতরণ করে আবার আমার অসুস্থ শরীরের জন্য উপযুক্ত খাবারের সন্ধানে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতে হয় কিনা। কিন্তু মহান আল্লাহর বিশেষ রহমতে মাওলানা ওসমান হায়দারাবাদী– তাকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দিন– (তিনি জেদ্দা বিমানবন্দরে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ছিলেন) শুধু আমার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো যোগাড় করতে জেদ্দা থেকে দিনের প্রথমভাগেই রিয়াদ রওনা পৌঁছে যান এবং হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করেন। একেবারে তালিকা মতো নিজেই সব ধরনের খাবার কেনাকাটা করে রেখেছেন; ফলে আমার আর কোনো কষ্টই হলো না।

মুম্বাই থেকে জনাব মুহাম্মদ ইউনুস ও সাইয়িদ শেহাবুদ্দিন এমপি-ও সফরসঙ্গী হলেন। রিয়াদ থেকে আনুমানিক রাত ২টায় জেদ্দা পৌঁছলাম। সেখানে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন আবদুল গনি নূরওলী খান্দানের সদস্য মুহাম্মদ নূর। তার সঙ্গে আমরা এবং সেখানে জেদ্দা, মক্কা, মদিনার বন্ধুবান্ধবদের আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। আমরা সবাই মুম্বাই থেকেই ইহরাম বেঁধে নিয়েছিলাম। সকাল ৯টায় মক্কার ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলের ইসলামি সংহতি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিতব্য উদ্বোধনী অধিবেশনে অংশগ্রহণ করার কথা ছিল। এ অধিবেশনে রাবেতার সেক্রেটারী জেনারেল ড. আবদুল্লাহ ওমর নাসীফ তার প্রতিবেদন পেশ করার কথা। এ কারণে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওমরা পালন মুলতবী রেখে ফজরের নামাযের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও নাস্তার পর মক্কার উদ্দেশে রওনা হয়ে যাই। যে হোটেলের হলরুমে সম্মেলন হবার কথা, সেটি যাওয়ার পথেই অবস্থিত; তাই প্রথমে সেখানেই উঠলাম। সেখানে যোহরের নামায পর্যন্ত উপস্থিত থেকে নামাযের পর আমার পুরাতন বিশ্রামাগার মনসুর সড়কে মাওলানা আবদুল্লাহ্ আব্বাস নদভীর বাসায় উঠি। সম্মেলনে আগত মেহমানদের অনেকেই ইন্টার কন্টিনেন্টাল ও হোটেল জিয়াদেই অবস্থান করছিলেন। রাবেতার পক্ষ থেকে তাদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিলো।

আছর ও মাগরিবের নামাযের মাঝামাঝি সময়ে আমার স্নেহভাজন সাইয়িদ হাসান তারেকের সহযোগিতায় ওমরার কাজ সম্পন্ন করলাম।

পবিত্র মক্কা ও মদিনার পবিত্রতা সম্পর্কে বক্তৃতা

পরের দিন ৯ সফর মোতাবেক ১২ অক্টোবর সকাল সাড়ে আটটায় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। মনে হলো, ইন্দোনেশিয়ার রাবাত থেকে মরক্কো পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের প্রতিনিধি এবং বহির্বিশ্বের ইউরোপ-আমেরিকা এবং পূর্বপ্রাচ্যের শেষ সীমানা পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, মুসলিম সংস্থা-সংগঠনের জ্ঞানী-গুণী প্রতিনিধি, দাঈসহ আমন্ত্রিত নানা ঘরানার বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত হয়েছেন, যাদের সংখ্যা সাতজনের কাছাকাছি হবে। মক্কায় পৌঁছার পর আমার মনে হতে লাগলো দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে মক্কা-মদিনার মর্যাদা ও পবিত্রতা শীর্ষক আমার বক্তব্যের বিষয় অপ্রকাশিত সূচিতে নির্ধারিত হয়েই আছে। বিষয়টি আমার জন্য বরাদ্দ হওয়ায় মনে মনে পুলকিতও ছিলাম এ কারণে যে, বিষয়টিতে আমি কিছু কাজের কথা বলার সুযোগ পাবো। বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞ মেহমানদের আলোচনার পর এক পর্যায়ে আমার বক্তৃতা শুরু হলো। এ বক্তৃতা উপস্থাপনের সময় আমার অনুভব হচ্ছিলো, হারামাইনের বরকত, প্রাণবন্ত উপলব্ধি, অপার্থিব এক জীবন্ত শক্তির অবর্ণনীয় অনুরণন এতে যুক্ত হয়ে গিয়েছে। আমি বক্তৃতা শুরু করেছিলাম সুরা হজের ২৫ নম্বর আয়াত দিয়ে :

وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ [٢٢:٢٥]

'আর যে (হারামের অভ্যন্তরে) অন্যায়ভাবে কোনো ধর্মবিরোধী কাজ করবে আমি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাবো।'

আমি বললাম, এ আয়াত কুরআনের একটি বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী ও আল্লাহর অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিস্তৃত অপার জ্ঞানের নিদর্শন। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত সভ্য দুনিয়া তথা আরব উপদ্বীপে কেবল এক ধরনের হামলার অভিজ্ঞতা ছিল; আর তা ছিল প্রকাশ্য রণাঙ্গণে যুদ্ধ বা আগ্রাসনমূলক হামলা, যার একটি নমুনা ছিল এ পবিত্র ভূমিতে হানাদার আবরাহার হস্তি বাহিনীর কর্মকাণ্ড। সে হামলার প্রেক্ষাপটে বাহিনীসমেত মহান আল্লাহ আবরাহার করুণ পরাজয় ও ভয়ানক পরিণতির মধ্যে দিয়ে সমুচিত জবাব দিয়েছেন। ঘটনার বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনে পুরো একটি সুরা নাযিল করা হয়েছে। কিন্তু এ পর্যন্ত এ নিরাপদভূমি বায়তুল্লাহ ও মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রীয় জনপদে এমন গভীর চক্রান্ত, গোপন নাশকতা ও খোদাদ্রোহিতামূলক পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু সর্বজ্ঞানী ও সববিষয়ে সর্বাধিক পরিজ্ঞাত আল্লাহ এ সম্পর্কেও একটি আগাম সতর্কবাণী

দিয়ে রেখেছিলেন, যিনি মানবজাতির জন্য চূড়ান্ত আসমানি কিতাবটি অবতীর্ণ করেছেন– এ ধরনের ঘটনাও ঘটতে পারে এবং সেসম্পর্কেও সজাগ থাকতে হবে। তবে যারা তাতে জড়িত হবে, 'তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে।'

আমি বললাম, "এ জায়গাকে আল্লাহ قياما للناس মানুষের আবাসস্থল বলেছেন। এটি গভীর মর্ম ও ব্যাপকতর ভাবব্যঞ্জনাময় শব্দবন্ধ, যার প্রসারতা ও ব্যাপকতা (যেমনটি আমি ইমামে হারাম শায়খ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবন্ আস্ সুবাইল ও রাবেতার সেক্রেটারী জেনারেল আবদুল্লাহ ওমর নাসীফ-এর উপস্থিতিতে লক্ষ্ণৌর একটি বড় সংবর্ধনা/অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে বলেছিলাম) ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ খুবই কঠিন। একটি ব্যাখ্যা এরকম যে, মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ ও পুরো বিশ্বের নিরাপত্তা এ জনপদের নিরাপত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যতদিন স্বমহিমায় ও স্বকীয় মর্যাদায় এটি মাথা উঁচু করে অস্তিত্বমান থাকবে, ততদিন মানবতার আত্মিক মহিমা, কল্যাণধারা ও বিমূর্ত মর্যাদাও বহাল থাকবে।[১] যারা এর নিরাপত্তাকে ক্ষুণ্ন করতে উদ্যত হবে, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক এ শহরকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে যুদ্ধ-সংঘাত ইত্যাদির ক্রীড়াঙ্গণে পরিণত করতে চাইবে, আল্লাহ তার ধ্বংস ও সর্বনাশের ব্যবস্থা করবেন।

প্রিয় উপস্থিতি! তরঙ্গবিক্ষুব্ধ এ আরব সাগরের তীরে সেদিন মহান রাসূলের (সা.) পিতামহ আক্রমণোদ্যত আবরাহার হামলা মোকাবেলার প্রশ্নে বলেছিলেন, إن للبيت ربا يحميه এ ঘরের একজন মালিক আছেন তিনিই এর হেফাজত করবেন। তখনও সে উক্তির বাস্তবতা প্রমাণিত হয়েছিল, এখনও হবে; কিয়ামত পর্যন্ত বারংবার হতে থাকবে।"

আমিও এ-ও বলেছিলাম, "এটি আন্তর্জাতিক মুসলিম উম্মাহর সম্মিলিত ও অভিন্ন ইস্যু হওয়ার একটা প্রমাণ এটাও যে, একজন অনারব তথা ভারতের নাগরিককে এ ইস্যুতে আলোচনা করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। বাস্তবতা হলো, মুসলমানদের চেতনায় পবিত্র মক্কা ও মদিনার অবস্থান, মর্যাদাবোধ ইসলামি মূল্যবোধের আলোকে ইসলামি ভ্রাতৃত্বের মাত্রা নিরূপক (Barometer) ব্যারোমিটার স্বরূপ। যতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের অন্তরে এ

---

১. এখানে অনিচ্ছাকৃতভাবে একটি ফার্সি কবিতা মনে পড়ে যায়, আররিতে যার মর্ম বর্ণনা করা কঠিন বটে; তবুও রুচিশীল শ্রোতাদের জন্য আমি ফার্সি কবিতাটি একটি পংক্তি আবৃত্তি করেছিলাম। 'যতদিন এ পবিত্র ভূমি সগৌরবে অস্তিত্বমান থাকবে, পৃথিবী ততকাল বিরাণ হবে না– একথা জেনে রেখো সুনিশ্চিতভাবে।'

দু'টি পবিত্র স্থানের উচ্চ শ্রদ্ধাবোধ অটুট থাকবে, ততদিন এর প্রতি কারো রক্তচক্ষু তারা বরদাশত করবে না। এ সম্পর্কের মধ্যদিয়ে ইসলামের সুরক্ষাও নিশ্চিত থাকবে। আমি আপনাদেরকে এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, পুরো ভারতবর্ষের মুসলমানেরা পবিত্র মক্কা-মদিনার মর্যাদা রক্ষায় জীবন-প্রাণ উৎসর্গে চিরকাল প্রস্তুত ছিল, আজও আছে।

এটি ইতিহাসের অমোচনীয় বাস্তবতা। রাসূলের স্তুতিসূচক কবিতা-সংগীতের ক্ষেত্রে উপমহাদেশে আরবি ফার্সিতে যেসব উচ্চমার্গীয় শব্দ-বাক্য ও অলংকৃত ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে (আমার অধ্যয়নে), অন্য কোনো ভাষায় তার সমতুল্য কথামালা পাওয়া যায়নি। হারামাইনের যিয়ারতের জন্য মুসলমানদের অন্তরে যে প্রবল উদ্দীপনা, উদগ্র বাসনা, মক্কা-মদিনার দৃশ্য দেখে চোখ জুড়ানোর যে আকুতি তাদের কাব্যে ফুটে উঠেছে, সে আকাঙ্ক্ষার দুর্বার শক্তি তাদেরকে চারপাশের কুফর, শিরক, অধর্ম আর নাস্তিকতার সয়লাব থেকে রক্ষা করেছে। এটা বস্তুত হারামাইন রক্ষার এক অনন্য চেতনাবোধেরও বহিঃপ্রকাশ, যা ভারতের খেলাফত আন্দোলনে এমন জযবা-স্পৃহার সঞ্চার করেছিল, অন্য কোনো আন্দোলনে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। এটি তুর্কিদের মাঝেও সক্রিয় ছিল।

যখন তুর্কি সুলতান ওয়াহিদুদ্দীনকে বলা হলো, এখন তুর্কি সেনারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, এতো বিশাল সামাজ্যের নজরদারি তাদের দ্বারা সহজ নয়; তাই এখন হারামাইন থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া দরকার, তখন খুবই বিস্ময়মাখা স্বরে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন, 'তাহলে আমাদের তুর্কি সেনারা কোন্ মনোবল ও প্রাণশক্তির জোরে ময়দানে লড়বে এবং জীবনবাজি রাখবে?' এ পর্যায়ে আমি ইসলামি রেনেসাঁর কবি আল্লামা ইকবালের একটি উর্দু কবিতা আবৃত্তির অনুমতি চাই; এটা এ কারণেও যে, এখানে ভারত-পাকিস্তানের বেশ ক'জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিও উপস্থিত রয়েছেন। উপরিউক্ত চেতনায় উদ্দীপ্ত ইকবাল উচ্চারণ করেছিলেন : 'হারামের প্রহরায় ঐক্যবদ্ধ হও মুসলিম বিশ্ব; নীল নদের তীর থেকে কাশগড়ের সীমান্ত পর্যন্ত।' আবৃত্তির পর আমি কবিতাটি আরবিতে অনুবাদ করলাম। আলহামদুলিল্লাহ! বক্তৃতা প্রত্যাশিত প্রভাব লক্ষ্য করলাম। কয়েকজন বড় ব্যক্তি নিজেদের গভীর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন, প্রবন্ধ ও শেষ ভাষণ

সম্মেলনে বিপুলসংখ্যক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিলেন বিশেষত বিভিন্ন আরবদেশের বিজ্ঞজন, তরুণ প্রজন্মের অনেকেই আমার রচনাবলির সুবাদে পরিচিতি ছিলো, তারা খুবই আবেগাপ্লুত ও ভক্তিপূর্ণ অভিব্যক্তি নিয়েই সাক্ষাত করে, নিজেদের দেশে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়, কেউ কেউ ফাঁকে ফাঁকে অনেক প্রশ্ন করে চলেছে আর তা রেকর্ডও করে নিচ্ছে। প্রত্যেক অধিবেশন শেষে (যোহরের নামাযের পর) কোনো না কোনো মেজবানের জমকালো মেহমানদারির আয়োজন থাকতো। সেখানে অংশগ্রহণ করার পর তাদের প্রতিক্রিয়া জানার সুযোগ হতো, যা ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। ওখানে উপলব্ধি করতাম জীবনযাত্রার মান আর মেহমানদারির আয়োজন এখানে কেমন শীর্ষমাত্রা স্পর্শ করেছে। আছরের নামাযের পর কমিটি কিছু নিজস্ব কাজ সম্পাদন করে থাকে, সেখানে অংশ নিতে পারিনি। রাতে জেদ্দার কোনো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার বাসায় আপ্যায়নের আয়োজন থাকতো, সেখান থেকে ফিরতে বেশ রাত হবার আশঙ্কা থাকায় অংশগ্রহণ করা হয়নি।

সম্মেলনের চতুর্থ দিন বুধবার ২১ সফর ১৪০৮ হি. মোতাবেক ১৪ অক্টোবর মাগরিবের নামাযের পর নির্ধারিত বিষয়ে আমার বক্তৃতা সুযোগ এলো। এ প্রবন্ধ বিভিন্ন মহল ও স্তরে ইসলামের বিভিন্নমুখী চিন্তা-চেতনা, ধর্মীয় জাগরণ তার পরিগঠন ও তাকে উম্মাহর স্বার্থে সমন্বিতভাবে কাজে লাগানোর ব্যাপারে ধারাবাহিক কিছু কথা বিন্যস্ত ছিল, যা সম্ভবত আমার পুরনো একটি বক্তৃতা 'ইতিহাস ও বাস্তবতার আলোকে হিজরি পনের শতকের নববর্ষ'[১] থেকে চয়নকৃত ছিল। কিন্তু এ প্রবন্ধের গুরুত্বপূর্ণ অংশ যার জন্য এ সফরের কষ্ট স্বীকার করা হয়েছে– আরব রাষ্ট্রগুলো বিশেষত মুসলিম উম্মাহর কেন্দ্রভূমির অবস্থান, তার বর্তমান পরিস্থিতি, বিদ্যমান বাস্তবতা ও প্রেক্ষাপট বিবেচনায় যে লেখাটি তৈরি করা হয়েছে, সে অংশটুকুর তরজমা এখানে উপস্থাপন করছি :[২]

> "শেষে বলতে চাই, ইসলামের প্রকৃতি, তার আলোকিত ইতিহাস, সুস্থবোধ-স্বভাব এবং মানুষের স্বভাবসুলভ

---

১. উর্দুতে যার অনুবাদ ছিল : 'পন্দরভি সদী হিজরি : মাজী ওয়া হালকে আয়নামে' এ নামে প্রকাশিত হয়।

২. পুরো প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন স্নেহভাজন ড. মাওলানা আবদুল্লাহ আব্বাস নদভী, যা যিরক ওয়া ফিকর ১৯৮৭ সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে।

বৈশিষ্ট্যের দাবি, মুসলমানদের চিরকাল একটি দাওয়াতি ও ঈমানি তৎপরতা বরাবরই সক্রিয় থাকবে, যা হবে ইতিবাচক ধারার এবং মৌলিকত্বের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। দাঈদের মধ্যে সাধকসুলভ বৈশিষ্ট্য, অন্তরের প্রসারতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উদারদৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রবল আত্মবিশ্বাস ও অনমনীয় সাহসিকতার কারণে তারা পৃথিবীর যে কোনো পরাশক্তির মুখোমুখি হতে পারবে নিঃশঙ্কচিত্তে। সেসব শক্তির কথা বলছি, যারা মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের ভাগ্যনিয়ন্ত্রক হয়ে বসেছে। ইসলামের এ দাওয়াতি কাফেলার সদস্যগণ পূর্ণ আত্মোপলব্ধি ও ঋজু আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে পরিপূর্ণ আস্থা ও স্থিরতার সাথেই এগিয়ে যাবে। তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে অবিচল বিশ্বাস থাকবে যে, পুরো মানবজাতি নিজেদের সাফল্য, নিরাপত্তা ও মুক্তির জন্য ইসলামের প্রতি মুখাপেক্ষী।

ইসলামের দাওয়াতি তৎপরতায় নিবেদিত দাঈদের মাঝে অপরিমেয় ত্যাগের স্পৃহা, জীবন কুরবান করার প্রবল উদ্যম, সাদাসিধে জীবনযাপনের অভ্যাস, প্রয়োজনে যেকোনো ঝুঁকি নেবার হিম্মত থাকবে পূর্ণমাত্রায়। এমন বৈশিষ্ট্য যারা ধারণ করবে, তাদের প্রতি সাধারণত মানুষমাত্রই শ্রদ্ধাবনত থাকবে, আকৃষ্ট হবে। যে বস্তু দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য এবং অনুরূপভাবে দুর্বল ব্যক্তি শক্তিমানকে স্বভাবতই শ্রদ্ধা করতে বাধ্য, নির্ধন ব্যক্তি ধনীকে সম্মান করবেই, অশিক্ষিত মানুষ শিক্ষিত মানুষকে ঈর্ষা করবে, এমনকি একজন দুর্বল মানুষ একজন উচ্চমর্যাদার ব্যক্তির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাপোষণ করে থাকে। ইসলামের ইতিহাস জীবনবাজি ও কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ঘটনা আর দৃষ্টান্তে ভরা। যারা জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি, যারা বিভিন্ন জাতি-নৃগোষ্ঠীর ইতিহাস জানেন, যাদের ভেতরকার সুকুমার বোধ অটুট আছে, তারা প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বলয়ভুক্ত নেতৃত্বে ত্যক্ত-বিরক্ত, এর প্রতি তাদের ঘৃণা পরিষ্কার।

এমন এক বিরাজিত শূন্যতা যা স্বীয় অবস্থানে বেশ শক্তিশালীও। পৃথিবীতে দৃঢ়মূল আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত সুসংবদ্ধ সমাজের অনুপস্থিতি, সাংস্কৃতিক শুদ্ধতার অভাবে ভঙ্গুর ও জর্জরিত– ইসলামের শিক্ষা ও মূল্যবোধকে ধারণ ও লালন করার মতো সমাজ না থাকা ইসলামের দাওয়াতি সফলতার ক্ষেত্রে একটি ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির সমার্থক। এটি বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও ইসলামি জীবনযাপনের পক্ষে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, মানবজাতির জন্য যা খুবই জরুরি এমন বিষয়ে দীর্ঘদিনের শূন্যতা খুবই অস্বাভাবিক। এ শূন্যতার ফলে আরেকটি আন্দোলন সামনে চলে আসবে, যা মানুষকে বিভ্রান্তির পথ দেখাবে, যা বিশ্বাসগত বিচারে হবে বিকৃত, নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক উপাদানে ভরপুর।

যারা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন, তারা জানেন, যখন কোনো শক্তিশালী ইসলামি আন্দোলন মাঠে থাকে না, তখন একটি ভুল ও বিকৃত আন্দোলন সে জায়গাটি দখলে নেয়। যখন সেই বিভ্রান্ত আন্দোলন কোনো না কোনোভাবে কিছু চ্যালেঞ্জ উৎরে যায় এবং কয়েকটি ত্যাগের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারে, তখন দৃশ্যমান বাস্তবতায় নিজেদের মেকি উচ্চতা মানুষের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়; আর মুসলিম বিশ্বে ইসলামি শিক্ষার অভাবে যে বিকৃতি ও ভ্রান্তি বিদ্যমান, তা শনাক্ত করে দেয়, পৃথিবীর সমকালীন পরাশক্তিগুলোকে কিছুটা হলেও ঝাঁকুনি দেয়, জনপ্রিয় স্লোগানের আকর্ষণে মানুষের মাঝে একটি স্পন্দন জাগায়, প্রচারণার বদৌলতে নিজের সামান্য সফলতাকে অনেক বড় করে প্রদর্শনের সুযোগ পেয়ে যায়, তখন আর তাকে পায় কে ? বিশেষত, শিক্ষিত তরুণ ও অর্ধশিক্ষিতদের মাঝে তারা তুমুল সাড়া জাগাতে পারে। আর যারা কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্রে বিপথগামিতা, দীর্ঘদিনের জড়তা, বিলাসিতা আর অব্যাহত নীতিভ্রষ্টতার কারণে মর্মাহত তাদের অন্তরে এরূপ 'বৈপ্লবিক আন্দোলন' এর যাদুকরী প্রভাব সঞ্চারিত হয় যে, কোনো ধর্মতত্ত্ববিদের উপদেশ, প্রজ্ঞাবান গবেষকের লেখনী কিংবা যুক্তিবাদী

ব্যক্তির বিশ্লেষণ তাকে সে আকর্ষণ থেকে ফেরাতে পারে না; এমনকি জ্ঞানগর্ভ কোনো অনুসন্ধিৎসু পর্যালোচনাও তাকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়। হিজরি প্রথম শতকের খারেজিদের ইতিহাস, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকের বাতেনি ও ফেদাইনদের আন্দোলনের ইতিহাস, হাসান ইবন্ সাব্বাহর কাহিনী, যা তার তৎপরতাকেন্দ্র 'মৃত্যুদুর্গে' সংঘটিত হতো, এভাবে বুহতরি সৈন্যবাহিনী ও বিপ্লবীদের ইতিহাস যা ইসলামের নামেই বিস্তার লাভ করেছিল– এসব ইতিহাসের পুনর্পাঠ আজ সময়ের দাবি, যার প্রতিটিই মিথ্যাকে সত্যের মোড়কে আড়াল করে বারবার ছদ্মবেশ ধারণ করে জনগণের সামনে হাজির হয়েছে। অনুরূপভাবে, কিছু রাজনৈতিক স্বার্থনির্ভর সমকালীন বিপ্লব একদল নিবেদিতপ্রাণ তরুণকে তাদের পতাকাতলে সমবেত করতে সক্ষম হয়েছে। সে বিপ্লবের স্রোতে অনেক ধর্মাশ্রয়ী ও আদর্শবাদী সংগঠনও খড়কুটোর মতো ভেসে গেছে, কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনার আলোকে তাদের কর্মপন্থা ও চিন্তাধারা বিশ্লেষণের প্রয়োজন পর্যন্ত মানুষ ভুলে গেছে। কাজেই ইসলামের নামধারী এসব সংগঠনের কর্মকাণ্ডকে কুরআন-হাদিসের আলোয় বিচার করা হয়ে উঠেনি।

মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও চিন্তাবিদগণের মনে একথা ঝেঁকে বসেছে যে, একটি স্রোতকে মোকাবেলার জন্য আরেকটি সয়লাব চাই। একটি তুফানকে প্রতিহত করতে চাই তার চাইতে শক্তিশালী আরেকটি ঝড়। মুসলিম বিশ্বের বর্তমান দুরবস্থা সম্পর্কে বিনয়ের সঙ্গে বলতে চাই, অবশ্যই এটি এক অসহনীয় জড়তা, বিলাসিতায় গা-ভাসিয়ে উম্মাহ এক গভীর নিদ্রায় বিভোর। এ উম্মতের মধ্যে ঈমানি চেতনা প্রদীপ্ত দাওয়াত, বিশুদ্ধ আকিদা ও মহান চেতনার সুরক্ষায় দ্বীনের পথে সর্বস্ব বিলিয়ে দেবার মানসিকতা আজ ছিঁটেফোঁটাও নেই– এমনকি প্রতিরক্ষা ও সামরিক বিবেচনায় পরনির্ভরশীল। এটি নিশ্চয়ই একটি ভয়ানক পরিস্থিতির পূর্বাভাস, যে কোনো চটুল আন্দোলনে তরুণদের আকৃষ্ট হবার জন্য খুবই যুৎসই একটি পরিবেশ।

কারণ, বর্তমান পরিস্থিতির ওপর ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত তরুণ সমাজ উপযুক্ত ক্ষেত্র পাচ্ছে না। তারা সহজেই এমন আন্দোলনের শিকারে পরিণত হবে। কেননা, এতে তারা নিজেদের স্পৃহা ও প্রত্যাশার খোরাক লক্ষ্য করছে। যদিও এসব তৃষ্ণার্থ তরুণের জন্য এরূপ আন্দোলন আদতে সে মরীচিকার মতো, কুরআন যার বর্ণনা করেছেন এভাবে–

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّ وَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

'এর উদাহরণ বিজন মরুভূমিতে মরীচিকার মতো, তৃষ্ণার্ত মানুষ যাকে পানি ভেবে থাকে; যখন কাছে এসে দেখে বস্তুত সে কিছুই পায় না। সেখানে হাজির হবার পর সে আল্লাহ (তাঁর ফয়সালা)-কেই পায়; অনন্তর আল্লাহ তার হিসেব চুকিয়ে দিয়েছেন।'[১]

কিন্তু মানবজাতির প্রকৃতি, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা এটাই; যারা আধুনিক যুগে ইসলামের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবে এবং ইসলামের বিশুদ্ধ বিশ্বাসকে ধারণ করার পাশাপাশির এর প্রয়োজনীয়তাকে খাটো করে দেখে না, এর প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান রাখে, তার জন্য উক্ত বাস্তবতা পাশ কাটানোর কোনো অবকাশ নেই।

কুরআনের একটি আয়াতের মাধ্যমে আমি এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটির ইতি টানতে চাই। যে আয়াতে মহান আল্লাহ আনসার ও মুহাজিরদের অগ্রবর্তী একটি ছোট্ট দলকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, আর তাদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সমগ্র দুনিয়ার মানুষের ভাগ্য জড়িয়ে গিয়েছিল : "যদি তোমরা এমনটি না কর, তাহলে গোটা পৃথিবীতে নৈরাজ্য বিস্তৃত হবে, শুরু হবে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা।"

---

১. সূরা নূর, আয়াত : ৩৯

২২ সফর মোতাবেক ১৫ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সম্মেলনে সমাপ্তি অধিবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে বিভিন্ন কমিটির প্রস্তুতকৃত প্রস্তাবাবলি পাঠ করে শোনানো হয়। শায়খ আবদুল আজিজ আবদুল্লাহ বিন বাযের একজন প্রতিনিধি সমাপনী ভাষণ ও শায়খ ড. আবদুল্লাহ ওমর নাসীফের পক্ষ থেকে অভিনন্দনও জানানো হয়। শেষ পর্যায়ে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও নানা মহলের পণ্ডিতদের পক্ষ থেকে 'শুভেচ্ছা বক্তব্য' দেয়ার দায়িত্বটি আমার ওপর অর্পিত হয়।

এ বক্তৃতায় আমি সম্মেলনের আয়োজক এবং হারামাইনের সেসব পদস্থ দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গকে, যাদের ইতিহাসের ধারাপরম্পরায় এ-দায়িত্ব অর্পিত হয়ে আসছে; এর মর্যাদা ও করণীয় বিষয়ে প্রাসঙ্গিক কথাগুলো তাদের স্মরণ করিয়ে দিলাম। আমি বললাম, "প্রতিটি সম্মেলন এবং মুসলমানদের প্রতিটি জমায়েতের বিদায়ী পয়গাম হওয়া উচিত অভিনব, যা নিয়ে তারা স্ব স্ব দেশে ফিরে যাবেন, যাকে নেতৃত্বসূচক ও পথনির্দেশনামূলক পয়গাম বলা যেতে পারে। আমার মতে সে পয়গামটি হতে পারে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর সেই দৃপ্ত উচ্চারণ, যা তিনি বিভিন্ন গোত্র ও সমাজের কতিপয় ব্যক্তির ধর্মত্যাগ ও যাকাত দিতে অস্বীকৃতির প্রেক্ষাপটে ব্যক্ত করেছিলেন, যা ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে দিয়েছিল। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর এক কঠিন সময়ে যখন রাসুলের ইন্তেকালের পর খুব বেশিকাল অতিবাহিত হয়নি– তাঁর সেই ঈমানদীপ্ত উক্তি হাজার বছরের জন্য ইসলামকে শক্তিশালী ভিতের ওপর দাঁড় করায়। তিনি বলেছিলেন : 'আমি জীবিত থাকতে ইসলাম খণ্ডিত হবে ?' সকলকে আমি বলবো, তাঁর সেই ঐতিহাসিক উক্তিকে হৃদয়ে ধারণ করুন। একইভাবে এ উক্তির অন্তর্নিহিত আবেদনকে উপলব্ধি করুন। এ বিষয়েও শপথ গ্রহণ করুন যে, হারামাইনের মর্যাদায় যেন কোনো অপশক্তির আঁচড় না লাগতে পারে। পৃথিবীজুড়ে বিভিন্ন দেশে আমরা মুসলমানরা জীবিত থাকা অবস্থায় কেউ তার দিকে বাঁকা চোখে তাকাবে, এটা হতেই পারে না।"

সম্মেলনের কার্যক্রম শেষ হবার পর মেহমানদেরকে জেদ্দা থেকে বিমানে মদিনা নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হলো। সেখানে একদিন অবস্থানের পর ২৩ সফর মোতাবেক ১৬ অক্টোবরের জুমা মসজিদে নববীতে আদায় করে মদিনার গভর্নরের বাসায় সকলের আতিথেয়তা গ্রহণের কথা ছিলো। এরপর পুনরায় বিমানে জেদ্দা রওনা হবার সূচি প্রস্তুত আছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এ কাফেলায় শরিক হবার চাইতে (যেখানে রীতিনীতির আবশ্যকতা ও একদিন

অবস্থানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে) নিজের মতো করে মদিনায় উপস্থিতিকে প্রাধান্য দিলাম।

এক নিরাপদ শহর (মক্কা) এর বৈশিষ্ট্য, প্রতীক ও আবেদন

২৪ সফর ১৭ অক্টোবর মক্কার এক বন্ধু সেখানকার একটি বড় মসজিদে জুমার পর আমার ভাষণের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রধানত ভারতীয় লোকেরাই ছিল অগ্রভাগে। আমি ভেবেছিলাম, উর্দুতেই আলোচনা করতে হবে। গিয়ে দেখলাম, শায়খ আবদুল্লাহ বিন বায (তার মক্কার অফিস ও বাসা ওই মসজিদের অদূরেই অবস্থিত) বয়ান করছিলেন। আমি উপস্থিত হওয়ার পর তিনি আলোচনা সংক্ষিপ্ত করে দিলেন। আমি লক্ষ্য করলাম, বস্তুত এ বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানে আরব শ্রোতাই গরিষ্ঠ; তবে ভারতীয়দের সংখ্যাও উল্লেখ্যযোগ্য। ওখানে দেখলাম, কাতারের ইদারাতু ইহইয়ায়িত তুরাস– থেকে উন্নত ছাপায় প্রকাশিত আমার দু'টি গ্রন্থ صورتنان ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ও متضادتان প্রচুর রয়েছে। গ্রন্থগুলো আগতদের মাঝে বিতরণও হচ্ছিল।[১]

আমি সুরা ইবরাহিমের দ্বিতীয় রুকু[২] :

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ

"আর যখন ইবরাহিম (আ.) যখন দোয়া করলেন যে, হে আমার প্রতিপালক আপনি এ শহরকে (মানুষের জন্য) নিরাপদ জায়গা বানিয়ে দিন; আমাকে আর আমার সন্তান-সন্ততিকে এখানকার মূর্তিপূজা থেকে রক্ষা করুন।' তিলাওয়াত করলাম। পরে এ আয়াতের আলোকে বললাম– "এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মক্কা নগরীর পয়গাম, মহিমা ও নিদর্শনসুলভ পবিত্রতার বস্তুত চারটি অংশ রয়েছে।"

১. নির্ভেজাল তাওহিদের দাওয়াত যা وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ প্রতিভাত হয়, وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ পর্যন্ত আয়াতে স্পষ্ট হয়ে উঠে। শিরক ও মূর্তিপূজার বিশ্ববিস্তৃত অন্ধকারে তাওহিদের সামান্য ঝলকও

---

১. এতে আমার সুযোগ্য বন্ধু ও প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপক শায়খ আবদুল্লাহ ইবরাহিম আনসারীও ছিলেন, সকলের জন্য উপকারী এ গ্রন্থদ্বয় তিনি সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় প্রকাশ করে যাচ্ছিলেন।

২. সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ৩৫-৩৬

দৃশ্যমান হয়; বহু শতকের পর প্রথম বৈপ্লবিক সত্যের অভ্যুদয় ও নিঃশঙ্ক উচ্চারণ হারাম নির্মাতার এ পবিত্র জায়গা থেকেই উচ্চকিত হয়েছিল।

২. দ্বিতীয়ত ইবরাহিম (আ.) হারামবাসী ও নিজ সন্তানদের নামাযের যে শাশ্বত আহ্বান জানিয়েছিলেন এভাবে–

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ.

হে আমার প্রভু! আমি আমার সন্তানদের এমন এক প্রান্তরে (মক্কা) ছেড়ে যাচ্ছি, যেখানে ক্ষেত-ফসল জাতীয় কিছু নেই; তোমার পবিত্র ঘরের কাছে নিঃস্ব অবস্থায়, যাতে তারা নামায আদায় করে। খোদ এ জায়গাটিকে নির্বাচন করা হলো, যা ক্ষেত-খামার, ব্যবসা-বাণিজ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন।

وَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ এ চেতনাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। পৃথিবীর উর্বর, সুফলা, ক্ষেত-খামারে সজীব ও সভ্যতা-সংস্কৃতির পীঠস্থানকে [যেখান থেকে ইবরাহিম (আ.) মক্কার উদ্দেশে সফর করেন] বাদ দিয়ে এমন জায়গা কেন নির্বাচন করা হলো ? এখানে বায়তুল্লাহ আর ইবরাহিম (আ.) পরিবারের অধিবাস (আত্মিক ও শারীরিকভাবে)-এর জন্য কেন প্রাধান্য দেয়া হলো ?

সৃষ্টির পরিবর্তে স্রষ্টা, প্রকৃতির পরিবর্তে প্রকৃতির প্রভুর ওপর ভরসা ও আস্থা রাখার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, যা তার দোয়ায় এর প্রতিভাস লক্ষণীয়।

فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ.

"তুমি মানুষের অন্তরকে এমন করে দাও যেন এদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাদেরকে ফলমুল থেকে জীবিকা প্রদান করো যাতে তারা তোমার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারে।"

তিনি নমরুদের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার মধ্য দিয়ে নিজেই মুমিনসুলভ তাওয়াক্কুলের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন। তিনি সে প্রেক্ষাপটে দেখিয়ে দিয়েছিলেন কোনো সৃষ্টি, প্রকৃতি বা বস্তুর নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই, তারা স্রেফ স্রষ্টার নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য। আল্লাহর নির্দেশের বাইরে তারা স্বীয়

বৈশিষ্ট্য বাস্তবায়ন করে দেখাতে সক্ষম নয়। যেমনটি আগুনের বেলায় ঘটেছিল, সে নিজস্ব স্বভাবসম্মত উত্তাপ ছেড়ে শীতল হয়ে গিয়েছিল।

'আমি নির্দেশ দিয়েছি ওহে আগুন তুমি (আরামদায়ক) শীতল হয়ে যাও।'[১] মক্কাবাসী ও হারামের অধিবাসীদের উচিত এ বৈশিষ্ট্যকে বুকে ধারণ করা, আজীবন এ চরিত্র সযত্নে লালন করা। এটা তাদের কাছে মুসলিম উম্মাহর প্রত্যাশাও। কারণ, এ শহরকে 'বালাদুল আমিন' বা নিরাপদ শহর অভিহিত করা হয়েছে। পৃথিবীর হাজারো উত্থান-পতন, বিপ্লব-প্রতিবিপ্লব আর চড়াই-উৎরাই-এর কোনো আঁচ যেন এখানে না লাগে, এ শহর যেন চিরকালই নিরাপদ থাকে।"

এরপর আমি ইতিহাসের তথ্য, প্রাচ্যবিদ ও বিশ্লেষকদের উদ্ধৃতি দিয়ে, সহিহ হাদিসের বরাত দিয়েছি, যেখানে বলা হয়েছে, এ নগরীতে মূর্তিপূজা আমদানি করেছিলো ওমর ইবন লুহাই, যে লোকটি মূলত আরবের বাইরে থেকে আসা একজন বহিরাগত। এ লোকটি এখানে মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটিয়েছিল। হুজুর সা. বলেন, সে লোকটি এখন জাহান্নামে নিজের আতুড়ি (অন্ত্র ও নাড়িভূড়ি) টানাহেঁচড়ায় সময় পার করছে।[২] পাশ্চাত্যের খ্যাতিমান গবেষকদের অভিমতও এরকম যে, মক্কা আর তায়েফের বিখ্যাত প্রতিমা হুবল, লাত, মানাত, ওজ্জা জর্দানের প্রসিদ্ধ শহর পেটরা (Petra) ও ইরাক-জর্দানের এলাকা থেকে আমদানীকৃত।[৩] এসব প্রকৃতপক্ষে এ নিরাপদ ভূমির নিজস্ব কিছু নয়। মক্কা বিজয়ের পর বায়তুল্লাহ ও তায়েফ এলাকাকে প্রতিমামুক্ত করার মধ্যদিয়ে হযরত ইবরাহিম যে অবস্থার ওপর এর গোড়াপত্তন করেছিলেন, এটি সেই মূলে ফিরে এসেছে। হাদিসের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, আগামীতে চিরদিন এ পবিত্র নগরী প্রতিমা থেকে নিরাপদ ও পবিত্র থাকবে। ভালোভাবেই জেনে রেখো যে, এ শহরে মূর্তিপূজার ব্যাপারে শয়তান নিরাশ হয়ে গেছে।'[৪] এ ইবরাহিমী চেতনার প্রতীক এ নগরীর মর্যাদা, মাহাত্ম্য ও নিদর্শন চিরকাল অক্ষুণ্ন রাখা এবং সত্যের আহ্বায়ক হওয়ার যে বৈশিষ্ট্য সে ধারণ করে, তা সুরক্ষিত রাখা চাই। এটি এ জনপদের বাসিন্দাদের মর্যাদার অংশ আর অনন্য বিশিষ্টতা।

---

১. সূরা আম্বিয়া : আয়াত-৩৯
২. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ
৩. বিস্তারিত জানতে লেখকের 'নবীয়ে রহমত' গ্রন্থটির শিরোনাম যুক্ত অংশ 'মক্কা মে ভুতপুরস্তি আওর উস্‌কা আসর ছারে চাশমা ওয়া তারিখ' দেখুন।
৪. সুনান ইবন্ মাজা, আবওয়াবুল মানাসিক

মক্কা ও হারামের আবহ ও প্রতিক্রিয়া

বর্তমান যুগের উন্নতি, বহির্বিশ্বের বিভিন্ন প্রভাব, সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের রমরমা কারবার সত্ত্বেও হারামের চারপাশে তার স্বরূপ ও মহিমা আপন আভায় উজ্জ্বল। হারামের প্রাণজুড়ানো আলোকশোভা ও বরকত নাযিলের যে অপার্থিব লীলাক্ষেত্র। কবির ভাষায় তা এভাবে ব্যক্ত হয়েছে :

'এখনও নামে যেথা রহমতের বৃষ্টিধারা; সে বর্ষণের
ধারালো প্রপাত ধরণীকে বিমুগ্ধ করে রেখেছে।'

আরেফ রুমীর বলেন,

'কাবার পরে হরদম দেখো আলোর ঝলকানি, ইবরাহিমের
ভালোবাসায় এমন হলো জানি।'

একদিন হারাম থেকে ফেরার পথে ভারতীয় কিছু বন্ধু-বান্ধবের বাসার পাশে থেমে গেলাম। তারা কিছু কথা বলার অনুরোধ করলো। সে পরিপ্রেক্ষিতে হারামে হাজির হতে পারার সৌভাগ্য, এখানে দোয়া আর তাওয়াফের সুযোগকে (তারা যে সৌভাগ্য লাভে ধন্য হয়েছেন) যত বেশি সম্ভব কাজে লাগানোর ব্যাপারে সকলকে উৎসাহিত করলাম। আমি বিশ্বাস করি, হাজার বছর ধরে এ রহমতের ধারা বরাবরের মতোই চলমান ও বর্ষণমুখর রয়েছে। মুসলিম উম্মাহর যে যতো শীর্ষ ব্যক্তিই হোন (আত্মিক-আধ্যাত্মিক কিংবা অর্থ-বিত্ত বা রাজনৈতিক বিবেচনায়), সে এ ঘরের জিয়ারতের কাঙ্গাল, এ দরবারের সে ভিক্ষুক। সে এখানে এসে অজস্র রহমত-বরকতের সম্পদ নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারে। আমি আরও বলেছিলাম, "মুসলিমদের মধ্যে হযরত আবদুল কাদের জিলানী যে বিশ্বজোড়া গ্রহণযোগ্যতা ও খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন, তা কারও অজানা নয়; তিনিও এখানে দু'দুবার আগমন করেছেন। যখনই তিনি বায়তুল্লাহ প্রবেশ করতেন, আত্মহারা উদাস এক খোদাপ্রেমিকের বেশে তাকে দেখা যেতো। তিনি আল্লাহর প্রেমের শরাব পান করে এ কবিতাগুলো আবৃত্তি করতেন :

'ভিখারিরা আজ এসেছে গো তোমার দ্বারে
তোমার প্রেমপূর্ণ চেহারার একটুখানি ঝলকে দেখতে তারা পাগলপারা।
আমাদের থলের দিকে একটু হাত বাড়িয়ে দাও গো প্রিয়;
তোমার করকমল থেকে যে, রহমতের বারি ঝরে!'

তার মতো ব্যক্তিত্বের যদি এমন অবস্থা হয়, আমাদের কী দশা হবার কথা!'

২৪ সফর মোতাবেক ১৭ অক্টোবর সউদী আরবের শীর্ষ আলিম ও খুবই মর্যাদাবান ব্যক্তি রাবেতার চেয়ারম্যান এবং ফিকহ্ ও গবেষণা বিভাগের প্রধান শায়খ আবদুল আজিজ বিন আবদুল্লাহ আল-বায-এর পক্ষ থেকে তাঁর বাসায় মধ্যাহ্ন ভোজের বিশেষ দাওয়াত ছিল। ভাগ্যক্রমে, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্যের বন্ধুবর সাইয়িদ হামেদ ও প্রিয়ভাজন ডা. মুহাম্মদ ইশতিয়াক হোসাইন কুরাইশিও মক্কা এসেছিলেন। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে তিনিও শায়খ আবদুল আজিজের দাওয়াতে শরিক হন এবং বেশ খোলামেলাভাবে আলাপচারিতার সুযোগ হয়।

মদিনা তায়্যিবায় উপস্থিতি

২৫ সফর মোতাবেক ১৮ অক্টোবর রবিবার মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। স্নেহাস্পদ আবদুল লতিফ সাআতি জৌনপুরী, যিনি মক্কায় নিজের গুরুত্বপূর্ণ কাজে আগে থেকেই নিয়মিত আছেন, সম্মেলন এবং হারামের যেখানেই যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিতে তিনি ছুটে যেতেন। এ সময় পর্যন্ত কোনো সরকারি গাড়ি ব্যবহার করা হয়নি। তিনি আমাদেরকে মদিনায় যাতায়াত ও সেখানে থাকার বন্দোবস্ত নিজেই করলেন। আমরা বেশ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা গ্রহণ করলাম। সকাল ১০টার দিকে মক্কা থেকে রওনা হয়ে যাই। মক্কার নতুন রাস্তা তারিকুল হিজরাতের পথে অগ্রসর হলাম। এটি মদিনা যাওয়ার জন্য তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত পথ, সড়ক বেশ উন্নত, যা খুবই আধুনিক ও উন্নত রাষ্ট্রগুলোতে সচরাচর থাকে। পথে পথে যথারীতি মাইলফলক রয়েছে। আসা-যাওয়ার জন্য একমুখী রাস্তা হওয়ায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা অনেক কম। রাস্তার দুপাশে উঁচু লৌহজাল দিয়ে বেড়া তৈরি করে দেয়া হয়েছে যাতে উট ইত্যাদি পশু হঠাৎ করে পথের উপর উঠে না আসে। মোটকথা, হাজীসহ ভ্রমণকারীদের আরামের শীতল পানি ছিটানোর স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা, রাস্তায় নিরাপত্তাসহ সাধ্যমতো যাবতীয় বন্দোবস্ত করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে সৌদি সরকার ব্যয়-বাজেটের ক্ষেত্রে হাতখুলে যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দিয়েছে। এর উদাহরণ কয়েক শতকের ইতিহাসে বিরল।

এ পর্যায়ে আমার স্মৃতিতে তার প্রথম হজ আদায়কাল ভেসে উঠলো। ১৯৪৭ খ্রি. মোতাবেক ১৩৬৬ হিজরি। তখন জেদ্দা থেকে মদিনা অভিমুখে কোনো রাস্তা ছিলো না। চালকরা অনেকটা অনুমানের ওপর নির্ভর করে গাড়ি চালাতো এবং তাদেরকে প্রচণ্ড গরমে বিশ্রামের জন্য সুবিধামতো জায়গায় যাত্রাবিরতিও করতে হতো। মক্কা ও জেদ্দায় পর্যন্ত খাবার পানির সংকট থাকতো, টাকা দিয়ে পানি কিনতে হতো। অনেক সময় সেই কেনা পানিতেই

তৃষ্ণা নিবারণ, অজু-গোসল সবই সারতে হতো এবং এছাড়াও রাস্তা-ঘাটের দুর্ভোগ, নিরাপত্তাহীনতা ও বেদুইনদের উপদ্রব (লুটতরাজ, রাহজানি ইত্যাদি তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল) সউদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার আগে এ অঞ্চলের পরিব্রাজকদের ভ্রমণকাহিনী পড়লে অহরহ দেখা যেতো।[১]

সউদী সরকারের এ বৈপ্লবিক উন্নয়নের কথা স্বীকার না করা (যাবতীয় সত্যনিষ্ঠ পরামর্শ, বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা ও যথাযথ প্রত্যাশার সঙ্গে) খুবই অন্যায় এবং বাস্তবতা পরিপন্থী কাজ হবে। ঠিক চারঘন্টায় (রাস্তা তেল নেয়া ও নাস্তার জন্য সামান্য যাত্রা বিরতিসহ) আমরা মদিনা পৌঁছে যাই। এ দূরত্ব অতিক্রম করতে ১৯৪৭ সালে আমার এক দিন দু'রাত সময় পার করে দিতে হয়েছিল। আর আমার বড় ভাই ডা. সাইয়িদ আবদুল আলী ১৯২৬ সালের হজের সফরে উটে আরোহন করে এ পথ অতিক্রম করেছিলেন ১৩ দিনে। 'সে পথের দূরত্ব আজ কত সংক্ষিপ্ত হয়ে এলো!'

মদিনার দিনগুলো

মদিনায় আমার পুরনো ঠিকানা বুস্তানে নূরওলি থেকে অবস্থান করছিলাম, যা আবদুল গনি নূরওলির ফার্ম-এর অন্তর্ভুক্ত গ্রুপ অব কোম্পানির স্বত্ব। শুরু থেকেই সিদ্ধান্ত ছিলো, এখানে আগমনের উদ্দেশ্য কেবলই রাসূলের সকাশে হাজিরা দেয়া আর সালাম জানানো, কোনো সভা-সমিতিতে যোগ দেয়া হবে না। এ ধরনের কর্মসূচির দাওয়াত নিয়ে কেউ এলে তাকে অপারগতার কথা জানিয়ে না করে দেয়া হবে, কেবল রাবেতাতুল আদবিল ইসলামির বোর্ড অব ট্রাস্টির মিটিংয়ে যোগদান করা হবে। বিভিন্ন অসুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে এ সম্মেলন এ বছর কায়রোর পরিবর্তে মদিনায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ

---

১. হাসানপুর মুরাদাবাদের শাসক নবাব হাজী আহমদ হোসাইন ১৯০৪ খ্রি. হিজায সফর করেছিলেন। তিনি মক্কা পৌঁছার আগে এক জায়গায় যাত্রাবিরতি করেন। সেখানে আকস্মিকভাবে বেদুইনরা হামলা চালায়। তিনি লিখেছেন : "অস্ত্রধারী বেদুইনরা আমার আসবাবপত্র নিয়ে এদিক-সেদিক ছুটছিলো; পুরো কাফেলায় হইচই শুরু হলো। এদিকে বন্দুকের গুলির আওয়াজে এক বিভীষিকাময় পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। এভাবে দু'ঘন্টা চলার পর দুর্গ থেকে তুর্কি সেনাদের কয়েক প্লাটুন এসব ডাকাতদের প্রতিরোধের জন্য এগিয়ে আসে। কিছুক্ষণ পর তুর্কি সেনাদের হামলার মুখে বেদুইনরা পিছু হটে। তখন কাফেলার অবস্থা এতো সঙ্গীন যে, তা রীতিমতো অবর্ণনীয়, যেন ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ। কারও কোনো হুঁশ ছিল না, কেউ কাঁধে, কেউ কোমরে যার যার কিছু আসবাবপত্র নিয়ে দিকবিদিক ছুটছিলো। অনেকে তৈজসপত্র ছেড়েই পালাচ্ছিলো।" (সফরনামায়ে হেজায পৃ. ১০৫ কার্জন স্টিম প্রেস, দিল্লী)।

সম্মেলনগুলো সীমিত পরিসরেই হবে, যেখানে কেবল সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ লোকেরা অংশ নেবে, যাদের সংখ্যা ১০-১২ জনের মধ্যে। এ সম্মেলনে যোগদানের জন্য দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার শিক্ষক ও আল বা'ছুল ইসলামির সম্পাদক স্নেহাস্পদ মাওলানা সাঈদুর রহমান নদভী ও দারুল উলুমের অপর শিক্ষক, 'আর রায়িদ'-এর সম্পাদক মাওলানা ওয়াজেহ রশিদ নদভী মঙ্গলবার লক্ষ্ণৌ থেকে সময়মতো মদিনা পৌঁছে যাচ্ছেন। এদিকে পাকিস্তান থেকে এক পুরনো বন্ধু, শীর্ষস্থানীয় সাহিত্যিক, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার সাবেক মুহতামিম, জামিয়া আব্বাসিয়া ভাওয়ালপুরের শায়খ মাওলানা নাযেম নদভী করাচি থেকে আসছেন, তিনি জেদ্দা পৌঁছার খবর অবগত হলাম।

মসজিদে নববীতে হাজির হবার জন্যে স্নেহাস্পদ আবদুল লতিফের গাড়ি, স্নেহভাজন সাইয়িদ হাসান তারেক (টেলিফোন ইঞ্জিনিয়র, মদিনা)-এর সঙ্গ দেবার কারণে (হযরত শায়খুল হাদিসের ইন্তেকালের পর থেকে যতবার যতদিন মদিনায় অবস্থান করেছি, আমার জন্য তার আতিথ্য গ্রহণ অনেক স্বাচ্ছন্দময় ছিল) আছরের নামায ব্যতীত, যা কিনা শারীরিক দুর্বলতা ও তাড়াতাড়ির পড়ার কারণে আমি বাসায় পড়তাম, বাকি চার ওয়াক্ত নামায আমি মদিনার হারামেরই আদায় করতাম। গাড়ি বাবুসসালামের প্রধান ফটক পর্যন্ত পৌঁছে যেতো। তখন যারা পার্কিং নিয়ন্ত্রণ ও গাড়িগুলো মূল ফটক থেকে দূরবর্তী জায়গায় থামিয়ে দেয়ার দায়িত্ব পালন করতো, তারা গাড়ীটিকে একেবারে দরোজা পৌঁছে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলো। অভ্যাসমতো এশা ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়টা মসজিদে নববীতে কাটাবার সুযোগ হয়েছে, যা সংক্ষিপ্ত তবে খুবই মূল্যবান সময়।

এবার মদিনায় রাসুলের কাছে হাজির হবার পরিপ্রেক্ষিতে ইকবালের দু'টি পংক্তি অনিচ্ছাকৃতভাবেই আওড়াতাম :

> "নিঃস্ব আর হৃতসর্বস্বের আর্তনাদ তুমি শুনছো, পৃথিবীর কোথাও হৃদয়কে যে বেঁধে রাখতে পারি না! আমরা বঞ্চিতদের কেবল তুমিই ঠিকানা; অনেক আশা নিয়ে ছুটে এসেছি তোমার পানে।"

সম্মেলনের প্রতিনিধি ও বাইরের মেহমান সরকারি আয়োজনে জুমা দিন বিদায় হয়ে গেলো। অনেকেই ভেবেছে, আমিও তাদের মতোই রুটিন সফর শেষ করে যথারীতি ফিরে গিয়েছি। আমি যে মদিনায় হাজির আছি, সেটি

সাধারণত বন্ধুরা অবগত নন। তারা পুরনো রীতিমাফিক আছর ও মাগরিবের নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে এসে উপস্থিত হতো আর চলেও যেতো। তাদের মধ্যে ওলামায়ে কেরাম, সাহিত্যিক, মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ভারতীয় বন্ধু-বান্ধবসহ আরও অনেকে ছিলেন; বিভিন্ন সাহিত্যসংস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত কেউ কেউ সাধ্যমতো দু-একটা সাহিত্য সেমিনারে অংশ গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়িও করেছেন কিন্তু তাদের কাছে অপরাগতা জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

রাবেতা আলমে ইসলামির কয়েকটি সভা

২৮-২৯ সফর মোতাবেক ২১-২২ অক্টোবর বুধবার মদিনার উপকণ্ঠেই অবস্থিত জামিয়া ইসলামিয়া মদিনা মুনাওয়ারা শিক্ষক ড. আবদুল বাসেত বদর এর বাসায় রাবেতার বৈঠক শুরু হলো। বুধবার সকালে ও রাতে পৃথক দু'টি অধিবেশন নির্ধারিত ছিল। বৃহস্পতিবার এশার পর একটি সাহিত্য আসর অনুষ্ঠিত হয়– যেখানে মদিনা মুনাওয়ার বেশ কিছু কবি-সাহিত্যিক উপস্থিত হন, যাদের মধ্যে কবি বাহাউল আমিরীও এসেছিলেন, যিনি রাবেতার একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য মক্কা থেকে এ সভায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে তাঁর আগমন। যোগাযোগের বিড়ম্বনার কারণে কিছু দেরিতে হলেও মাওলানা নাজিম নদভীও উপস্থিত হলেন। তিনিও নিজের কিছু আরবি লেখা পড়ে শোনালেন আর বাহাউল আমিরী সাহিত্য বিষয়ে একটি বেশ চমৎকার ও মূল্যবান বক্তৃতা উপস্থাপন করেন। এ সপ্তাহে জুমার নামায মসজিদে নববীতে আদায়ের সৌভাগ্য লাভ হয়। সেদিনই আছরের নামাযের পর খানিকটা দেরি করে জেদ্দার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা পর রাত সাড়ে নয়টায় জেদ্দা পৌঁছে গেলাম।

জেদ্দায় একদিনের যাত্রাবিরতি ও একটি সভায় অংশগ্রহণ

জেদ্দায় স্রেফ একদিন তথা শনিবার সময় যাপন করা হলো। দিনটি বেশ ব্যস্ততার মধ্য দিয়েই গেছে। এ সময় আমার ভাগিনা সাইয়িদ মিসবাহুন্নবী হাসানীর ঘরেও যাবার কথা রয়েছে। অন্যদিকে, দুপুরে আমার খুবই ঘনিষ্ঠ–বলা যায় অভিন্নহৃদয়– বন্ধু শায়খ মুহসিন আহমদ বারুম, স্বত্বাধিকারী 'দারুশ শরক' এর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজের দাওয়াত হবার সম্ভাবনা ছিল। জেদ্দা গিয়ে জানতে পারলাম, এখানে আমাকে নিয়ে একটি বড় সেমিনারের এলান হয়ে গেছে, শহরে এ বিষয়ে আলোচনাও নাকি চলছে। আমাকে মোটামুটিভাবে হয়তো বলা হয়েছিল, সেটা আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।

আমি ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা না করে তাদেরকে 'ঠিক আছে' বলে দিয়েছিলাম। এদিন সাড়ে নয়টায় রিয়াদ এবং সেখান থেকে আরেক বিমানে দিল্লী যাবার কথা রয়েছে। সে জন্যে দুই ঘন্টা আগে বিমান বন্দরে উপস্থিত হতে হবে। তাহলে আলোচনা কীভাবে করবো ? কিন্তু তারা তো নাছোড় বান্দা! সবাই বললো, "আজকে আর কোনো ওযর-আপত্তি চলবে না। সেমিনারের ব্যাপারে ব্যাপক প্রচার হয়েছে, বক্তার পরিচিতি সবাই জেনে গেছে।" অথচ আমি এটুকু পর্যন্ত যাচাই করতে পারিনি প্রকৃত আয়োজক কারা? কেউ কেউ বললো, নাদওয়াতুশ শাবাব আল ইসলামি (ওয়ামী), কেউ কেউ অন্য কোনো সংগঠনের নাম বলছে। বন্ধুরা বললেন, "আপনি চিন্তা করবেন না; প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আগেভাগে বিমানে পৌঁছে যাবে। আপনি বিমান বন্দরে মাত্র এক ঘন্টা আগে গেলেও কোনো সমস্যা নেই।"

ঘটনাক্রমে মসজিদে মনসুর শোয়াইবি – যেখানে আলোচনা হবার কথা রয়েছে – বিমানবন্দরের পথেই পড়ে। সেখান থেকে গাড়িতে বিমানবন্দর ১০-২০ মিনিটের দূরত্ব। আল্লাহর ওপর ভরসা করে মাগরিবের আগে মসজিদের উদ্দেশে রওনা দিলাম। এটি জেদ্দার অনেক বড় মসজিদগুলোর অন্যতম। মাগরিবের আযানের সময় সেখানে পৌঁছে গেলাম। দেখলাম, মসজিদ মুসল্লিতে কানায় কানায় ভর্তি। লোকজনকে বেশ আগ্রহী ও উৎসাহী মনে হলো। মসজিদে ইমাম খতিব শায়খ আলী বসফর যেভাবে বক্তার পরিচিতি ঘোষণা করছেন, তাতে বুঝতে পারলাম তিনি 'ফী মাছিরাতিল হায়াত' (কারওয়ানে যিন্দেগীর আরবি অনুবাদ) বইটি পড়েছেন। আমি সূরায়ে মায়েদার এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করলাম।

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের জীবনব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ করে দিলাম আর তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করলাম।"[১]

আয়াত তিলাওয়ার পর আমি আলোচনা শুরু করলাম। আমার অনুভব হলো, এ বিষয়বস্তু এবং আল্লাহ রহমতের ধারা পরস্পরের যুক্ত হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। প্রথমেই আমি বললাম, দ্বীন তার চূড়ান্ত পর্যায় বা পরিণতিতে উপনীত

১.সূরা মায়েদা : আয়াত-৩

হওয়া, খতমে নবুওয়তের মতো অসামান্য তাৎপর্যমণ্ডিত বিষয়, দ্বীনের সুরক্ষা, আল্লাহর পক্ষ থেকে ধর্মের পরিপূর্ণতা ও চূড়ান্ত সিলমোহর প্রাপ্তি এর স্বপক্ষে এমন নিরাপত্তা, যা অতীতের কোনো ধর্মাবলম্বীদের ভাগ্যে জোটেনি। জনৈক ইহুদি আলিম হযরত ওমরের সামনে যে বিষয়ে খুবই আফসোসের সঙ্গেই অনুভূতি ব্যক্ত করেছিলেন। আর এটি না থাকায় অতীতের আসমানী ধর্ম ও শরীয়তগুলোকে সময়ের বাঁকে বাঁকে বিভিন্ন কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছে। সেসব ধর্মের সংশ্লিষ্ট ধর্মাবলম্বী আলিমদের মেধা, প্রতিভা ও পরিশ্রম ব্যয় হচ্ছে এর বিকৃতি ও বাতিল করার কাজেই। ধর্ম ও মতবাদসমূহের ইতিহাস পর্যালোচনা সংক্রান্ত বিশ্বকোষের পাতায় পাতায় আপন- আপন ধর্মতত্ত্ববিদদের স্বীকৃতিতেই এর প্রমাণ মেলে।

আমি আরও বলেছি[১], "যে পরিস্থিতি-পরিপার্শ্ব, প্রেক্ষাপট-পটভূমিকায় ঘোষণা এসেছে– 'আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম; তোমাদের জন্য স্বীয় অনুগ্রহকে পূর্ণতা দিয়েছি"– সেই বিদ্যমান আবহে চারপাশের সমাজবাস্তবতার অন্তরচিত্র, মানসিকতা, মনস্তত্ত্ব ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এমন ঘোষণার প্রতিকূলেই ছিলো। বিদায় হজের সমাবেশ ও আরাফাতে অবস্থানের অল্পদিনের ব্যবধানে তাদের নবীর চিরবিদায় সংবাদ শুনতে হলো। এরপরই যে সে নবীর বহু অনুসারী এ দ্বীনকে 'বিদায়' জানাবে তার নিশ্চয়তা কোথায় ? হাজার হাজার মুসলমান যে– আল্লাহ রক্ষা করুন– ধর্ম ত্যাগ করতে পারে, তাদের ব্যাপারেই কী বলা হবে ? যে আলিমুল গায়বের কাছে অনাগত ভবিষ্যতও অতীতের মতোই দৃশ্যমান, তিনি কী করে এমন সুসংবাদ দিলেন ? যেমন– এরূপ ঘোষণা কুরআনের সূরা নছর-এ দেয়া হয়েছে : 'আল্লাহর দ্বীনে লোকেরা দলে দলে প্রবেশ করবে'। অথচ কোথাও এ ধর্মত্যাগ করে যারা বেরিয়ে যাবে তাদের কথা উল্লেখ করা হলো না! এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, দলে দলে সাহাবিরা ইসলাম ত্যাগ করার তথ্য স্রেফ গালগল্প ও শয়তানের মন্ত্রণাপ্রণোদিত অবাস্তব কথা।"

এরপর আমি বললাম, أَتْمَمْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي এর দাবি এটাও যে, আমরা সামগ্রিক জীবনে আকিদা-বিশ্বাস, আচার-আচরণ, সংস্কৃতি, জীবনবোধ ও নৈতিকতার সর্বক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা ও এর নির্ধারিত সীমা

১. আমি বুঝতে পেরেছি, আলোচনার পর আমাকে খোমেনির আন্দোলন ও ইরানি বিপ্লবের বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে অথচ এ সম্মেলনে এমন সময় সুযোগ থাকবে না।

মেনে চলবো। জীবন ও সংস্কৃতিতে পশ্চিমাদের অনুসরণ-অনুকরণ করবো না। মহান আল্লাহ তো আমাদেরকে ধর্মবিশ্বাস ও মৌলিক বিধানের পাশাপাশি একটি স্বতন্ত্র সভ্যতা ও সংস্কৃতি দান করেছেন। এর বাস্তব রূপায়ন আমাদের দায়িত্ব।

আল্‌হামদুলিল্লাহ! সুস্থতর প্রশান্তিময় পরিবেশে আলোচনা সমাপ্ত হয়। ইমাম সাহেব ঘোষণা করলেন, শায়খের রওনা হবার সময় একেবারে সন্নিকট। দয়া করে করমর্দন, গলাগলি ইত্যাদির চেষ্টা করবেন না। তিনি আমাকে আলাদা একটি দরোজা হয়ে বেরিয়ে আসার ব্যবস্থাও করে দিলেন। কিন্তু উৎসাহী তরুণদের একদল তবুও অনেকটা ঝাঁপিয়ে পড়লো, বড় কষ্টে তাদের বেষ্টন ভেদ করে বের হলাম। বিমানবন্দরের দিকে রওনা হয়ে গিয়েছি। আমার ঘনিষ্ঠজন মুহাম্মদ ওসমান রিয়াদ পর্যন্ত বিদায় জানাতে চলে এসেছিলেন। সেখানে পরবর্তী বিমানে তুলে দিয়েই বিদায় নিয়েছেন। বেশ আরামে ও নিরাপদে আমরা পরের দিন রবিবার সকাল সাড়ে আটটায় দিল্লী পৌঁছে যাই।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দু'টি সেমিনার, একটি ভয়ানক দুর্ঘটনা

দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামায় রাবেতা আদবে ইসলামীর সেমিনার

১৯৮৭ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে নাদওয়াতুল উলামার সহকারী পরিচালক স্নেহাস্পদ মাওলানা কাযী মুহাম্মদ মুঈন উল্লাহ নদভীর সন্তানদের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে ইন্দোর যাওয়ার কথা ছিল। বন্ধু-বান্ধব ও নিকট আত্মীয়দের একটি দলের সাথে ভূপাল হয়ে ওখানে পৌঁছি। দু'দিন মনোরম পরিবেশে কাটিয়ে আবার ভূপাল ফিরে আসি। পুরনো বন্ধু মাওলানা হাফিয মুহাম্মদ ইমরান খান সাহেব নদভী ইন্তেকাল করার তৃতীয় দিন ১৯৮৬ সালের অক্টোবরে ভূপাল গিয়েছিলাম। এরপর আর যাওয়া হয়নি। এ কারণে ১ দিন ১ রাত (৭নভেম্বর, ১৯৮৭) ওখানে অবস্থান করা প্রয়োজন মনে করি। মরহুম মাওলানার সন্তান-সন্ততি, পরিবারের শোকসন্তপ্ত সদস্যদের সমবেদনা জ্ঞাপন, বন্ধু বান্ধবদের সাথে সাক্ষাৎ ও তাজ মসজিদে মাগরিবের পর জনসমাবেশে বক্তৃতা প্রদানের কর্মসূচি স্থির হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মধ্য প্রদেশ ওয়াক্ফ বোর্ডের সভাপতি মাওলানা সাঈদ মুজাদ্দেদী। সমাবেশে বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের দাওয়াতী ও ইসলাহী কর্মকাণ্ডে দৃঢ়ভাবে স্থির থাকা, ধর্মীয় ও জাতীয় দায়িত্ব পালন এবং 'শ্রেষ্ঠ জাতি'-এর মর্যাদায় উত্তীর্ণ হওয়ার উপর সবিশেষ জোর দেয়া হয়। এ দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের বাছাই করেন এবং নির্দেশনা প্রদান করেন। সময়ে সময়ে প্রতিপক্ষ শক্তি কর্তৃক বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরী করে এ দায়িত্ব পালনের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরী হয়।

এ সফরে অথবা ২/১দিন আগে জানা গেল যে, দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামায় অবস্থিত 'রাবেতা আদবে ইসলামী'-এর ভারতীয় কেন্দ্রীয় দফতর ১১-১২ নভেম্বর একটি সেমিনারের আয়োজন করেছেন। সেমিনারের বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয় 'উর্দূ সাহিত্যে হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রহ.)-

এর আন্দোলনের প্রভাব'। এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সাহিত্যিক, পণ্ডিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বীনি ও সাহিত্য মেজাযের নামকরা অধ্যাপকবৃন্দের নামে আমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করা হয়। সেমিনারে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক প্রতিনিধি অংশ নেন। অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বিষয়বস্তু নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন 'রাবেতা আদবে ইসলামী'-এর সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ রাবে হাসানী নদভী ও অফিস ইনচার্জ মাওলানা আবদুন নূর (নূর আমিন)। সেমিনার সফল করার ক্ষেত্রে নূর আমিন সাহেবের মেহনত ও মৌলিক প্রচেষ্টা ছিল চোখে পড়ার মত।

সেমিনার অনুষ্ঠানের তারিখের মাত্র ১ দিন পূর্বে লক্ষ্ণৌ পৌঁছি। ১১ নভেম্বর দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলূম শিবলী নুমানী পাঠাগারের জমকালো ভবনে সেমিনার শুরু হয়। রাবেতার সেক্রেটারী মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ রাবে হাসানী নদভী প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। এতে তিনি 'রাবেতা আদবে ইসলামী'-এর প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ও রাবেতার কর্মপরিধির উপর আলোকপাত করেন। অতঃপর সাইয়িদ সাহেবের আন্দোলনের ফলে উর্দূ ভাষা ও সাহিত্যের উপর যে প্রভাব সৃষ্টি হয় এবং এর দ্বারা জনগণের যে উপকার সাধিত হয়, তার উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হয়।

প্রতিবেদন উপস্থাপন শেষে সভাপতি হিসেবে উদ্বোধনী ভাষণে আমি আন্দোলন ও ভাষার মধ্যকার যে শক্তিশালী ও চিরস্থায়ী সম্পর্ক রয়েছে, তা বিশদভাবে উল্লেখ করি। কোন সংশোধনধর্মী, রাজনৈতিক গঠনমূলক ও গণবিপ্লব ভাষাকে উপেক্ষা করে সফল হতে পারে না। ভাষা সবচে' বড় হাতিয়ার এবং জনগণের মন মানস পর্যন্ত পৌঁছার সহজ পথ। এভাবে ভাষাও কোন শক্তিশালী আন্দোলনের মাধ্যমে ব্যাপকতা, প্রভাব ও শক্তি নিয়ে অনেক সময় বছর ও মাসেই শত বছরের পথপরিক্রমা সম্পন্ন করতে পারে। আন্দোলনের দ্বারা ভাষা এমনভাবে সমৃদ্ধ ও পুষ্ট হয় যা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সম্ভব নয়। দুনিয়ার কোন বিপ্লব ভাষাকে বাদ দিয়ে হয়নি। বিশ্বব্যাপী ইসলাম যে বিপ্লব নিয়ে আসে, তার পেছনে ভাষার ভূমিকা ছিল অনন্য। অন্য কোন ধর্মের দাওয়াতে এরূপ ছিল বলে মনে হয় না। ভাষাজ্ঞানে পারঙ্গম ওয়ায়েয ও বক্তাগণ ছিলেন ইসলামের শ্রেষ্ঠ মুখপাত্র ও দাঈ। মূলতঃ ভাষা কোন পরিকল্পনা বা সমঝোতার মাধ্যমে তৈরীও হয় না, উৎকর্ষও লাভ করতে পারে না। এর জন্য ৩টি সৃষ্টিধর্মী উপাদান জরুরি (ক) প্রয়োজন, (খ) উদ্দীপনা ও (গ) উপকারিতা। উর্দূ ভাষার উদ্ভব, জনগণের ভাষায় পরিণত হওয়া ও সমৃদ্ধির ক্রমবিকাশধারায় বুযুর্গানে দ্বীন ও

সূফিয়ায়ে কেরামদের মৌলিক অবদান রয়েছে। 'গুলে রা'না'-এর রচয়িতা সূফীবাদ, সূফীদের ইতিহাস ও বুযুর্গানে দ্বীনের বাণীগুচ্ছের যে বিবরণী পেশ করেন, ইতিহাসবিদ ও প্রবন্ধকারগণ অত্যন্ত সম্মানের সাথে উক্ত লেখককের বক্তব্য ও মন্তব্য হুবহু উদ্ধৃত করতে কার্পণ্য করেননি। এমন নমুনা অন্য কোন মনীষীর ব্যাপারে ঘটেনি।[১]

এর মাধ্যমে মর্যাদাবান সূফীদের এবং ইসলামের মুবাল্লিগদের বক্তব্যকে জনসাধারণের অন্তরে বিস্তার করাই ছিল উদ্দেশ্য। জ্ঞানের অহমিকা এবং ফার্সী ও আরবী ভাষায় নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না মোটেই। এ জন্য এমন একটি ভাষার প্রয়োজন ছিল, যা সাধারণের জন্য বোধগম্য ও আরবী-ফার্সী ভাষার দুর্বোধ্য শব্দাবলি থেকে মুক্ত এবং পড়ালেখা না জানা মানুষও যাতে এ ভাষা সহজে বুঝতে সক্ষম হয়। এ চেতনার ফলশ্রুতিতে উর্দু ভাষার জন্ম হয়, যা পরবর্তীতে বিস্ময়কর উৎকর্ষ লাভ করে, যার সন্ধান আমরা হিজরী নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে গুজরাটের মত কেন্দ্রীয় রাজ্য থেকে দূরবর্তী এলাকাতে পাই।[২]

দাওয়াতের পর দ্বিতীয় অধ্যায় হচ্ছে আন্দোলন। এর জন্য এমন ভাষা প্রয়োজন হয়, যার মাধ্যমে উদ্দীপনাকে জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া যায়। সৈনিক ও জানবাজ যোদ্ধা তৈরীতে ভাষার রয়েছে সহায়ক ভূমিকা। এ আন্দোলন জ্ঞানচর্চা ও চিন্তার জগতে আবদ্ধ এবং বিশেষ কোন শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর প্রেক্ষিতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ এবং তাঁর সহযোদ্ধাগণ জনগণের বোধগম্য ভাষায় ধর্মীয় ও ইসলাহী বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তাঁরা সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত গ্রন্থাবলির মাধ্যমে আকিদার সংশোধন, অনৈসলামিক রসম ও রেওয়াজের মূলোৎপাটন এবং সমাজ সংশোধনমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে যুগান্তকারী বিপ্লব সৃষ্টি করেন। এমন উদাহরণ নিকট অতীতের কোন ইসলাহী আন্দোলনে পাওয়া কঠিন। তাঁরা রণক্ষেত্রেও কবিতা আবৃত্তি করে জিহাদের চেতনাকে সতেজ ও চাঙ্গা করতে দ্বিধা করেননি। মাওলানা ইসমাইল শহীদ (রহ) লিখিত 'তাকভিয়াতুল ঈমান', মাওলানা খুররম আলী বলহূরী লিখিত 'নসীহাতুল মুসলিমিন' ও তাঁর জিহাদী সঙ্গীত (সৈন্যদের কুচকাওয়াজের সময় পঠিত হয়) এবং মাওলানা কেরামত আলী জৈনপূরী (রহ.)-এর আকীদা ও দ্বীনি মাসায়েল সংক্রান্ত উর্দূ গ্রন্থের প্রসঙ্গ নমুনা হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব গ্রন্থের মাধ্যমে কেবল

১. উর্দূ কবি 'গুলে রা'না, দারুল মুসান্নিফিন, আযমগড়, ভারত, পৃ. ১৪-১৭
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৯

লাখ নয় কোটি কোটি মানুষ সামগ্রিকভাবে উপকৃত হয় এবং তাঁদের জীবনে বিপ্লব নিয়ে আসে।

এ বাস্তবতা, মানবীয় সহজ উদ্দীপনা, মুসলমানদের সংশোধনের প্রেরণা (এ আন্দোলনের পূর্বে) হাকিমুল ইসলাম হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর দু'জন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সন্তান হযরত শাহ আবদুল কাদের (রহ.) ও হযরত রফিউদ্দিন (রহ.)-কে পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করতে সাহস ও উৎসাহ যুগিয়েছিল। আমি আমার তুলনামূলক অধ্যয়ন এবং যেসব ভাষার সাথে আমার পরিচিতি রয়েছে এর প্রেক্ষিতে আমি বলতে পারি যে, যত ভাষায় পবিত্র কুরআনের তরজমা বেরিয়েছে, তার মধ্যে হযরত শাহ আবদুল কাদের (রহ.)-এর অনুবাদশৈলী সফল ও শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছে। শাহ সাহেবের তরজমায় পবিত্র কুরআনের রূহ, শক্তি ও উষ্ণতা এমনভাবে প্রকটিত হয়েছে, যা স্বয়ং আরবী ভাষায় লিখিত অনেক তরজমা ও তাফসীরে নেই– এ কথাটি আমি আমার বক্তৃতায় উদাহরণসহ পেশ করি। শাহ আবদুল কাদের (রহ.)-এর অনুবাদ তাঁর অনুসারী ও শিষ্যদের প্রচেষ্টায় প্রথম ছাপা হয় এবং জনগণ তা আগ্রহভরে লুফে নেয়।

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনও ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ভাষাভিত্তিক গোঁড়ামির উর্ধে উঠে উর্দূ ভাষাকে সর্বসাধারণের সহজবোধ্য ও প্রভাববিস্তারকারী বাক্য দ্বারা গতিময়তা লাভ করে। সুতরাং 'বিপ্লব জিন্দাবাদ' শ্লোগানটির অদ্যাবধি কোন বিকল্প তৈরী হয়নি। ঠিক এমনিভাবে 'শহীদ' শব্দের মধ্যে যে ভাবগাম্ভীর্য, মর্যাদা ও কার্যকারিতা রয়েছে, তা অন্য কোন শব্দে নেই। হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর দাওয়াত, আন্দোলন এবং তাঁর সতীর্থদের লিখিত উর্দূ রচনাবলির বিষয়বস্তু, ভাষাশৈলী এবং উর্দূ সাহিত্যে তার গভীর প্রভাবের বিষয়ে আরো ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

সময় স্বল্পতা, আয়োজক-ব্যবস্থাপকদের অসামান্য দায়িত্ব ও ব্যস্ততা সত্ত্বেও মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, আরবী, ফার্সী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যানবৃন্দ এবং গবেষণামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত পণ্ডিতগণ সেমিনারে যোগ দেন। গোটা ভারত জুড়ে জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব জনাব সাইয়িদ সাবাহুদ্দিন আবদুর রহমান এমএ পরিচালক দারুল মুসান্নিফিন ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দূ বিভাগেরে সাবেক চেয়ারম্যান খাজা আহমদ ফারুকী এতে অংশ নেন। ফারুকী সাহেবের লিখিত 'উর্দূতে ওহাবী সাহিত্য'

নিবন্ধটি সম্মেলনে উপস্থাপন করা হয়। উক্ত নিবন্ধটি আমি ১৯৬৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাচ্যবিদদের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পাঠ করেছিলাম।[১]

ভারতের ৮টি খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের (লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, আলীগড়, বেনারস, দিল্লী, নেহেরু, জামিয়া মিল্লিয়া ও কাশ্মীর) বিভাগীয় প্রধানগণ, রিডার্স ও প্রথিতযশা শিক্ষকবৃন্দ এতে শরীক হন। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে অনেকে ছিলেন নদওয়ার ডিগ্রীপ্রাপ্ত প্রাক্তন ছাত্র। কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন স্বয়ং উপাচার্য ড. মুশিরুল হক। প্রতিনিধিগণ সেমিনারে আসার সময় স্ব স্ব নিবন্ধ লিখে আনেন। অধিকাংশ গবেষকের প্রবন্ধের বিষয়বস্তু কেন্দ্রীভূত ছিল হযরত শাহ ইসমাইল শহীদ (রহ.)-এর 'তাকভিয়াতুল ঈমান'-এর উপর। দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামার শিক্ষাপরিচালক ও মক্কাস্থ উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর ড. আবদুল্লাহ আব্বাস নদভী বিভিন্ন নিবন্ধের উপর প্রাণবন্ত আলোচনা পেশ করেন। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধি ও অতিথি পণ্ডিতগণের পরামর্শ ও প্রস্তাব হলো হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর আন্দোলনের ব্যাপারে প্রস্তুতি নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা এবং দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামায় সাইয়িদ সাহেবের আন্দোলনের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভাগ খোলা।

লাইব্রেরী হলের দ্বিতীয় তলায় হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রহ.) এবং তাঁর আন্দেলনের উপর লিখিত গ্রন্থসমূহ ও পাণ্ডুলিপির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এটি ছিল সেমিনারের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। খুব সম্ভবত নাদওয়াতুল উলামার পাঠাগারে এ বিষয়ের উপর মুদ্রিত গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপির যে ভাণ্ডার, তা উপমহাদেশের মধ্যে বৃহত্তর। রায়বেরেলী, টুংক ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় এটা সম্ভব হয়। পারিবারিক চিঠি-পত্রাদি, দস্তাবেজ ও সাইয়িদ আবদুল হাই (রহ.)-এর পাঠাগার (বর্তমানে এগুলো দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামার পাঠাগারে রক্ষিত আছে।) থেকে এখানে এনে রাখা হয়। নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর এত বিপুল গ্রন্থ ও দস্তাবেজ যোগাড় করা আসলে দুঃসাধ্য নাহলেও সহজসাধ্য ছিল না। রুচিবান প্রতিনিধি ও অভ্যাগতবৃন্দ অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে এসব দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি ও পত্রাবলি পরিদর্শন করে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। প্রদর্শনীর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর পরিসরে আরো একটি সেমিনার করার ইচ্ছে ও আকাঙ্খা শক্তিশালী হয়।

---

১. নিবন্ধের উর্দূ তরজমা 'চেরাগে রাহগুযার' এ ছাপা হয় (পৃ. ১০৯-১৪২)

প্রবন্ধ ও বক্তৃতায় অনেকের ধারণা জন্মে যে, সাইয়িদ সাহেবের আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল কেবল 'স্বাধীনতা সংগ্রাম'। কিছু লোকের ভুল ধারণা ছিল যে, এটি রাজা রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে একটি সীমাবদ্ধ ও স্থানীয় আন্দোলন। উল্লেখ্য যে, পাঞ্জাবের মুসলমানগণ দীর্ঘদিন যাবত নিগৃহীত অবস্থায় ছিলেন। এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনে মাওলানা মুহাম্মদ আরিফ নদভী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যের উপর জোরদার বক্তব্য দ্বারা প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, এ আন্দোলন ছিল বহুমুখি ও সামগ্রিক। সেমিনারের শেষ অধিবেশনে সাইয়িদ সাহেবের পত্রাবলির উদ্ধৃতি সহকারে আমি আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট করা প্রয়োজন মনে করি।

আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করি যে, হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল কেবল আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন, জিহাদী চেতনার পুনরুজ্জীবন, আল্লাহর আহকাম ও শরয়ী আইনের প্রবর্তন এবং এর ভিত্তিতে খিলাফতে রাশেদার আদলে একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠা। তিনি তাঁর বিভিন্ন চিঠিতে স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করে বলেন 'যেসব এলাকা ইংরেজগণ দখল করে নিয়েছে, এগুলো স্বাধীন করা এবং এখান থেকে আফগানিস্তান ও তুর্কিস্তান পর্যন্ত একটি স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা করা সময়ের দাবি'। আমি আমার সভাপতির বক্তৃতায় উল্লেখ করি, "ভারতের বাইরে আমার বহু সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে যোগ দান করি এবং আলোচনায় অংশ নেয়ারও সুযোগ হয় কিন্তু এ সেমিনারে যে জ্যোতির্ময়তা, সাফ কথায় যে রূহানিয়াত চাঙ্গা হয়ে ওঠে অন্য কোন সেমিনারে তা হয়নি। এটা সম্ভব হয়েছে আন্দোলনের ত্যাগী ও জানবায কর্মিবাহিনী এবং হাক্কানী-রাব্বানী নেতৃত্বের ধারক, বাহক ও পুরোধা ব্যক্তিত্ব হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর সম্পর্ক ও বরকতের কারণে।"

সাইয়িদ সাবাহুদ্দীন আবদুর রহমান সাহেবের ইন্তেকাল : একটি অসহনীয় আকস্মিক দুর্ঘটনা

১৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিতব্য দারুল মুসান্নিফীন আজমগড়ের ব্যবস্থাপনা-কমিটির এক বৈঠকে দারুল মুসান্নিফীন আজমগড়ের সাধারণ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় সাইয়িদ সাবাহউদ্দীন (এমএ)-এর অংশগ্রহণের কথা ছিল। তাঁর রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি, ইতিহাস-অধ্যয়ন ও ধর্মানুভূতির দিক থেকে সেমিনারটি যেহেতু তাঁর খুবই মনঃপুত ছিল, সে হিসেবে তিনি কিছু জরুরি পরামর্শ ও মতবিনিময়ের জন্য ১০ নভেম্বর লক্ষ্ণৌ পৌছে যান।

তিনি বৈঠকে সার্বক্ষণিক উপস্থিতির পাশাপাশি এক অধিবেশনের সভাপতিত্বও করেন এবং একটি তথ্যসমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় বক্তৃতা উপস্থাপন করেন। এবার তিনি অস্বাভাবিকভাবে 'দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামা'য় আটটি দিন কাটান, যা এর আগে কখনো হয় নি। সহজ-সরল ও সদা খোশমেজাজ এ মানুষটি দারুল মুসান্নিফীনের এক মামলায় দুঃখজনক ও নৈরাজ্যকর স্থানীয় বিরোধিতা ও অপচেষ্টা সত্ত্বেও অসম্ভব রকমের পুলকিত ও হাস্যোজ্জ্বল ছিলেন। মামলাটি সুন্নী ওয়াকফ বোর্ড ও স্থানীয় আদালত পর্যন্ত গড়ায়। দেখলে মনে হয়, যেন তাঁর কিছুই হয় নি।

আসর ও এশার পরের অধিবেশনগুলোতে উপস্থিত থেকে তিনি নিজের সুবিস্তীর্ণ ইতিহাসপাঠ, বিবিধ তথ্য ও মজার মজার তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে পুরো সেমিনারকে ফলে-ফুলে সুশোভিত করে তুলতেন। দারুল উলূমে অবস্থানের শেষ দিনগুলোতে তাঁর এক নিকটাত্মীয় এবং একান্ত সহযোগী সৈয়দ শিহাবুদ্দীন দেসনভী সাহেব পটনা থেকে এসে তাঁর সাথে মিলিত হলে, তিনি আরো বেশি আনন্দ অনুভব করেন এবং মানসিকভাবে সবল হয়ে ওঠেন। সেই সাথে তাঁর পরমভক্ত শ্রদ্ধেয় ইফতেখার ফরীদী সাহেবও এসে মিলিত হন সুদূর মুরাদাবাদ থেকে। তাঁর সাথেও বেশ কিছু বৈঠক হয়।

১৭ নভেম্বর কিছু প্রয়োজনে আমাকে রায়বেরেলী যেতে হয়েছিল। ১৮ নভেম্বর দুপুরের খাবার গ্রহণ করে আড়াইটার দিকে কায়লূলার জন্য বিছানায় গা এলিয়ে দিই। হঠাৎ আমার প্রিয় আবদুর রাজ্জাক এসে খবর দিল যে, দিল্লী থেকে নিয়াজ সাহেব টেলিফোন করে জানিয়েছেন, সৈয়দ সাবাহুদ্দীন আবদুর রহমান হঠাৎ সড়ক-দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর সফরসঙ্গী সৈয়দ শেহাবুদ্দীন দেসনবী সাহেব, যিনি একই সাথে রিকসায় ছিলেন, অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন।

এ দুঃসংবাদটি আমার দিল ও দেমাগে বজ্রের ন্যায় আঘাত হানে। শরীরের শিরায়-উপশিরায় সৃষ্টি হয় অন্যরকম এক অবস্থা। সংবাদ-মাধ্যম নির্ভরযোগ্য না হলে খবরটি বিশ্বাস করাই কঠিন ছিল। অপরিসীম ভালবাসা ও ঘনিষ্ঠতার কারণে নিজেকে আমি প্রবোধ দিয়ে বলি, এ সংবাদে কোনো ত্রুটি থাকতে পারে, কারণ, ঘটনা ঘটেছে লক্ষ্ণৌতে আর খবর আসল দিল্লী থেকে। পরের দিন ১৯ নভেম্বর যেহেতু দারুল মুসান্নিফীনের ব্যবস্থাপনা-কমিটির বৈঠক ছিল এবং বাইরের সদস্যরা রাত থেকে আসা শুরু করতে পারেন, সে হিসেবে আমাকে বিকেলের দিকে লক্ষ্ণৌতে ফিরতে হবে। কাজেই আমি লক্ষ্ণৌর পথে রওনা দিলাম। লক্ষ্ণৌ ও রায়বেরেলি মাঝখানের পথটা

কীভাবে কেটেছে, তা আল্লাহই মালুম। ঠিক মাগরিবের নামাযের সময় আমাদের গাড়ি দারুল উলূমের ভেতরে প্রবেশ করে সোজা মসজিদের দিকে গেল। অন্যদিকে, মরহুমের জানাযাও মসজিদের আঙ্গিনার দিকে আসছে। মাগরিবের নামাযের পর অধমকেই তাঁর জানাযার নামায পড়াতে হলো।

সড়ক-দুর্ঘটনা সম্পর্কে যদ্দুর জানা গেছে, তা সংক্ষিপ্তভাবে এই : হঠাৎ সৈয়দ সাবাহুদ্দীন সাহেবের ইচ্ছা হলো মাওলানা মুফতী রেযা আনসারীর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য ফিরিঙ্গিমহল যাওয়ার। মুফতী রেযা আনসারী হলেন উর্দু একাডেমির সাবেক সভাপতি, সাইয়িদ সাহেবও এ একাডেমির প্রবীণ সদস্যদের একজন। সাইয়িদ সাহেবের সফরসঙ্গী ও একান্ত সহযোগী সাইয়িদ শেহাবুদ্দীন দেসনবীও বললেন, "আমিও এ পর্যন্ত ফিরিঙ্গীমহল যাইনি, আমারও তা দেখার আগ্রহ আছে।" দু'জন একমত হয়ে রিক্সা করে ফিরিঙ্গীমহলের দিকে রওনা দিলেন। ডালিগঞ্জ ব্রীজ পার হয়ে সামান্য একটু গিয়েই হঠাৎ রিক্সার সামনে পড়ে যায় এক গাভী। জোরে একটা ব্রেক করল রিক্সাচালক। সাইয়িদ সাহেব আলাপে মগ্ন ছিলেন বলেই তিনি অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় উপুড় হয়ে পড়ে যান রিক্সা থেকে। প্রচণ্ড আঘাত লাগে তাঁর মাথায়। ঠিক সে সময় অন্যদিক থেকে এসে পড়ে একটি ট্রাক। চালক শক্ত করে ব্রেক ধরলেও একটি চাকা তাঁর মাথায় আঘাত হানে। ট্রাকে করে তাঁকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যাওয়া হয় মেডিকেল কলেজে। ডাক্তাররা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। কোনোরকম কৌশল করে তাঁকে পোস্টমর্টেমের সাংবিধানিক জটিলতা থেকে মুক্ত করা হয়, যেখানে ইউপি গভর্নর জনাব উসমান আরিফ সাহেব নকশবন্দীর সুপারিশ ও অনুগ্রহের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

এশার সময় লাশের গাড়ি এক দল ছাত্র-শিক্ষক ও সাইয়িদ শেহাবুদ্দীন দেসনবীর তত্ত্বাবধানে জ্ঞান ও শ্রদ্ধার এক অমূল্য রত্নকে আজমগড়ের উদ্দেশ্যে বিদায় জানানো হলো। এ আজমগড়ই তাঁর সর্বশেষ বিশ্রামস্থল হওয়ার কথা ছিল এবং তাই হয়েছে। এ আকস্মিক ঘটনা হৃদয়-মননে যে প্রভাব ফেলেছে, তা কখনো ভোলার মতো নয়। বিশেষ করে মরহুমের বড় ছেলে ড. ইহতেশামুর রহমান সাহেব আজমগড় যাওয়ার উদ্দেশ্যে কানপুর থেকে যখন এখানে এসে পৌঁছান, তখন তিনি যে কীভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন, সে দৃশ্য কখনো ভোলার নয়। ১৯ নভেম্বর দশটার কাছাকাছি সময় (যখন এবং যেদিন দারুল মুসান্নিফীনের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল) মাওলানা জিয়াউদ্দীন ইসলাহী সাহেব তাঁর জানাযা পড়ান এবং মরহুমের ইচ্ছা ও অসীয়ত মোতাবেক আল্লামা শিবলী নোমানী (রহ.)-এর কবরের পাশে তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

কবি ইকবালের ভাষায়–

آسماں ان کی لحد پر شبنم افشانی کرے
سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے

'আকাশ যেন তাঁর সমাধিতে শিশির করে বর্ষণ
সেই ঘরের যেন যত্ন করে সবুজের আবরণ'

১৯ নভেম্বর যে সময় দারুল মুসান্নিফীনের বৈঠক হওয়ার কথা, ঠিক সে সময় প্রফেসর জিয়াউল হাসান ফারুকী সাহেবের সভাপতিত্বে দারুল উলূমের সুপ্রশস্ত মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় মরহুমের বিশাল শোকসভা। তাতে মাওলানা ড. আবদুল্লাহ আব্বাস নদভী, মাওলানা আবুল ইরফান নদভী, মাওলানা বুরহানুদ্দীন চাম্বলী এবং আমি অধম বক্তৃতা রাখি। সবশেষে সভাপতির ভাষণের মাধ্যমে শোকসভার সমাপ্তি ঘটে।

২২ নভেম্বর 'শাইখুল ইসলাম আল্লামা হাফেয ইবনে তাইমিয়া' শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য জামিয়া সালাফিয়া বেনারস যেতে হয়েছিল (যার বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসছে)। উক্ত সেমিনার থেকে ফারেগ হয়ে ২৩ নভেম্বর প্রতিশ্রুতি পূরণার্থে মিয়ো জামে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য প্রিয় মৌলভী সাঈদুর রহমান নদভী এবং অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপক মাওলানা হাবীবুর রহমান নোমানীর নেতৃত্বে মিয়ো যেতে হলো। সেখানে যাবতীয় কর্মসূচী শেষ করে ২৩ নভেম্বর বিকালে শিবলী মনযিল আজমগড়ে পৌঁছার সুযোগ হয়। সেখানে মাগরিবের পর পূর্বঘোষণা অনুসারে আমার সভাপতিত্বে একটি অবিস্মরণীয় শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ, জেলার উলামা এবং প্রশাসকদের মধ্য থেকে জেলা প্রসাশক ও কাপ্তান পুলিশও অংশগ্রহণ করেন।

সকল আলোচক মরহুমের প্রতি নিজেদের গভীর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার পাশাপাশি তাঁর বৈশিষ্ট্য ও অবদানের কথাও প্রদীপ্ত উচ্চারণে তুলে ধরেন। দারুল মুসান্নিফীনে কিছুক্ষণের অবস্থানে আমার ভেতর অন্যরকম এক অবস্থার সৃষ্টি হয়। মিল্লাতের সমস্ত প্রতিষ্ঠান এবং সরব ও নীরব অবদানসমূহ ঝুঁকির সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা এবং মিল্লাতের আসন্ন সকরুণ ভবিষ্যতের কথা যখন ভাবলাম, তখন ভীষণভাবে প্রভাবিত না হয়ে পারলাম না। উপরন্তু জ্ঞানের ফলে-ফুলে ভরা বাগানটিকে বহুদিনের দক্ষ মালির ছায়া থেকে বঞ্চিত দেখে মনে-মননে দুঃখের যে দাগ কাটে, তা শব্দে-বাক্যে ব্যক্ত করা সম্ভব

নয়। এর জন্য শুধু বলতে পারি, 'সকল আরজ ও অভিযোগ একমাত্র আল্লাহর কাছে সোপর্দ করছি'।

মরহুমের স্মৃতিচারণ করার জন্য এখানে একটি কথা বলা খুব সঙ্গত মনে করছি যে, সাইয়িদ সাবাহুদ্দীন সাহেবের বহুদিন থেকে আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, কোনো হজ বা উমরার সফরে তিনি আমার সাথে যাবেন। কিন্তু সে সুযোগ কোনোমতেই হচ্ছিল না। বহুদিন পর মনে হয়, ১৯৮৬ সালের শুরুর দিকে একটি বড় পুরস্কারে তিনি মোটা অংকের কিছু টাকা পেয়েছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, সে টাকাগুলো উমরা ও যিয়ারতের মোবারক সফরে খরচ করবেন। অন্যদিকে, তাকদীরের ফায়সালাই বলতে হয়, ঠিক ঐ সময় 'রাবেতায়ে আলমে ইসলামী' কর্তৃক আয়োজিত ফিকাহ-কমপ্লেক্সের এক অনুষ্ঠানে আমার অংশগ্রহণের কথা ঠিক হলো। এভাবে একসঙ্গে যাওয়ার একটি গায়েবী ব্যবস্থা হয়ে গেল। ১৪০৬ হিজরির রজব মাসের শুরুতে মোবারক সফরটির কর্মসূচী ঠিক হলো। ৬ মার্চ ১৯৮৬-তে দুই প্রিয়ভাজন মওলভী মুঈনুল্লাহ নদভী, মুহাম্মদ রাবে নদভী এবং সাইয়িদ সাবাহুদ্দীনকে সাথে নিয়ে দিল্লী থেকে জিদ্দার উদ্দেশে রওনা হই। সাইয়িদ সাবাহুদ্দীন মরহুম ঐ সফরকে বড় গনীমত মনে করেন। পরম আবেগ-উদ্দীপনা, ভক্তি ও ভালোবাসা নিয়ে উমরা পালন করেন এবং হারাম শরীফে হাযেরী ও তাওয়াফের সৌভাগ্য দ্বারা নিজেকে ধন্য করেন।

মক্কা মুকাররমায় অবস্থানকালে ইমামে হারাম মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আস্-সুবাইল খাবারের দাওয়াত দেন। এছাড়াও আরো কিছু বৈঠক ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ হয়। তারপর পরম হৃদয়-উপচানো উদ্দীপনা নিয়ে মদীনা তাইয়িবায় হাযির হলাম। সেখানে নূর ওলী মানযিলে থাকার ব্যবস্থা হলো, যেখানে মদীনা তাইয়িবার উলামা, সাহিত্যিক ও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদের আসা-যাওয়া চলতে থাকল এবং অনেকের সাথে পরিচয় হলো। মদীনা তাইয়িবায় অবস্থানকালে আমাদের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু শাইখ মাহমূদ আল-হাফেয (যিনি ভারতের বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত এবং তাঁর ছেলে মুহাম্মদ আল-হাফেয দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার ফাযিল ও রাবেতার একজন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল ব্যক্তি।) নিজের শানদার বাড়িতে খাবারের ব্যাপক আয়োজন করেন। তাতে বহু জ্ঞানী-গুণীজন সমবেত হন। তাঁদের আগমনে এ বৈঠকটি মদীনাবিষয়ক একটি সাহিত্য-আড্ডায় পরিণত হয়।

মক্কা-মদীনা থেকে ফেরার পথে আবুধাবী যাওয়ার কথা ছিল। সেখানে ইমাম মালিক (রহ.) সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার ছিল। মনে মনে খেয়াল ছিল, সাইয়িদ সাবাহুদ্দীন সাহেবও সাথে থাকবেন এবং সেখানকার ধর্মীয় ও জ্ঞানসমৃদ্ধ বৈঠকসমূহ দেখে উপভোগ করার সুযোগ পাবেন। কিন্তু ভারত থেকে বিভিন্ন জনের রোগ-ব্যাধির খবর পেয়ে সফরটি মুলতবি করতে হলো এবং নিজের তৈরী প্রবন্ধটি দিয়ে প্রিয়ভাজন মাওলানা ড. আবদুল্লাহ আব্বাস নদভীকে সে সেমিনার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিলাম আর আমরা ৬ এপ্রিল (১৯৮৬) জিদ্দা থেকে সোজা ভারতে চলে এলাম।

এখানে আরেকটি কথা লিখে রাখা দরকার, তা হলো– সাইয়িদ সাবাহুদ্দীন সাহেব যেহেতু সফরটি করেছিলেন সম্পূর্ণ ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি ও ভক্তি-ভালোবাসা নিয়ে, সেহেতু তিনি সফর থেকে ফিরে স্ব-সম্পাদিত 'মাআরিফ' পত্রিকায় এ সম্পর্কে একটি শব্দও লেখেননি। অথচ আজকাল দেখা যায়, বিভিন্ন লেখক ও পত্রিকার সম্পাদকবৃন্দ বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে বড় ঝাঁজালো শব্দে-বাক্যে এসব সফরের অভিজ্ঞতা ও প্রতিক্রিয়া লিখে থাকেন এবং একে আত্মপ্রচার ও পত্রিকা-কাটতির বড় মাধ্যম মনে করেন। কিন্তু সাইয়িদ সাহেবের এমন নিষ্ঠা-ব্যতিক্রম অনুভূতি ও কর্মপদ্ধতি দেখে আমি বিস্ময়াবিভূত না হয়ে পারিনি। আমার মনে তাঁর মূল্যায়নের মাত্রা বেড়ে যায় বহুগুণে।

জামিয়া সালাফিয়া বেনারসে 'শায়খুল ইসলাম ইমাম হাফেয ইবনে তাইমিয়া' শীর্ষক সেমিনার

২২, ২৩ ও ২৪ নভেম্বর, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে জামিয়া সালাফিয়া বেনারসের পক্ষ থেকে 'শায়খুল ইসলাম হাফেয ইবনে তাইমিয়া' বিষয়ক একটি শিক্ষা-সেমিনারের ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। বিষয়ের সাথে গভীর সম্পর্ক থাকা এবং এর গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে অধমকে তাতে যোগ দেয়ার জন্যে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। জামিয়ার একটি প্রতিনিধিদলও আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। একই সাথে, জামিয়ার একজন শ্রদ্ধাভাজন আলিম ও শিক্ষক 'মাওলানা মুকতাদা হাসান সাহেব আজহারী' নিজেই আমন্ত্রণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং গুরুত্ব প্রদানের জন্যে এসেছিলেন। আমি বড় ব্যস্ততার মাঝে দ্রুত আরবিতে একটি প্রবন্ধ প্রস্তুত করি। প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর সুবিশাল কর্ম-অবদান এ সত্যের জোরালো প্রমাণ যে, নবুওয়তই সঠিক জ্ঞান ও পূর্ণ হেদায়তের একমাত্র

নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। বিভিন্ন আইনী সীমাবদ্ধতা ও জটিলতার কারণে সেমিনারে আরব বিশ্বের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইসলামী চিন্তাবিদ যোগ দিতে পারেন নি, যাদেরকে লক্ষ্য রেখেই আমি প্রবন্ধটি মূল আরবিতে রচনা করি। তবে জামিয়াতুল ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ, রিয়াদের ফাজিল ও মাননীয় উপাচার্য জনাব শায়খ আব্দুল্লাহ আব্দুল মুহসিন আত্-তুর্কী এবং তাঁর সফরসঙ্গী ও সহকারী আমার প্রিয় ড. আব্দুল হালিম আভিস মিসরী (যিনি জামিয়ার সমাজবিজ্ঞান অনুষদের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাপক)-এর আগমন সেই শূন্যতাকে অনেকাংশে পূর্ণতা দান করে। উভয়ই অধমের সমমনা ও একান্ত আপনজন। ড. আব্দুল্লাহ আল মুহসিন আত্-তুর্কী 'রাবেতা' ও অক্সফোর্ড ইসলামিক সেন্টারেরও সদস্য। ফলে, আমাদের এক সাথে বসার এবং মতবিনিময় করার বারবার সুযোগ হয়েছে। তাছাড়া, আমি তাঁর আমন্ত্রণে রিয়াদে বিশেষ কিছু সফরও করেছি।

সেমিনারের উদ্বোধনী অধিবেশনেই পঠিত সেই প্রবন্ধে আমি সর্বাগ্রে আলোকপাত করি যে, ইসলামি বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ব্যক্তিত্ব ও কীর্তি-অবদান বিষয়ক সেমিনার ও সেম্পোজিয়াম হওয়া সময়ের দাবি। এ যুগকে আমরা ইমাম ইবনে তাইমিয়ার যুগ বলতে পারি– এটি একটি সময়োচিত শ্লোগান ও পরম বাস্তবতা। বিভিন্ন বিশেষত্ব ও কারণের উপর ভিত্তি করে (যার ব্যাখ্যা দীর্ঘ আলোচনাসাপেক্ষ) এ যুগে তাঁর দাওয়াত ও জ্ঞান-গবেষণার দিকে 'ইলমী' ও 'ইসলাহী' মহল তথা দ্বীনের জ্ঞান ও আত্মশুদ্ধির সাথে সংশ্লিষ্ট বলয়ে মনোযোগবৃদ্ধি ও মূল্যায়নের এক নবতরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে এবং উক্ত বিষয়টির তাৎপর্য অনুধাবন ও উপকারিতার অনুভূতি সতেজ হয়েছে। খোদ ভারতেও এর পূর্বে এ ধারায় বিভিন্ন স্থানে সেমিনার অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল। কারণ, ভারতেরই এক সুমহান ব্যক্তিত্ব, বিশ্ববরেণ্য দাঈ, আধ্যাত্মিক সম্রাট ও গভীর জ্ঞান-গবেষণা এবং বিপ্লবী চিন্তা-চেতনার অধিকারী আলিমে দ্বীন হাকীমুল ইসলাম শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী সাহেব (মৃত্যু ১১৭৬ হিজরী) তাঁর যুগে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। শাহ সাহেব তাঁর পক্ষে সমর্থনও ব্যক্ত করেন। এর পরে শাহ সাহেবের খলীফা ও ছাত্রবৃন্দ এবং তাঁদের খলীফা ও ছাত্রবৃন্দ উপমহাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি এবং প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে আল্লাহর পথে লড়াই করা, আত্মশুদ্ধি, মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, হাদীস গ্রন্থাবলি অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, ব্যাখ্যা, অনুবাদ ও সমাজ-সংস্কারে এক অমূল্য সংযোজন করে দু'শতাব্দী পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে

দাওয়াত ও আত্মশুদ্ধির এ সুমহান কর্মধারা চালু রাখেন, যার দৃষ্টান্ত অন্য কোনো ইসলামি রাষ্ট্রে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

অতঃপর শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার শুদ্ধি-সংস্কার ও গবেষণামূলক কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ ও মূল বিষয়গুলো উল্লেখ করি। তাতে একত্ববাদীয় বিশ্বাসের সংস্কার, বহুত্ববাদীয় অপবিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার খণ্ডন, কুরআন-সুন্নাহর ধারাকে প্রাধান্য দান, যুক্তি, দর্শন ও কালাম শাস্ত্রের সমালোচনা, অমুসলিম জাতি-সম্প্রদায়কে প্রত্যাখ্যান, তাদের অপবিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ও কুপ্রভাবের গতিরোধ, ধর্মীয় জ্ঞানের সংস্কার-সমৃদ্ধি, ইসলামী চেতনার পুনর্জাগরণ এবং তাতে এক নতুন গতি ও ব্যাপকতা সৃষ্টির কথা আলোচিত হয়। তার রচনাবলি জীবনের আলোকোজ্জ্বল শিরোনাম এবং তাঁর কর্ম সংস্কার ও গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

আমি তাতে আরো উপস্থাপন করি, আমার মতে, তাঁর সবচেয়ে মর্যাদাযোগ্য ও স্বীকৃতিযোগ্য অবদান এবং তাঁর রচনাবলির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, যেটিকে পূর্ণতা ও অবদান-ভাণ্ডারের রাজকীয় চাবি (Master Key) বলা হয়, সেটি হলো– জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে একথা প্রমাণ করা যে, নবুয়তই আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলির সঠিক পরিচয় এবং পূর্ণ হেদায়াতের নির্ভরযোগ্য ও একমাত্র মাধ্যম। এরপর আমি কুরআন মজীদ থেকে এ সত্য প্রমাণে সুস্পষ্ট আয়াত ও হাদীস বর্ণনাপূর্বক সেই ঐতিহাসিক পটভূমি নিয়েও আলোকপাত করি, যা মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওয়ত-প্রাপ্তি, কুরআন অবতরণ হওয়া এবং ইসলাম-প্রসারের পূর্বে পৃথিবীর জ্ঞানী ও চিন্তকমহলে এবং ধার্মিক ও বিশ্বাসী বলয়ে পাওয়া যেত এবং যার কর্তৃত্ব আদিম ও মধ্যযুগে গ্রীকরা নিজেদের হাতে নিয়েছিল। তিনি বলেছেন যে, এ ক্ষেত্রে গ্রীকদর্শন ও তার মহান প্রবর্তকবৃন্দ ও পতাকাবাহীরা (যাদেরকে পৃথিবীর বহু শিক্ষিতমহল পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার মর্যাদা এবং মানবচরিত্রের উর্ধ্বের মানব বলে সম্মান দিয়েছে) কত যে ধাক্কা খেয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি, সৃষ্টি ও বিশ্বজগতের সাথে এর সম্পর্ক-পরম্পরায় কী যে বোকামী ও প্রতারণার প্রমাণ দিয়েছে, তা বলে শেষ করা যাবে না। অতঃপর কিভাবে ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এই 'জেহেলে মুরাক্কাব' তথা সর্ববিধ অজ্ঞতার পর্দা ছিন্ন করেছেন এবং যে আস্থা-বিশ্বাস ও শক্তি-যোগ্যতার সাথে গ্রীকদর্শন ও তার প্রবর্তক-অনুবাদক ইবনে সিনা প্রমুখের সমালোচনা করেছেন– তার নমুনাও আমি সোচ্চার শব্দে-বাক্যে উপস্থিত শ্রোতাদের সামনে পেশ করেছি।

উক্ত বর্ণনার ধারাবাহিকতায় ইমাম ইবনে তাইমিয়ার (রহ.)-এর অতীব গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান-গবেষণার সেই বিষয়টিও স্মরণ করিয়ে দিই, যা তিনি কুরআন ও গ্রীকদর্শনের মধ্যকার মৌলিক পার্থক্যের ধারাবাহিকতায় বর্ণনা করেন। বিষয়টি এত দীর্ঘ আলোচনার দাবি রাখে যে, এটি আলাদা একটি গ্রন্থে বর্ণনা করাও মুশকিল। বিষয়টির সারসংক্ষেপ হলো, কুরআন আল্লাহর গুণাবলি বিস্তারিত আলোচনা করেছে, তাঁর সাথে সব ধরনের সাদৃশ্যতাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এ বিষয়ে আম্বিয়ায়ে কেরামের পথ ও পদ্ধতিও হলো, আল্লাহর গুণাবলির কথা প্রমাণ করা হয় বিস্তারিত, আর আল্লাহর সত্তার সাথে অসমীচীন গুণাবলির প্রত্যাখ্যান করা হয় সংক্ষেপে। পক্ষান্তরে, সত্য অনুধাবনে ব্যর্থ গ্রীক দার্শনিকরা প্রত্যাখ্যান করেন বিস্তারিত, তবে প্রমাণ করেন খুব সংক্ষেপে। তাদের সব জোর এ কথার উপর যে, আল্লাহ এমন নয়, এমন নয়। তবে আল্লাহ কী ? তাঁর গুণাবলি কী কী ... এ ব্যাপারে তারা খুব সংক্ষেপেই আলোচনা করেন এবং তা খুব সাদাসিধে ভাবেই করা হয়। (তাই তারা আল্লাহর পরিচয় লাভে ব্যর্থ হয়)। অতঃপর আমি বললাম, "মানুষের মন-মানস, স্বভাব-প্রকৃতি, নীতি-জ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের বিচারে হাজারো নেতিবাচক একটি ইতিবাচকের সমকক্ষ হতে পারে না। কোনো অস্তিত্বের সাথে অন্য অস্তিত্বের সম্পর্ক, ভক্তি-ভালোবাসা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাওয়া-পাওয়ার সম্পর্ক তার পূর্ণতা ও গুণাবলির উপর ভিত্তি করেই হয়। সে পূর্ণতার কথা বিদ্যমান না থাকার কারণে গ্রীক সভ্যতায় তাদের কর্তৃত্বের যুগে তাদের অনুসারীদের এবং সেই সব দেশের সম্পর্ক আল্লাহ তা'য়ালার সাথে গভীরও ছিল না, ছিল না শক্তিশালী বা স্থায়ী।"

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার (রহ.)-এর জোরালো প্রভাবপূর্ণ উক্তিসমূহ উপস্থাপন করার পর আমি বললাম, "কালামশাস্ত্র ও ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার ইতিহাসে দীর্ঘ সফর চলমান থাকার পর একটি আশ্চর্যজনক বিষয় প্রতিভাত হয়ে উঠে, আর তা হলো, পূর্ণ দু'শতাব্দীর পর বরেণ্য এক আলেমে দ্বীন আধ্যাত্মিক রাহবার, যুগসংস্কারক শায়খ আহমদ বিন আব্দুল আহাদ সিরহিন্দি (রহ.) (প্রকাশ মুজাদ্দিদে আলফে সানী মৃত্যু ১০৩৪ হিজরী)-ও একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। অথচ তাঁর কাছে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর রচনাবলি দূরের কথা, সম্ভবত খ্যাতিও পৌঁছে নি। এটি আসমানী জ্ঞান-পরম্পরার এমন একটি ধারা, যার বিশ্লেষণ আল্লাহ তা'য়ালার তৌফিক, কুরআন-সুন্নাহর সুগভীর অধ্যয়ন এবং নিষ্ঠা ও ইখলাস ছাড়া সম্ভব নয়, যা কুরআন মাজিদের নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা। একটি প্রদীপ্ত নমুনা বলতে পারি,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

"যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।"

তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী ও জোরালোভাবে, সরাসরি ও সুস্পষ্টভাবে তার বিভিন্ন রচনাবলিতে এ কথা ব্যক্ত করেন যে, নিরেট আকল-বুদ্ধিরও অস্তিত্ব নেই, খালিস কাশফ-অন্তঃকরণেরও অস্তিত্ব নেই। মহাবিশ্বের স্রষ্টাকে প্রমাণ করা এবং তাঁর গুণাবলির সাথে পরিচয় লাভ করার ক্ষেত্রে আকল অপারগ, মেধা অক্ষম। এটি ধর্মীয় বাস্তবতা অনুধাবন যথেষ্ট নয়। অতঃপর তিনি লেখেন, যেমন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় ভিন্ন অন্য একটি বস্তু, তেমনি নবুয়তও বুদ্ধি ভিন্ন অন্যকিছু, এবং তারও উর্ধ্বের একটি বস্তু। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় এ কথা প্রমাণ করেন যে, বুদ্ধি ও মেধা বিশুদ্ধ হওয়া সম্ভবই নয়। তাছাড়া, আল্লাহ সম্পর্কিত সমস্যা বোঝার ক্ষেত্রে উপকারীও নয়। আকল-মেধা ও কাশফ-অন্তঃকরণ একই জাহাজের আরোহী। আকলের মতো কাশফেও মিশেল থাকে। নবুওয়ত ছাড়া সত্যিকার অর্থে অন্তরের পরিশুদ্ধতা সম্ভবই নয়।

আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি ও আহকাম জানার এটি-ই একমাত্র মাধ্যম। অতঃপর উক্ত প্রবন্ধের পার্শ্বটীকায় এ কথার প্রমাণস্বরূপ আভাস দেয়া হয়েছে যে, মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-এর দু'শ বছর পর জার্মানীর গৌরব বিখ্যাত দার্শনিক এমানুয়েল কান্ট (Emanuel Kant 1724-1804) নিরেট মেধার সম্ভাবনা ও অস্তিত্ব সম্পর্কে তা। রচিত গ্রন্থ Critiue of Pure Reason -এ স্বাধীনভাবে সমালোচনামূলক গবেষণা করেছেন। তিনি এমন নিরেট মেধার অস্তিত্ব সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করেন, যা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বিশ্বাস, সামাজিক বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা, পারিপার্শ্বিক প্রভাব ও মনের অজান্তে মেনে নেয়া কুসংস্কারের প্রভাব থেকে স্বাধীন ও মুক্ত হবে। আল্লামা ইকবাল তার মাদ্রাজের (চেন্নাই) এক বক্তৃতায় সত্যি বলেছেন, কান্টও তার গ্রন্থ কাশফের পুজারী ও আকলের অর্চনাকারীদেরকে মাটির স্তূপে পরিণত করেন।[১]

---

১. তাঁর রচনাবলির উদ্ধৃতিসমূহ বিস্তারিত জানতে দেখুন, 'তারিখে দাওয়াত ওয়া আযীমত' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ড, যেটিতে হজরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-এর জীবনী সংকলিত হয়েছে পৃ. ১৯৫-২২৬।

সকালের প্রথম অধিবেশনে উর্দূতে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ও পরিচিতি পেশ করার পর প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্তভাবে আমি আরবিতে উপস্থাপন করি, যা খুব মনোযোগ সহকারে শোনা হয়। প্রবন্ধটির অনুবাদ (যেটি আমার স্নেহাস্পদ মৌলভী নজরুল হাফীজ নদভী প্রস্তুত করে নিয়ে গিয়েছিল।) সন্ধ্যায় প্রবন্ধপাঠ অধিবেশনে শোনানো হয়। আমন্ত্রক ও আয়োজকদের ইচ্ছা এবং শহরের স্থানীয় লোকদের আশা-আগ্রহের কারণে রাতে আমি একটি সাধারণ সমাবেশে বক্তৃতা করি। শহরের প্রচুর উৎসুক জনতা এতে অংশগ্রহণ করেন। আমি এ কথার তাগিদ দিই যে, এদেশে থাকা এবং দেশসেবায় ও প্রতিরক্ষায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে হলে, মুসলমানদের জন্য প্রয়োজন, নিজেদের সভ্যতা-শিষ্টাচারে ও জীবনযাত্রায় স্বকীয়তার পরিচয় দেয়ার মাধ্যমে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে ইসলাম, কুরআন ও সীরাত-পাঠে উদ্বুদ্ধ করা এবং ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও এর কল্যাণের স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য করা সম্ভব হবে। তাছাড়া, তারা দেশে সুস্থ-পরিমিত, চাহিদা অনুযায়ী সাধারণ ও গ্রহণযোগ্য পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবে। ঘৃণা ছড়ানো, উস্কানী দেয়া, কলহ সৃষ্টি করা এবং আবেগপ্রবণতা থেকে বিরত থাকবে যাতে শুধু ধর্মীয় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসমূহই নয়, বরং মসজিদ-ইবাদতখানাও সুরক্ষিত থাকে। একটি শান্ত-সুন্দর পরিবেশে যাতে শিক্ষা-সেমিনার ও মতবিনিময়-সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে, তার একটি দৃষ্টান্ত আমরা সকাল থেকে দেখে চলছি। সুষ্ঠু পরিবেশ ও পারস্পরিক আস্থা-শ্রদ্ধার সংকট হলে অথবা সহাবস্থান-নীতিতে বিশ্বাসী না হলে, কোনো কিছুই বাকি থাকবে বলে মনে হয় না। কোনো প্রতিষ্ঠান, বৈপ্লবিক আন্দোলন, নৈতিক আহবান এবং কোনো জ্ঞান-পুঁজি সুরক্ষারও কোনো নিশ্চয়তা নেই।

আল্লাহর শুকর! যতটুকু আঁচ করতে পারলাম, আমার বক্তৃতাটি শোতৃবৃন্দ মনোযোগ সহকারে শুনেছেন এবং পছন্দ করেছেন।

– তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত –